BLACK BOY BY RICHARD WRIGHT

নিগ্রো ছেলে

অনুবাদ :

নিখিল সেন

মডার্ণ পাবলিশার্স

BY ARRANGEMENT WITH PAUL K. REYNOLDS

"রিচার্ড রাইট আমেরিকার একজন অনন্য সাধারণ শক্তিমান লেখক। কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে তিনি তাঁর **নিগ্রো ছেলেতে** ফুটিয়ে তুলেছেন অভিশপ্ত একটি নিগ্রো বালকের নিখুঁত ভয়াবহ হৃদয় বিদারক এক কাহিনী। নৈতিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মার্কিণ বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি সত্যিই গৌরবান্বিতা বোধ করছি।"

ডরোথি ফিসার

রিচার্ড রাইট নিজেও একজন নিগ্রো। মিসিসিপ্পির এক আবাদে তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে। শৈশবেই পিতা তাঁদের ছেড়ে যান। নানা স্থানে তাই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় স্রোতের শেওলার মত দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অনটন আর অজ্ঞতার মধ্যে।

আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রথম আসেন চিকাগোয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি নেন সরকারী ডাক বিভাগে। লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে 'ফেডারেল রাইটার প্রজেক্টের' সদস্য হন এবং বামপন্থী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শীঘ্রই। "টম্‌কাকার ছেলে-মেয়ে" গল্প লিখে ১৯৩৮ সালের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক হিসেবে **'ষ্টোরি ম্যাগাজিন পুরস্কার'** লাভ করেন। **'নেটিভ্‌ সান'** উপন্যাসেই রিচার্ড রাইটের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। **নিগ্রো ছেলে** তাঁর সর্বশেষ রচনা এবং আমেরিকার সেরা কাটতি বই।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার—

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বছর চারেক তখন আমার বয়স। শীতের একটি সকাল। চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গন্‌গনে কয়লার উপর হাত দুটি গরম করছিলাম . আর শুনছিলাম ঘরের বাইরে ক্ষেপা বাতাসের আর্ত গোঙানি। ভোর থেকেই মা শুরু করেছিলেন বকাবকি। চুপ করে থাকতে বলছিলেন বারবার ; বলছিলেন কোন গোলমাল না করতে। তাই মেজাজটা খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। রেগে গিয়েছিলাম ভয়ানক। দিদিমার অসুখ। পাশের ঘরেই তিনি শুয়ে আছেন। ডাক্তার এসে দিন-রাত তদারক করে যাচ্ছেন। কথা না শুনলে আমাকে যে শাস্তি পেতে হবে আমি জানতাম। দুমদাম অস্থির পা ফেলে জানলার কাছে আমি এগিয়ে গেলাম। তারপর তুলোর শাদা লম্বা পর্দাটা টেনে খুলে দিলাম। পর্দাখানা ছুঁতে আমার বারণ ছিল, কথাটা মনেও পড়ল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ফাঁকা রাস্তার দিকে। ছুটো-পুটী হৈ-চৈ করে কি করে খেলা যায় আমি তাই ভাবছিলাম। কিন্তু বালিসে-শোয়ান একরাশ কালো চুলের মধ্যে দিদিমার খাঁজ-কাটা ফরসা, রুক্ষ মুখখানা আমার চোখের উপর ভেসে উঠতেই বুকটা দুড়-দুড় করে উঠল ভয়ে।

সব চুপ্‌চাপ : কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই বাড়িতে। ছোট ভাইটি আমার চাইতে এক বছরের ছোট। আপন মনে সে খেলছে এক খেলনা নিয়ে পেছনের মেঝের উপর বসে। হঠাৎ কোথা থেকে একটি পাখী জানলার পাশ দিয়ে উড়ে গেল একটা চক্কর দিয়ে। হাততালি দিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'অতো চেঁচিয়ো না, দাদা।' ছোট ভাইটি বলে উঠল।

'চুপ কর তুই।' আমি তাকে একটা ধমক দিলাম।

মা অমনি ছুটে এলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন আমাব কাছে। মুখের উপর তর্জনীটা রেখে চাপা গলায় বললেন :

'অমন চেঁচামেচি করছিস কেনো রে? দিদিমার অসুখ খেয়াল নেই একটু? চুপ করে থাক্‌ বলছি।'

মা আবার চলে গেলেন। আমি রাগে ফুলতে লাগলাম। মাথাটা আমার ঝুলে পড়ল বুকের উপর।

'আমিও তো তাই তোমাকে বলছিলাম,' আড়-চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছোট-ভাইটি বলে উঠল।

'থাম বলছি তুই!' ওকে আবার একটা ধমক দিলাম।

ঘরের মধ্যে মনমরা হয়ে আমি তারপর পায়চারি করতে লাগলাম। ফন্দি খুঁজছিলাম কিছু একটা করবার। পর মুহূর্তেই কিন্তু ভয় হতে লাগল, মা যদি আবার ফিরে আসেন আর কথা শুনিনি বলে যদি রাগ করেন খুব। ঘরের মধ্যে আগুনের চুল্লিটা ছাড়া কিছুই ছিল না তেমন আকর্ষণীয়। গুটি গুটি পা ফেলে আমি এক সময় চুল্লিটার কাছে এগিয়ে এলাম। জ্বলন্ত কয়লার অঙ্গারগুলি জ্বলছে ঝিলমিল করে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে পুড়ে। নতুন ধরনের এক খেলার কথা হঠাৎ খেলে গেল আমার মাথায়। চুল্লির আগুনের মধ্যে কিছু একটা ছুঁড়ে

দিই না কেনো ? তারপর মজা করে দেখি সেটা কেমন জ্বলছে আগুনে। এদিক-ওদিক আমি তাকাতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না কিছুই। ছবির বইটার উপর আমার চোখ গিয়ে পড়ল। কিন্তু ওটাকে পোড়ালে মা ঠ্যাঙিয়ে আমার হাড় করবেন গুঁড়ো। তা হোলে আগুনে কি ছুঁড়ে দেয়া যায় ? চারদিক আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

হ্যাঁ, পেয়েছি!...ঘরের কোণে হেলান-দিয়ে-রাখা ঝাড়নটার উপর আমার এবার চোখ পড়ল। ঝাড়নটা থেকে খানিকটা খড় নিয়ে যদি আগুনে দিই কে বা আর দেখতে আসছে ? ঝাড়নটাকে আমি নামালাম মেঝের উপর টেনে। একমুঠি খড় বার করে নিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে তা দোলাতে লাগলাম। খড়ের গোছাটা কালো ধূমান্বিত হয়ে জ্বলে উঠল এক সময় দপ করে। তারপর ভুতের সাদা নুড়ির মত কোথায় যেন অন্তর্ধ্যান হয়ে গেল! খড়-পোড়ান খেলায় তেমন কিই বা আর মজা ? তবু ঝাড়নটা থেকে মুঠি মুঠি খড় নিয়ে আগুনে আমি পোড়াতে লাগলাম। ছোট ভাইটি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রজ্বলিত খড়ের উপর চোখ রেখে বলল :

'দাদা, অমন করো না কিন্তু।'

'যা—যা।'

'আস্ত ঝাড়নটা তুমি পোড়াবে নাকি সবটা ?'

'তুই থাম না!'

'আমি কিন্তু বলে দেবো।'

'একবার বলে গ্যাখ্ না, মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবো না ?'

নতুন আর একটা খেলা আমার মাথায় এবার খেলল। ঝাড়নটা থেকে এক গোছা খড়ে আগুন লাগিয়ে তুলোর ওই শাদা লম্বা পর্দাটার নীচে ধরলে কেমন হয় ? কেমন, একবার দেখলে হয় না ? ঝাড়নটা

থেকে একগাদা খড়ে আমি আগুন ধরিয়ে নিলাম। তারপর জানলার কাছে ছুটে গিয়ে পর্দাটার মুড়িতে সেই আগুনটা দিলাম ধরিয়ে।

ছোট ভাইটা মাথা নেড়ে নিষেধ করলে : 'না'। কিন্তু তার নিষেধের পূর্বেই অগ্নির রক্তিম লেলিহান শিখা শাদা পর্দাটাকে চক্রাকারে শুরু করে দিল গ্রাস করতে। সারা পর্দটা এবার জ্বলে উঠল দপ্ করে।

চমকে উঠে আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। আগুনের শিখা তখন ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। সারাটা ঘর সোনালী আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। চিৎকার করতে চাইলাম গলা ফাটিয়ে। কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরুলো না। ভাইয়ের দিকে আমি এবার তাকালাম। কিন্তু দেখলাম সে কখন চলে গেছে। ঘরের অর্দ্ধেকটায় তখন আগুন লেগে গেছে। ধোঁয়ায় আমার দমটা আটকে এল। চোখে-মুখে এসে লাগল আগুনের ঝিলিক। আমি হাঁপাতে লাগলাম।

ছুটে গেলাম আমি রান্নাঘরের দিকে। কুণ্ডলী পাকিয়ে সেদিকেও ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। মা বুঝি এতক্ষণে ধোঁয়ার গন্ধ টের পেয়েছেন। আগুন দেখতে পেয়ে নিশ্চয় তিনি আজ আমায় মেরে হাড় দেবেন গুঁড়ো করে। কাজটা সত্যি বড় খারাপ হয়ে গেল। লুকোতে কি অস্বীকার করতেও পারা যাবে না কিছুতেই। আচ্ছা, পালিয়ে গেলে কেমন হয়? আর কখনও ফিরবো না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমি পেছনের উঠানে এসে দাঁড়ালাম। এখন যাই কোথায়? ঘরের নীচে লুকোলে কেমন হয়? কেউ আমায় খুঁজে পাবে না তাহোলে? হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমি বাড়ীর নীচে। ইঁটের চিমনীটার অন্ধকার এক গর্তে তাল-গোল পাকিয়ে শক্ত কাঠ হয়ে আমি পড়ে রইলাম। মা তো আর নাগাল পাচ্ছেন না আমার। চাবুক দিয়ে আর ঠ্যাঙাতেও পারবেন না! আগুনটা হঠাৎ লেগে গেল! আমি কি আর সত্যি সত্যি

আগুন দিতে গিয়েছিলাম ঘরে? পর্দাতে আগুন লাগালে কেমন দেখায়, আমি তো কেবল তা একটু পরখ করে দেখতে গিয়েছিলাম। জ্বলন্ত ঘরের নীচে আমি যে লুকিয়ে আছি এ খেয়ালটুকু আমার তখনও হয়নি।

মাথার উপরকার ছাদটা বহু লোকের পদধ্বনিতে যেন কেঁপে উঠল। আর্ত চিৎকারও তাদের কানে এসে পৌঁছল। একটু পরেই দমকলের ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠল। রাস্তার দিক থেকে দুলকি চালে ঘোড়ার পদশব্দও এল ভেসে। য়্যাঁ, তাহোলে সত্যি সত্যি কি আগুন লেগে গেছে বাড়িতে! পাড়ার এক বাড়িতে ঠিক এমনি এক আগুন লাগতে দেখেছিলাম। সমস্ত বাড়ীটা তাতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল পুড়ে। মুখ চুণ করে কালো চিমনীটাই কেবল দাঁড়িয়েছিল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। যে চিমনীটা আমি এতক্ষণ ধরে আঁকড়েছিলাম, সেটা এবার বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। চিৎকার আর কোলাহল ক্রমশ বেড়ে চলল।

আমার চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে উঠল: দিদিমা যেন তাঁর বিছানার উপর পড়ে আছেন অসহায় হয়ে। কালো চুলে তাঁর আগুনের ঝিলিক এসে লাগছে। মাও বুঝি পুড়ে গেছেন। ভাইটা নিশ্চয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পর্দাটাতে আগুন লাগানোর আগে একবার ভেবে দেখলেই পারতাম। এখন মুখ দেখাই কি করে? হৈ-চৈ হুলুস্থূল বেড়ে চলল আরও। আমি কাঁদতে শুরু করে দিলাম। মনে হোল আমার যুগ যুগ ধরে আমি যেন এখানে লুকিয়ে আছি। সোরগোলটা একটু মন্দা হয়ে আসতেই নিজেকে আমি নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে করলাম।

নিকটেই কার যেন গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'রিচার্ড!'

মা পাগলের মত আমায় ডাকছেন। তাঁর পা আর পোষাকের প্রান্তটুকু আমি দেখতে পেলাম। উঠানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি করে যেন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাউকে। উদ্বেগ শংকাকুল তাঁর মুখ। শাস্তির পরিমাণটা আমার আজ আমি আন্দাজ করে নিলাম। মার গম্ভীর মুখখানা এবার দেখা গেল। এদিক-ওদিক ঘরের আনাচে-কাঁনাচে তিনি উঁকি মেরে বেড়াচ্ছেন। এই বুঝি আমায় দেখে ফেললেন! দম বন্ধ করে আমি কান খাড়া করে রইলাম। প্রস্তুত হয়ে রইলাম বেরিয়ে আসবার আদেশ শুনতে। মুখখানা মার কিন্তু সরে গেল। না; চিমনীর অন্ধকার ঘুঁজির মধ্যে কুঁকড়ে পড়েছিলাম বলে তিনি আমায় দেখতে পান নি!

'রিচার্ড!' মা আবার ডেকে উঠলেন আর্তস্বরে। 'এই রিচার্ড! বাড়ীতে আগুন লেগেছে! ওগো, আমার বাছাটাকে কেউ খুঁজে দাওনা!'

আগুন লাগুক্ গে বাড়ীতে, আমি কিন্তু আমার নিরাপদ স্থানটুকু ছাড়ছি না কিছুতেই।

একটু পরেই দেখলাম আর একখানা মুখ কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, বাবারই! অন্ধকার ঘুঁজির মধ্যেও আমায় বুঝি তিনি দেখতে পেয়েছেন। হাত দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললেন :

'ওই যে ওখানটায়!'

'না, এখানে নেই!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'বেরিয়ে আয়, খোকা!'

'না।'

'বাড়ীতে আগুন লেগেছে যে।'

'না, আমি যাব না।'

গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলেন বাবা আমার কাছে। আমার একটা পা

তিনি চেপে ধরলেন। ইঁটের চিমনীটা আঁকড়ে ধরলাম আমি প্রাণপণে। আমার পা ধরে হেঁচকা একটা টান দিয়ে বাবা বলে উঠলেন :

'বেরিয়ে আয় বোকা কোথাকার !'

'না, ছেড়ে দাও আমাকে।'

আঙুলগুলি আমার শিথিল হয়ে এল। ছেড়ে দিলাম। বরাতে আজ মার বুঝি লেখাই আছে! পরোয়া করে আর কি হবে? পরিণাম এর জানা আছে আমার। বাবা আমাকে টেনে নিয়ে এলেন পিছনের উঠানের মাঝখানে। ছাড়া পেয়েই আমি চারপাশের লোকের বেষ্টনী ভেদ করে রাস্তার দিকে দৌড়বার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। পালান আর হোল না। দশ পা যেতে না যেতেই আমাকে সবাই ধরে ফেললে।

তারপর সব ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন গুলিয়ে গেল। সোরগোল হাঁকাহাঁকি আর কান্নাকাটির মধ্যে আমি এটুকু কেবল জানতে পারলাম, কেউ পুড়ে যায়নি আগুনে। ভাইটি বুঝি অনেকখানি হুশ করে মাকে আগেভাগে খবর দিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার আগেই অর্দ্ধেকটা বাড়ীতে ধরে গিয়েছিল আগুন। একটা তোষককে ষ্ট্রেচারের মত বানিয়ে নিয়ে দাদামশাই ও এক মামা দিদিমাকে নিয়ে আসেন বিছানা থেকে উঠিয়ে এবং পাশের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে যান। অনেকক্ষণ আমাকে কেউ দেখতে না পেয়ে আর কথাবার্তা আমার শুনতে না পেয়ে একটু আগে সবাই ধরে নিয়েছিল, আগুনে বুঝি পুড়ে গেছি আমি।

'আমাদের সবাইকে তুমি ভয় খাইয়ে দিয়েছিলে,' গাছের একটা ডাল ভাঙতে ভাঙতে মা গজগজ করে উঠলেন। আস্ত ডালটা বুঝি এবার আমার পিঠের উপর দিয়েই যাবে!

দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে আমার উপর প্রহার চল্‌ল নিষ্ঠুর নির্ম্মম হস্তে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে দেখলাম শুয়ে আছি আমি

এক বিছানায়। বিকারের ঘোরে আমি তখন প্রলাপ বকতে শুরু করে দিয়েছি। বিছানা ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইতাম। আমাকে শান্ত করতে এলে বাবা আর মার সঙ্গে শুরু করে দিতাম রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি। রাজ্যের যত সব ভয় যেন পেয়ে বসল আমাকে। ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান হোল। পরে শুনেছিলাম, তিনি নাকি আমায় বিছানায় শুইয়ে রাখতে বলেছিলেন। আমি যেন চুপচাপ শুয়ে থাকি শান্ত হয়ে। আমার জীবন-মরণ নাকি নির্ভর করছে সব তার উপর। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আমার আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। আমি ঘুমুতে পারলাম না। জ্বরের তাপ প্রশমনের জন্য আমার কপালের উপর বরফের একটা ব্যাগ রাখা হয়েছিল। একটু চোখ বুজলেই আমি দেখতে পেতাম ভিতরের ছাদ থেকে গরুর ভরা বাঁটের মত মস্ত শাদা শাদা অনেকগুলি থলে ঝুলিয়ে রেখেছে কে যেন আমার উপর। পরে আমার অবস্থা যখন আরও মন্দের দিকে গেল, চোখ না বুঁজেও দিনের বেলা শাদা শাদা সেই থলেগুলি আমি দেখতে পেতাম। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যেত। এই বুঝি ঐগুলি খসে পড়ল আমার মাথায় আর ভয়ঙ্কর এক তরল পদার্থে সর্বাঙ্গ আমার আচ্ছন্ন করে দিল! আঙুল দিয়ে ওই থলেগুলি দেখিয়ে দিয়ে বাবা আর মার কাছে রাতদিন আমি অনুনয়-বিনয় করতাম, ওঁরা যেন ওগুলি সরিয়ে নেন আমার চোখের উপর থেকে। আমি ভয়ে বারবার চমকে উঠতাম যখন শুনতাম, আমি ছাড়া কেউ আর ওগুলো দেখতেই পায় না। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেই হঠাৎ এক বিকট চীৎকার করে আমি আবার জেগে উঠতাম। ভয়ে আমার আর ঘুমই আসত না। একটু একটু করে ভয়ঙ্কর সেই থলেগুলোর বিভীষিকার ঘোর আমার কেটে গেল। ক্রমশ আমি সেরে উঠতে লাগলাম। অনেক দিন পরেও

সেদিনের সেই শাস্তির কথা. আমার মনে পড়লে ভয় হত আমার, এই বুঝি মা তেড়ে আসছেন আমায় খুন করতে।...

আশপাশের প্রতিটি জিনিষই যেন কথা কয় এক মৌন ভাষায়। একটু কান পেতে থাকলেই শোনা যায় সে কথা। জীবনের প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্ত ছন্দিত মুখরিত হয়ে উঠে তখন যেন ধীরে ধীরে। নিবিড় রহস্যময় সে কথা আমি কোনদিন ভুলব না যেদিন প্রথম আমি দেখলাম, শাদা আর কালোয় বিচিত্র রঙ-বেরঙের পর্বতের মত প্রকাণ্ড এক জোড়া ঘোড়া ধূলি উড়িয়ে বিচিত্র শব্দলহর তুলে যাচ্ছিল গেঁয়ো এক পথ ধরে।...

যতদূর দৃষ্টি যায় দিগন্তের কোল ঘেষে দীর্ঘ ঋজু সারির পর সারি লাল আর সবুজ রঙের সবজির ক্ষেত—চিকচিক করছে রোদে—তাই দেখে হাত তালি দিয়ে আমি কত নেচে উঠতাম পরম আনন্দে।...

প্রত্যূষে উঠে শিশিরে-ভেজা বাগানের সবুজ পথ দিয়ে আমি যখন ছুটোছুটি করে বেড়াতাম তখন ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া হু-হু করে এসে লাগত আমার মুখে—চুমিয়ে যেত বুঝি আমার চিবুক আর কপোল। অনাস্বাদিত কেমন এক অপূর্ব শিহরণ আমার তখন খেলে যেত সর্বাঙ্গে।...

কুল কুল করে বয়ে চলেছে পীত মিসিসিপি নদী। ন্যাট্‌চেঝ-এর সবুজ উঁচু উপকূলভাগ থেকে আমি যখন তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম মনটা আমার তখন কেমন এক অসীম, সুদূর অনিশ্চিয়তায় ভরে উঠত কানায় কানায়।...

শীতের প্রারম্ভে হেমন্তের হিমশীতল আকাশ দিয়ে বন্য বলাকার দল যখন উড়ে যেত দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে দক্ষিণাভিমুখে, ব্যাকুল গৃহ-প্রত্যা-গমনের বিরহ-কাতরতার সুর তখন অনুরণিত হয়ে উঠত তাদের প্রতি ডানা ক্ষেপণের পরতে পরতে—আমি যেন তা শুনতে পেতাম কান পেতে।...

বনের আখরোট গাছগুলো যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত আর তাদের কটকটে পোড়া গন্ধ যখন নাকে এসে পৌঁছত, মনটা আমার টনটন করে উঠত ব্যথায়।...

লাল ধূলি-ধূসরিত পল্লীর রাস্তার উপর গর্বিত চড়ুই পাখীগুলো যখন গড়াগড়ি, লুটোপুটি খেত আর গলা ফুলিয়ে বগড় বগড় কিচমিচ শব্দ করত, ভয়ানক আমার তখন রাগ হোত—ইচ্ছে হোত ওদের ব্যর্থ অনুকরণ করি।...

যখন দেখতাম মুখে খাবার নিয়ে কোন পিঁপড়ে সুদূর অনিশ্চিত এক যাত্রা পথে চলেছে দ্রুত পা ফেলে, একা একা তাকে নিশানদিহী করবার জন্য আমি উঠতাম মরিয়া হয়ে।...

ভাঙা মরচে-ধরা কোন এক টিনের মধ্যে ফিকে নীল রঙের একটা কুঁচো চিংড়ী মাছ হয়তো কোনদিন পেয়ে গেলাম। সে বেচারী তো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েই রইল জল কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমি যখন তাকে অকারণ নির্যাতন করতাম, মনটা তখন ছেয়ে যেত আমার দুর্বীষহ এক অনুশোচনায়!...

সোনালী আর লোহিত রঙের রাশি রাশি মেঘের ওপর যখন দূর অদৃশ্য সূর্যের কিরণ এসে পড়ত, চোখ ঝলসান কি অপরূপ বর্ণচ্ছটাই না তখন খেলে যেত!...

শাদা ধব্‌ধবে চুণকাম-করা দালান বাড়ির গোল গোল কাঁচের জানলাগুলির উপর সূর্যের রক্তিম আলো যখন প্রতিফলিত হয়ে উঠত, তা দেখে মহা আতঙ্কে আমি তখন শিউড়ে উঠতাম।...

ঝুপ ঝুপে বৃষ্টি পড়ার শব্দের মত বনের সবুজ পাতাগুলো যখন কেঁপে উঠত খস্‌খস করে, কেমন এক ক্লান্ত, নিস্তেজ অবসাদে ছেয়ে যেত আমার সর্বাঙ্গ।...

অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন কাঠের পচা সেই গুড়িটার আড়ালে শাদা শাদা ওই যে ব্যাঙের ছাতাগুলো গজিয়েছে, তার পশ্চাতে অসীম অনধিগম্য কি গোপন রহস্যই না নিহিত আছে কে জানে !...

সেবার বাবা যখন তুহাতে খ্যাচ্ করে মুরগী ছানার মুণ্ডুটা তুখান করে ফেললেন তার ধড় থেকে, অন্ধের মত ডানা ঝাপটিয়ে তখন মুরগী ছানাটা কি ভাবেই না ছট্‌পট করছিল এদিক-ওদিক। তাই দেখে দেখে আমি কেমন এক মৃত্যুহীন মরণের অপরূপ স্বাদ অনুভব করে ছিলাম !...

বিড়াল আর কুকুরগুলো যখন তাদের জিভ দিয়ে চেটে চেটে তুধ কি জল খেত, মহাকৌতুক আমি তখন অনুভব করতাম। আর ভাবতাম ভগবানের সৃষ্টির কি বিচিত্র লীলা !...

আক্-মাড়া কল দিয়ে যখন আকের মিষ্টি পরিষ্কার রস পড়ত গড়িয়ে তা দেখে আমার তখন কি দারুণ তৃষ্ণাই না পেয়ে যেত।...

নীল রঙের সাপগুলো শিথিল কুণ্ডলী পাকিয়ে অসাড় নিস্তেজ হয়ে যখন রোদ পোহাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, প্রথম প্রথম তাই দেখে আমি তো মহা দিশাহারা হয়ে যেতাম ভয়ে। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে যেত। হিম হয়ে যেত যেন রক্ত।...

শুকরের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে ওটাকে হত্যা করে যখন ফুটন্ত জলের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হোত, তারপর চামড়া ছাড়িয়ে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ী সব বার করে নিয়ে যখন টাঙিয়ে রাখা হোত রক্তাক্ত বীভৎস সেই শুকরটাকে, অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তা দেখতাম !...

নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে-থাকা শেওলা-পড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওক্ গাছগুলোর প্রতি আমার জন্মে উঠেছিল কেমন যেন এক প্রীতি ও ভালবাসা !...

টাট্‌কা এক পশলা বৃষ্টির পর মাটির সোঁনালী গন্ধ যখনই আমার নাকে এসে পৌঁছত, তখনই আমার জিভে এসে যেত জল।...

টাটকা, সবে-কাটা, নতুন ঘাসের গন্ধ যখনই আমার নাকে এসে ঢুকত, পেটটা তখন চনচন করে উঠত আমার ক্ষুধায়।...

নিরন্ধ্র নিশুতি রাত্রির অসংখ্য তারা-খচিত আকাশ থেকে যখন সোনালী রশ্মির ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে, আমি তখন কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়তাম। শিউড়ে উঠতাম অজানিত ভয়ে।...

মা একদিন বললেন, 'ক্যাটি-এডেমস্' নামে এক স্টীমারে করে আমরা সবাই মেম্‌ফিস্ যাব শীগগীর। কথাটা শোনার পর থেকেই দিন গুণতে শুরু করে দিলাম আমি। প্রত্যেক দিন রাত্রিতে আমি ভাবতাম, কাল সকাল হলেই যাওয়ার সময় হবে আমাদের।

'আচ্ছা মা, জাহাজটা কত বড় বল তো?' আমি মাকে শুধালাম।

'খুব প্রকাণ্ড—যেন একটা পাহাড়।'

'হুইশিল আছে না মা?'

'আছে বই কি।'

'ওটা বাজে না?'

'হ্যাঁ।'

'কখন মা?'

'কাপ্তেন যখন বাজাবেন।'

'আচ্ছা মা, ওরা ওটাকে ক্যাটি-এ্যাডেমস্ বলে কেনো?'

'ওটার নাম যে তাই।'

'জাহাজটা কি রঙের মা?'

'শাদা'।

'আচ্ছা মা, আমরা কতক্ষণ থাকব ওই জাহাজে ?'

'এক দিন আর এক রাত্তির।'

'আমরা কি সবাই জাহাজেই ঘুমাবো ?'

'হ্যাঁ, ঘুম পেলে ঘুমাবে বই কি। এখন চুপ করতো দেখি।'

দিনের পর দিন ধরে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, শাদা মস্ত এক ময়ূরপঙ্খী: নৌকায় চেপে আমি চলেছি সপ্ত সাগর ডিঙিয়ে। কিন্তু যাবার দিন মা যখন ঘাটকুলে নিয়ে গিয়ে ছোট নোংরা একটা স্টীমার আমায় দেখিয়ে দিলেন আমি তখন ভয়ানক দমে গেলাম। এই স্টীমার আর আমার কল্পনার সেই স্টীমার এক নয়। স্টীমারে চাপতে বলাতেই আমি কেঁদে ফেললাম। মা ভাবলেন তাঁর সঙ্গে মেম্‌ফিস যেতে আমি বুঝি চাচ্ছি না। কিন্তু প্রকৃত: কারণটা কি আমি তাঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। জাহাজের ওপর সব নিগ্রো যাত্রীরা কোথায় বা পাশা খেলছে, কোথায় বা বসে বসে তাশ পিটাছে, কেউ বা মদ গিলছে, হল্লা করেছে, গাইছে—এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন দেখতে লাগলাম, তখন আমি অনেকটা শান্ত হলাম। বাবা আমাকে ইঞ্জিন-ঘরে নিয়ে গেলেন নীচে। জীবন্ত কম্পমান ইঞ্জিনটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সব কিছু ভুলিয়ে দিল আমাকে।

মেম্‌ফিসে এসে আমরা গিয়ে উঠলাম ভাড়াটে একতলা এক পাকা দালান কুঠিরে। শানবাঁধান তার মলিন মেঝে দেখে মনটা আমার খিঁচিয়ে উঠল রীতিমত। সবুজ গাছ-পালা বিবর্জিত রুক্ষ এ শহরটা কেমন যেন ম্রিয়মান ঠেকল। বাবা, মা, ছোট ভাই আর আমি—আমরা এই চারটী প্রাণীর জন্য মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই হোল কেবল একটা শোবার ঘর আর একখানা রান্নাঘর মাত্র। বাড়ীটার সামনে আর পিছনের খানিকটা অংশ ছিল শানবাঁধান। আমি আর আমার ছোট ভাই সেখানে ইচ্ছে করলে

খেলতে পারতাম। নতুন শহরের রাস্তায় একা বেরুতে প্রথম প্রথম আমার কেমন ভয়ানক ভয় হোত।

ভাড়াটে এই বাড়ীতে এসে বাবার ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমার চোখের উপর প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেল স্ট্রীটের এক দাবাই-খানায় তিনি ছিলেন রাতের পাহারাদার। তিনি যখন দিনের বেলায় ঘুমুতেন তখন আমাদের উপর আদেশ ছিল কোন গোলমাল না করতে। তখনই কেবল বাবার অস্তিত্বের কথা মনে হোত। তিনি ছিলেন এ বাড়ীর সব দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। তার সামনে হাসা কি হাঁচা ছিল আমাদের একেবারে বারণ। বাবা যখন তাঁর বিপুল দেহের পাহাড় নিয়ে টেবিলে খেতে বসতেন আমি তখন রান্নাঘরের দরজায় ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর উঁকি মারতাম ভয়ে ভয়ে। টিনের মগ থেকে তিনি যখন বীয়ার গিলতেন অথবা বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে গোগ্রাসে খাবার খেতেন, চিবুতেন, হাঁপ নিতেন, ঢেকুর তুলতেন, চোখ বুঁজে তাঁর বিরাট ভুঁড়ির উপর হাত বুলোতেন, আমি তখন হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে থাকতাম চেয়ে। বাবা ছিলেন ভয়ানক রকমের মোটা। তাঁর স্ফীত ভুঁড়িটা পাট হয়ে পড়ে থাকত কোমরবন্ধের উপর। তিনি ছিলেন আমার নাগালের অনেক বাইরে—ছিলেন আমার কাছে সব সময় অনেকটা অচেনা অপরিচিত।

একদিন সকাল বেলা আমি ও আমার ভাই আমাদের ফ্ল্যাটের পিছন দিকটায় খেলছিলাম। এমন সময় কোত্থেকে রাস্তার একটা বিড়াল বাচ্চা এসে জুটল আর ম্যাঁও-ম্যাঁও করে চিৎকার শুরু করে দিলে অবিশ্রান্ত। বাচ্চাটাকে আমরা কিছু খাবার এনে দিলাম। জলও দিলাম খানিকটা। তবু কিন্তু বাচ্চাটা ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডাকতে লাগলে। চোখে ঘুম নিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বাবা এবার বেরিয়ে এলেন পিছনের দরজায়। ভালো

করে পোষাকটা পরবারও তিনি অবসর পাননি। তিনি এসে আমাদের চুপ করতে বললেন। আমরা তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে বিড়ালের বাচ্চাটাই সব গোলমাল করছে, আমরা নই। ওটাকে তাড়িয়ে দিতে বাবা তখন বললেন। আমরা তাড়িয়ে দিতে গেলাম বাচ্চাটাকে। কিন্তু ওটা যদি এক পাও নড়ত! বাবা তেড়ে এলেন হাত উঁচিয়ে:

'দূর—দূর!'

তবুও হতভাগা বিড়াল বাচ্চাটা যদি যাবার নাম করত! বরং সে এসে আমাদের পায়ে গা ঘষতে লাগল আর আর্ত করুণস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলে ম্যাঁও-ম্যাঁও করে।

'নচ্ছার বাচ্চাটাকে মেরে ফেল ত একেবারে', বাবা রাগে ফেটে পড়লেন। 'যা ইচ্ছে তাই কর; দূর কর ওটাকে এখান থেকে।'

গজগজ করতে করতে তিনি আবার ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর হাঁকডাকে মনে মনে আমি চটে গিয়েছিলাম। কিন্তু সব আক্রোশটা তখন সয়ে যেতে হোল আমায় মুখ বুজে। কি করে তার শোধ নেয়া যায় ফন্দি খুঁজতে লাগলাম। হ্যাঁ, ভালোই হোল!...বিড়াল ছানাটাকে মেরে ফেলতে তিনি তো বলে গেছেন। ওটাকে আমি মেরেই ফেলব। আমি ঠিক জানতাম, বাবা সত্যি সত্যি বিড়াল ছানাটাকে মেরে ফেলতে বলে যাননি। কিন্তু বাবার প্রতি আমার অন্তরের গভীর বিদ্বেষই আমাকে তাঁর নির্দেশ হুবহু মেনে নিতে প্ররোচিত করল।

'শুনলি তো, বাবা কি বলে গেলেন? বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে বললেন না?' ভাইয়ের কাছে কথাটা আমি পাড়লাম।

'কই, বাবা তো তা বলেন নি,' ভাই জবাব দিলে।

'হ্যাঁ, আলবৎ বলেছেন। দ্যাখ না, ওটাকে আমি এখন মেরে ফেলছি।'

'যাও না, দেখবে ও কেমন খিমচিয়ে দেবে।'

'মেরে ফেললে তো আর খিমচি কাটতে পারবে না ও ?'

'বাবা কিন্তু বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে বলেন নি দাদা,' ভাই আবার প্রতিবাদ করলে।

'হ্যাঁ, আলবৎ বলেছেন। তুই কানে শুনলি না ?'

ভাই পালিয়ে গেল ভয়ে। একটা দড়ি খুঁজে নিয়ে আমি এক ফাঁস তৈয়েরী করলাম। তারপর ফাঁসটাকে বাচ্চাটার গলায় পরিয়ে একটা পেরেকের উপরটায় গলিয়ে নিলাম দড়িটাকে। তারপর হেঁচকা একটা টান মেরে বিড়াল ছানাটাকে মাটি থেকে তুলে নিলাম শূন্যে বেশ খানিকটা। পাক খেতে খেতে বাচ্চাটা হাঁসফাস করতে লাগল, পাগলের মত শূন্যে আঁচড় কাটতে লাগল, টস্‌টস করে গড়িয়ে পড়ল রক্ত তার মুখ থেকে। বাচ্চাটা ফুলে উঠল অনেকখানি। তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল এক সময়। শাদা ধারাল জিভ্‌টা বেরিয়ে এল। দড়িটা পেরেকের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে আমি ভাইয়ের খোঁজে গেলাম। দেখলাম, পিছনের দালানের এক কোণায় হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে সে চুপচাপ।

'জানিস, সাবাড় করে দিলুম ওটাকে,' ফিসফিস করে তাকে জানালাম।

'কাজটা কিন্তু ভাল করো নি দাদা,' সে উত্তর দিলে।

'কিছু তুই বুঝিসনে, স্থাখবি বাবা এবার কেমন নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পারেন।'

'বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে বাবা তো তোমায় বলেন নি ?'

'না, বলেন নি ! নইলে বুঝি উনি অমন করে বলতেন ?'

ভাই কোন উত্তর দিলে না। শূন্যে ঝুলন্ত বিড়াল ছানাটির দিকে এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ভয়ার্ত চোখ দুটি তুলে।

'দেখো না, ওটা এবার তোমার পিছু নেবে,' ভাই আমাকে সাবধান করে দিল।

'হ্যা, ও আমার পিছু নেবে! ওটা মরে কবে ভূত হয়ে গেছে!'

'দাঁড়াও, আমি মাকে বলতে যাচ্ছি এক্ষুনি।' ছুটতে ছুটতে ভাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। স্থির করলাম, ভালো-মন্দ কিছু বিবেচনা না করে রাগের মাথায় বাবা যা বলেছিলেন মাকে তা শুনিয়ে দিয়ে আমি আজ আত্মরক্ষার সাফাই গাইব। বিড়বিড় করে আমি আওড়াতে লাগলাম বাবার কথাগুলি। পরনের গাউনে হাত মুছতে মুছতে মা ছুটে এলেন। শূন্যে ঝুলানো বিড়াল ছানাটার উপর তাঁর চোখ পড়তেই তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। মুখখানি শুকিয়ে শাদা হয়ে গেল তাঁর।

'মাগো, কেনো অমন করতে গেলি?'

'বিড়াল বাচ্চাটা খুব গোলমাল করছিল কিনা বাবা তাই বললেন মেরে ফেলতে।' আমি সাফাই গাইলাম।

'এবার যখন বাবা ধরে মারবেন মজা টের পাবে, হাঁদা কোথাকার।'

'বাঃ, বাবা বললেন যে!'

'চুপ কর!'

হাত ধরে টানতে টানতে মা আমায় নিয়ে গেলেন বাবার বিছানার কাছে। কীর্তিখানা আমার জানালেন।

বাবা বিকট একটা চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি কি বলেছিলাম তুই তা ভালো করেই জানতিস্!'

'ওটাকে মেরে ফেলতে তুমি বললে না?'

'না, জানতাম না ?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ছোট একটা কোদাল এনে মা আমার হাতে তুলে দিলেন।

'যাও, গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাটাকে কবর দিয়ে এসো।'

নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে আমি পা বাড়ালাম বাইরের মিশকালো অন্ধকারের দিকে। ভয়ে আমার পা দুটি আড়ষ্ট হয়ে এল। বিড়াল বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছি সত্য ; কিন্তু মার কথা শুনে আমার এবার মনে হতে লাগল, ওটা বুঝি আবার জীয়িয়ে উঠেছে ! মরাটাকে ছুঁলে আমায় হঠাৎ কি করে বসবে, বলা যায় না। হয়ত আমার চোখ দুটি উপড়ে নেবে ধারাল তার নখ দিয়ে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে আমি যখন মরা বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, মাও বুঝি পিছু পিছু আমার আসছিলেন অলক্ষ্যে। তাঁর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমায় দিল নতুন প্রেরণা।

'মা, একটু কাছে এসে দাঁড়াও না।' আমি তাঁকে কাকুতি করলাম।

'কেনো, বিড়াল ছানাটার পাশে কে দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ ?' মা আমাকে খোঁচা দিলেন। রাত্রির জমাট অন্ধকার থেকে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

অন্ধকারে আমার মনে হতে লাগল বিড়াল বাচ্চাটা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলেছে তার চোখ দুটিতে ! আমি পিছিয়ে এলাম : 'না, ওটাকে ছোঁব না আমি কিছুতেই।'

'বাঁধনটা খুলে দে।' মা হুকুম করলেন। হাত আমার কাঁপতে লাগল। কোন রকমে দড়ির বাঁধনটা খুলে দিতেই বাচ্চাটা ধপ্ করে পড়ে গেল মাটীর উপর। ধপ্ করে পড়ার এই শব্দটা অনেক দিন পর্যন্ত কানে আমার লেগে রয়েছিল। পরে মার কথা মত মাটীতে একটা গর্ত খুঁড়ে মরা শক্ত বিড়াল বাচ্চাটাকে কবর দিলাম। ঠাণ্ডা অন্ধার ওর

দেহটা ছুঁতে গিয়ে আমি শিউরে উঠলাম বার বার। বিড়াল বাচ্চাটাকে কবর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি বুঝি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। মা কিন্তু হাত ধরে আমায় আবার নিয়ে গেলেন কবরের পাশে। বললেন :

'চোখ বুঁজে এবার বল আমার সঙ্গে সঙ্গে।'

মার হাত আঁকড়ে ধরে আমি জোরে চোখ বুঁজলাম।

'পরম পিতা হে ঈশ্বর, আমি কি করিলাম আমি জানি না—আমায় ক্ষমা করুন!'

মার মুখে মুখে আমি আউড়াতে লাগলাম।

'যদিও বিড়াল ছানাটার প্রাণ আমি হরণ করিয়াছি তবুও আমার প্রতি আপনি সদয় হউন!'

আমিও আউড়ালাম, 'বিড়াল ছানাটার প্রাণ আমি হরণ করিয়াছি তবুও আমার প্রতি আপনি সদয় হউন!'

'আজ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে আমার প্রাণ হরণ করিবেন না...।'

এবার চোখ মেলে আমি তাকালাম। কিন্তু আমার কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। আড়ষ্ট হয়ে গেলাম ভয়ে। চোখের উপর ভেসে উঠল : আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে যেন এসে আমার টুঁটিটা চেপে ধরেছে বজ্র মুষ্টিতে ; ছটফট করছি আমি—নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। মার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি অন্ধকারে দৌড় দিলাম কাঁদতে কাঁদতে। সর্বাঙ্গ আমার কাঁপতে লাগল ভয়ে।

'না!' আমি ফোঁপাতে লাগলাম।

মা আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি কিন্তু গেলাম না কিছুতেই।

'হ্যাঁ, এবার বোধ হয় ঠিক সাজা হয়েছে তোমার।' মা এক সময় বললেন।

যখন ঘুমুতে গেলাম, অনুশোচনায় আমার বুকটা ভরে গেল। প্রার্থনা করলাম, আর যেন কোন দিন জীবনে বিড়াল ছানার মুখ দর্শন না করি।

ধীর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শুরু হোল এবার অসহ্য বুভুক্ষার গোপন অভিযান। আমি প্রথম প্রথম তার ধারাল দাঁতের তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি করি নি। ইতিপূর্বে আমি যখন খেলতে যেতাম তখন অনেক দিনই খিদের জ্বালা অল্পবিস্তর অনুভব করতাম। এখন কিন্তু রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল। আর জেগে উঠেই আমার মনে হোত, কৃশ অস্থিচর্মসার ভয়াল চোখ দুটি তুলে আমার দিকে সে যেন তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ একদৃষ্টিতে! এর আগেও বুভুক্ষার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু সে ত এমন নির্ম্মম, নিষ্করুণ, বৈরভাবাপন্ন অজ্ঞাত-কুলশীল ছিল না। ছিল স্বাভাবিক। একজন্য অবশ্য বার-বার খাবার চাইতে হোত আমাকে। দু-এক গ্রাস মুখে দিলেই স্বাদ মিটে যেত। কিন্তু নূতন এই ক্ষুধার কাছে আমি পরাভূত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলাম। বদরাগী আর জেদী হয়ে উঠলাম। মার কাছে এখন খাবার চাইলে এক পেয়ালা চা তিনি এগিয়ে দেন। সেটা খেলেই পেটের জ্বালাটা মিনিট দুই কিছুটা উপশম হয় বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার শুরু হয় তীব্র যন্ত্রণা। খালি পেটে আমার নাড়িভুঁড়ি-গুলোকে দুমড়ে মুচড়ে, টেনে হিঁচড়ে যেন কারা খাচ্ছে চিবিয়ে চিবিয়ে। আমি গোঁঙিয়ে উঠতাম ব্যথায়। চোখ দুটি হয়ে উঠত ঘোলাটে। ঝিমিয়ে পড়তাম। খেলা-ধুলোতে তেমন উৎসাহ পেতাম না আগেকার মত। জীবনে এই বুঝি প্রথম চুপ করে আমি ভাবতে শিখলাম, এ কি হোল আমার?

'মা, আমার যে খিদে পেয়েছে।' একদিন বিকেলবেলা মার কাছে গিয়ে আমি খাবার চাইলাম।—'আমায় খেতে দাও।'

'একটু সবুর কর বাবা।' মা জবাব দিলেন।

'না, এক্ষুনি খেতে দাও আমায়।'

'কিন্তু ঘরে যে কিছু খাবার নেই!'

'নেই কেন?'

'নেই—কেন আবার কি?' তিনি বুঝিয়ে বললেন।

'কিন্তু আমার যে এদিকে ভয়ানক খিদে পেয়েছে মা।' আমি কাঁদতে শুরু করে দিলাম।

'একটু সবুর কর না।'

'কেন শুনি?'

'দেখি, ভগবান যদি একবার আমাদের উপর চোখ তুলে তাকান।'

'ভগবান কখন চোখ তুলে তাকাবেন, মা?'

'জানি নে!'

'কিন্তু আমার যে এদিকে খিদে পেয়েছে, মা।'

মা জামা ইস্ত্রী করছিলেন। ইস্ত্রী করতে করতে থেমে গেলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন চোখ তুলে। জলে টলমল করছে তাঁর চোখ দুটি। শুধালেন:

'তোর বাবা কোথায়?'

আমি তাকিয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে। হ্যাঁ, তাই তো, বাবা যে আর ঘুমুতে আসেন নি অনেকদিন। তাই বুঝি খুশিমত গোলমাল করে বাড়িটাকে তুলে বসালেও কেউ কিছু বলতে আসেনি আমাদের। বাবা আসেন না কেন, আমি জানতাম না। কিন্তু আমার খুব আনন্দ হোল কথাটি শুনে। কেননা, বাবা তো আর নেই আমায় চুপ করতে

বলে ধমকাতে। কিন্তু এ বুদ্ধিটা আমার মাথায় তখনও খেলেনি যে বাবা না এলে আমাকেও না খেয়ে শুকিয়ে থাকতে হবে ।

'আমি জানি না।' উত্তর দিলাম।

'বাড়িতে খাবার যোগায় কে?' মা আবার প্রশ্ন করলেন।

'কেনো বাবা; বাবাই তো হামেশা খাবার নিয়ে আসতেন।'

'হ্যাঁ, তিনিই আনতেন; কিন্তু বাবা যে তোর এখন নেই এখানে।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানিনে!'

'কিন্তু আমার যে খিদে পেয়েছে,' পা ছুঁড়ে আমি নাকি কান্না শুরু করে দিলাম।

'দেখি কাজ-কম্ম একটা যোগাড় করে নি, তখন আবার খাবার আসবে। ততদিন কিন্তু সবুর করে থাকতে হবে।'

যত দিন যেতে লাগল ক্ষুধার পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখখানাও আমার মনে জাগতে লাগল। ক্ষুধার জ্বালা শুরু হলেই তাঁর প্রতি কেমন এক বিজাতীয় দারুণ জৈবিক বিতৃষ্ণায় মনটা আমার ভরে উঠত।

অবশেষে মা পাচিকার একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন। একটা পাঁউরুটি আর এক মগ চা আমাদের সামনে রেখে মা রোজ কাজে বেরিয়ে যেতেন। আমি আর আমার ভাই একাই থাকতাম বাড়িতে। সন্ধ্যে বেলা মা যখন বাড়ি ফিরতেন তখন ভয়ানক ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়তেন। কাঁদতেনও খুব। অনেক দিন তিনি তখন আমাদের কাছে ডেকে নিতেন। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বলে যেতেন আমাদের সঙ্গে। বলতেন, এখন আর আমাদের বাবা নেই। আর আর ছেলেদের মতো আমরা আর চলতে পারব না। এবার থেকে সব কিছুই নিজেদের

শিখে নিতে হবে। খানিকটা ভয় পেয়ে আমরাও তাই যথারীতি মেনে নিতে প্রতিজ্ঞা করলাম। মা আর বাবার মধ্যে কি যে হয়েছে আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারিনি। তবে দিনের পর দিন ধরে মার কথা শুনে শুনে মনটা কেমন এক অনিশ্চিত ভয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বাবা কোথায় গেছেন মাকে যখনই শুধাতাম, তিনি বলতেন, আমরা নাকি এখনও ছোট, ওসব বুঝব না।

একদিন বিকেলবেলা মা আমাকে ডেকে বললেন, এবার থেকে আমায় নাকি বাজারে যেতে হবে। মোড়ের দোকানটা চিনিয়ে আনতে তিনি তখন আমায় নিয়ে গেলেন। বাবার মত বড়ো হয়ে গিয়েছি বলে আমার ভারি গর্ব হোল। পরদিন বিকেলে বাজারের ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে রাস্তা ধরে আমি চললাম দোকানের দিকে। গলিটার মোড়ের কাছে পৌছুতেই একদল ছেলে কোত্থেকে আমাকে ঘিরে ধরল চার পাশ থেকে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ওরা ছিনিয়ে নিল আমার ঝুড়িটা; পয়সা-কড়ি সব নিলে কেড়ে। তেড়ে নিয়ে এল আমাকে বাড়ী পর্যন্ত। সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলে মাকে আমি সব জানালাম। তিনি মুখে কিছুই বললেন না; কেবল ছোট্ট একটুকরো কাগজে কি সব লিখে আরও পয়সা দিয়ে আমাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন মুদির দোকানে। ভয়ে ভয়ে রাস্তায় নেমে দেখলাম, ঐসব ছেলেরা তখনও খেলছে রাস্তার উপর। আমি ছুটে বাড়ী ফিরে এলাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন: 'কি হোল?'

'সেই ছেলেগুলো মা, ওরা আমায় আবার মারবে—!'

'ভয় করলে তোমার চলবে কি করে? আবার যাও।'

'আমার যে ভয় করছে মা।'

'ওদের দিকে তাকাস নে তুই। যা।' মা হুকুম করলেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা ঘেঁষে ধীরে ধীরে পা ফেলে আমি চললাম। আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, ছেলেগুলো যেন আর চড়াও না হয় আমার উপর। কিন্তু ওদের কাছাকাছি আসতেই দলের একজন চিৎকার করে উঠল :

'ওই ছাখ আবাব আসছে রে!'

আমার দিকে ওরা তেড়ে আসতেই উর্দ্ধশ্বাসে আমি দৌড় দিলাম বাড়ীর দিকে। ওরা আমায় ধরে ফেলল আর ছুড়ে ফেলে দিল বাড়ীর চাতালের উপর। আমি চিৎকার করে উঠলাম। অনেক কাকুতি করলাম; পা ছুড়লাম। কিন্তু তবুও আমার হাত থেকে পয়সাগুলি ওরা নিল কেড়ে। আমার পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূর পর্যন্ত। কয়েক ঘা চড়ও আমায় বসিয়ে দিল। কাঁদতে কাঁদতে আমি বাড়ী এলাম। দরজার সামনেই দেখা হোল মার সঙ্গে।

'ও-রা আ-আ-আ-ম্মা-মায় মারলে মা।' আমি ফোঁপিয়ে উঠলাম— 'আ-মা-র প-পয়সা কড়িও সব কে-কে-কেড়ে নিল।'

সিঁড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিলাম। মা চড়া গলায় বলে উঠলেন :

'বাড়ীতে ঢুকো না বলছি।'

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। চোখ তুলে বললাম : 'ওরা যে তেড়ে আসছে মা আমার পিছু পিছু।'

'যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো সেখানে।' বজ্রকণ্ঠে মা আবার বলে উঠলেন।—'রসো, নিজেকে সামলে চলার শিক্ষেটা আজকে তোমাকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে।'

মা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভয়ে ভয়ে। একটু পরেই মা আবার ফিরে এলেন।

নিয়ে এলেন আরও পয়সা আর নতুন আর একটা ফর্দ। লম্বা মোটা একটা লাঠিও আনলেন সঙ্গে করে।

'পয়সা, ফর্দ আর এই লাঠিটা রইল।' মা বলে চললেন—'দোকানে গিয়ে জিনিষ-পত্তোর নিয়ে এসো সব। সেই ছেলেগুলো যদি আবার তাড়া করে; তবে ঠ্যাঙিয়ে দিও এই লাঠিটা দিয়ে।'

আমার কেমন যেন খটকা লাগল। মা বলছেন আমায় মারামারি করতে? মারামারি করতে তিনিই তো আমায় বারণ করেন!

'কিন্তু আমার যে ভয় করছে মা।'

'তাহোলে কিন্তু ঢুকতে পারবে না বাড়ীতে। দোকান থেকে মালপত্র না আনলে বাড়ী ঢুকতে পারবে না বলে রাখলাম।'

'ওরা যে আমায় মারবে মা, আমায় মারবে!'

'বেশ তাহোলে পড়ে থেকো রাস্তায়। বাড়ী ঢুকতে পারবে না কিন্তু'

সিঁড়ি পার হয়ে আমি তাঁর পাশ কেটে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। আমার গালে এসে পড়ল প্রচণ্ড একটা চড়। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম আর বলতে লাগলাম: 'কাল সব এনে দেব মা, আজ নয়।'

'না। এক্ষুণি যেতে হবে!' মা হুকুম করলেন, 'মুদির দোকান থেকে জিনিষ সব না এনে বাড়ি ঢুকবে তো চাবকিয়ে আমি তোমায় লাল করে দেবো!'

মা সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কুলুপ লাগিয়ে দেওয়ার শব্দও শোনা গেল। ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। অন্ধকার রাস্তায় আমি কেবল একা, আশেপাশে শত্রুরা কিলবিল করছে—ছেলেদের দলটা আবার বুঝি তেড়ে আসছে! বাড়ি ঢুকলেও মার খেতে হবে, বাইরে গেলেও। উভয় সংকটেই পড়া গেল! কাঁদতে কাঁদতে লাঠিটাকে

আমি আঁকড়ে ধরলাম বজ্রমুষ্টিতে। নিজেকে শুধোতে লাগলাম, বাড়ি ঢুকলেই তো মার খেতে হবে পড়ে পড়ে। কিছুই আমার আর করার থাকবে না। আর রাস্তায় গিয়ে যদি মারই খাই তো হাতের লাঠিটা দিয়ে দু'এক ঘা শোধ দিতে পারবো, আত্মরক্ষাও করতে পারব। এই ভেবে রাস্তার কোণ ঘেষে গুটি গুটি আমি পা বাড়ালাম। ছেলেদের দলের কাছাকাছি যেতেই হাতের লাঠিটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলাম। দম বুঝি আটকে আসতে লাগল ভয়ে। এই বুঝি এসে পড়লাম ওদের কাছাকাছি!

'ওরে, সেই ছোঁড়াটা! আবার আসছে রে!' এক সঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে উঠল।

ছুটে এসে ওরা ঘিরে ফেলল আমায়।

'মেরে ফেলব বলছি।' লাঠি গাছটা বাগিয়ে ধরে আমি ওদের শাসিয়ে উঠলাম। ওরা কিন্তু সমানে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি এদিক-ওদিক লাঠি ঘুরাতে লাগলাম। ঠক্ করে একটা শব্দ হোল। একটা ছেলের মাথায় বুঝি লাঠি পড়ল! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে আমি আর একটা ছেলের মাথা লক্ষ্য করে আমার আঘাত করলাম। তারপরে আরও একটাকে। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে প্রতিশোধ নেবার জন্য ওরা যদি আমাকে আবার আক্রমণ করে বসে এই আশংকায় মরিয়া হয়ে আমি লাঠি চালিয়ে যেতে লাগলাম সমানে। দাঁতে দাঁত আমার বসে গেল। চোখ দুটি জলে ছাপিয়ে উঠল। লাঠির প্রত্যেকটা আঘাতের সঙ্গে আমি আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলাম। হাত থেকে পয়সাকড়ি সব আর মুদির দোকানের সেই ফর্দটা পড়ে গেল কখন। তবু আমি লাঠি চালিয়ে

চললাম সমানে। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ওরা এবার ভেগে পড়ল ত্রাহি ত্রাহি করে। পেছন ফিরে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বুঝি একবার তাকিয়েও গেল। অমন মারটা বুঝি জীবনে আর কখনও খায়নি ইতিপূর্বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি হাঁপাতে লাগলাম। মারামারির সাধ ওদের মিটে গেল কিনা শুধালাম বিদ্রূপ করে। কেউ যখন আর এগোলো না, আমি তখন ওদের পিছু তাড়া করলাম। ডাক ছেড়ে ওরা তখন আপন আপন বাড়ির দিকে দৌড় দিলে চোঁ চোঁ করে। চেঁচামেচি শুনে ওদের বাপ-মারা রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমায় শাসাতে লাগল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওদেরও ঠেঙিয়ে দেবো বলে আমি তখন জানিয়ে দিলাম। এই বুঝি প্রথম আমি বয়স্কদের মুখের উপর সমানে মুখ তুলে গলা বাজিয়ে গেলাম। মুদির দোকানের ফর্দটা আর পয়সাগুলি আবার কুড়িয়ে নিয়ে আমি এবার চললাম দোকানের দিকে । ফিরবার সময় লাঠিটাকে আবার বাগিয়ে ধরলাম। কিন্তু ওদের কারোর টিকির সন্ধানটিও আর মিলল না। সেদিন রাত্রিতে মেম্‌ফিস শহরের রাজপথে আমার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে আমি বাড়ি ফিরলাম।

মা কাজে বেরিয়ে গেছেন। এক গ্রীষ্মকালের সকালে একদল কালো নিগ্রো ছেলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লাম আমিও। কাজে বেরবার আগে বাপ-মা এদের রোজ ছেড়ে দিয়ে যায় বাইরে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঢালু এক পাহাড়ের নীচে আমি এক সময় এসে পড়লাম । এই ঢিপিটার উপর দিকটায় ছিল লম্বা একসার নড়বড়ে কাঠের পুরোন সরকারী টাট্টিখানা। এই টাট্টিখানার পেছন দিকটায় কোন ঢাকা-ঢোকাই একরকম ছিল না—দিব্যি দেখা যায় নীচ থেকে। ঢালু পাহাড়টার নীচে কাত হয়ে শুয়ে আমরা ওদিকে তাকিয়ে থাকতাম।

আর বিশ-পঁচিশ ফুট উপরে কালো, লালচে, তামাটে কিংবা ফুটফুটে ফরসা নানান বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের কিম্ভূতকিমাকার গোপন অপাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। এ দেখেই আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের চিনে নিতাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে ফিস্‌ফাস করে আমরা হাসাহাসি, ঠাট্টা-তামাসা করতাম। মল বার করতে ওরা কেমন কোঁত দেয় তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বেড়াতাম কিংবা ওদের মল কতখানি দূরে গিয়ে ছিটকে পড়বে গবেষণা শুরু করে দিতাম তাই নিয়ে। বুড়োরা বুঝি একদিন আমাদের দেখে ফেলেছিল। ক্রুদ্ধ হাঁক ছেড়ে তাড়া করে এসেছিল আমাদের।

তারপর থেকে দু-তিন বছরের ছোট ছোট ছেলেদের মাঝে মাঝে কোনদিন দেখা যেতো পাহাড়ের ওদিক থেকে বেরিয়ে আসতে! সারা মুখ তাদের নোংরা হয়ে গিয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসেও ময়লার বিশ্রী দুর্গন্ধ। শেষকালে টাট্টিখানার আশপাশ থেকে ছেলেদের ভাগিয়ে দেবার জন্য একজন গোরা পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছিল। মানব-দেহের গোপন স্থান সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা আপাতত এখানেই শেষ হয়ে গেল।

এ সব বদ ছেলেদের সঙ্গ থেকে রক্ষা করবার জন্য মা আমাদের অনেক সময় নিয়ে যেতেন যে বাড়ীতে তিনি রান্না করতে যেতেন সেখানে। রান্নাঘরের এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা সব দেখতাম: মা অবিরত ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন উনানের পাশ থেকে যাচ্ছেন একবার বাসনকোসন ধোবার যায়গায়, সেখান থেকে খাবার রাখার আলমারীর কাছে, সেখান থেকে আবার চলেছেন টেবিলের কাছে। আমরা সব দেখতাম আর ক্ষিধেয় পিত্তি আমাদের জ্বলে যেত। মা যখন কাজ করতেন তখন শ্বেতাঙ্গদের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে সব সময় আমার

খুব ভালো লাগত। কেননা, দু-এক টুকরো মাংস কি খানিকটা রুটি আমার বরাতে ঠিক জুটে যাবে আমি জানতাম। রান্নাকরা খাবারগুলি গন্ধে চারদিক মৌ-মৌ করত। আমার নাকে এসে লাগত সেই সুবাস। সবটা খেয়ে ফেলতে আমার ভারী ইচ্ছে হোত। কিন্তু ওসব খাবার যে আমাদের জন্য নয়; খেতে বারণও আছে—কথাগুলি মনে পড়লেই মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যেত। অনুতাপ হোত, না এলেই যেন ভালো করতাম। সন্ধ্যের দিকে মা গরম গরম খাবারের ডিসগুলি খাবারঘরে নিয়ে যেতেন। শ্বেতাঙ্গ অনেক সাহেব আর মেম এসে তখন জড়ো হয়েছে ওই ঘরে। দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমি উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করতাম। টেবিল ঘিরে বসে ওরা সবাই খাচ্ছে, হাসছে আর কথা কইছে। যদি কোন খাবার ওরা ফেলে যেতো পাতে, আমি আর আমার ভাই তাই খেতাম পরম তৃপ্তির সঙ্গে। নইলে আর আর দিনের মত রুটি আর চা-ই জুটত আমাদের ভাগ্যে।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের খেতে দেখলে আমার পেটটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠত। কেমন যেন রাগ হোত নিজের উপর। ক্ষিদে পেয়েছে যখন খাবো না কেনো? আর সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেনই বা আমি বসে থাকব—এ সব প্রশ্ন আমি শুধোতাম নিজেকে। একটা কথা কিন্তু বুঝে উঠতে পারতাম না কিছুতেই: কেউ কেউ খাবে পেট ভরে আবার কেউ কেউ কেন খেতেই পাবে না মোটে!

শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে মা যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন আমি তখন সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে ছিল এক শুঁড়িখানা। সারাদিন আমি তার আশে-পাশে ঘোরাফেরা শুরু করতাম।

শুঁড়িখানার ভিতরটা আমাকে একাধারে মুগ্ধ, প্রলুব্ধ আর আতংকিত

করে তুলত। তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি লোকের কাছে পয়সা চাইতাম আর দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতাম স্ত্রী-পুরুষেরা বসে বসে মদ খায় কি করে। পাড়ার কেউ যদি আমায় দেখতে পেয়ে ভাগিয়ে দিত, আমি তখন রাস্তার মাতালদের পিছু নিতাম। তাদের অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, আবোল-তাবোল কথাগুলির অর্থোদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। ভ্যাঙিয়ে উঠতাম তাদের অনুকরণ করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে হেসে উঠতাম। জ্বালিয়ে উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম ওদের। মাতাল মেয়েদের দেখলেই আমার কিন্তু মজা লাগত সব চাইতে বেশী। চলতে গিয়ে ওরা পড়ে যেত হুমড়ি খেয়ে, প্রস্রাব করে ফেলত। মোজা-আঁটা পা বেয়ে সেই প্রস্রাব পড়ত চুইয়ে চুইয়ে। এই দৃশ্য দেখে আমি খুব উপভোগ করতাম। আর যখন দেখতাম পুরুষেরা বমি করেছে ওয়াক-ওয়াক করে, আমার গা তখন শিউরে উঠত কাঁটা দিয়ে। শুঁড়িখানার চারপাশে যে আমি ঘুরে বেড়াই, একথা কে বুঝি বলে দিয়েছিল মাকে। মা আমাকে ঠ্যাঙালেন আচ্ছা করে। মা কিন্তু বেরিয়ে গেলেই শুঁড়ি-খানার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার জন্যে কিংবা মাতালদের আবোল-তাবোল কথা শোনার জন্য আমি আবার ছুটে যেতাম।

ছয় বছরে আমি তখন পা দিয়েছি। গ্রীষ্মকালের এক বিকেলবেলা আর আর দিনের মত সেদিনও আমি আমাদের পাড়ার শুঁড়িখানার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, এমন সময় কোথা থেকে এক কালা আদমি এসে আমায় হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভেতরে। ধোঁয়া আর হট্টগোলে ঘরটা তখন ভরে উঠেছে। মদের কড়া গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। ঘর-ভরতি অতগুলি লোক আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম ভয়ানক।

চেঁচিয়ে উঠে লোকটার হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

লোকটা কিন্তু আমায় ছাড়ল না। দু'হাতে ও আমায় কাউণ্টারের উপর তুলে বসালে। নিজের টুপিটা আমার মাথায় দিলে পরিয়ে। হুকুম করল মদ নিয়ে আসতে আমার জন্ত। তাই দেখে ঘরের মস্ত স্ত্রী-পুরুষেরা সবাই হেসে উঠল অট্টহাস্তে। কে বুঝি আমার মুখে একটা চুরুটও গুঁজে দিচ্ছিল, আমি মুখটা সরিয়ে নিলাম।

'কি হে ছোকরা, ভদ্রলোকের মত এখানে বসে থাকতে কেমন লাগছে?' কে যেন শুধালে।

'ওকে খানিকটা মদ খাইয়ে দাও হে! নইলে ও উঁকি মারা ছাড়বে না।' কে যেন আবার বললে।

'হ্যাঁ চল, আজ ওকে সবাই আমরা মদ কিনে খাওয়াই।' কে যেন ফোড়ন দিলে।

মুখ তুলে তাকাতে তাকাতে আমার ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। দেখলাম হুইস্কি এসে গেছে আমার জন্ত।

'খেয়ে নাও হে ছোকরা, খেয়ে নাও।' কে যেন বলে উঠল।

আমি মাথা নাড়লাম। যে লোকটা আমায় ধরে এনেছিল, সে এবার আমায় অনুরোধ করতে লাগল মদটা খেয়ে নিতে। ওইটুকুন খেলে পর আমার নাকি কোন অনিষ্ট হবে না। তবুও আমি অস্বীকার করলাম।

'খাও হে, খাও; এটুকুন খেলে দেখবে কেমন চাঙা হয়ে উঠবে তুমি', ও আবার বললে।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়েই আমি কেশে ফেললাম। শুঁড়িখানার সবাই দেখলাম এবার ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে। সবাই অনুরোধ

করতে লাগল খেয়ে নিতে। আর একটা চুমুক দিলাম। তারপর আরও একটা। মাথাটা আমার ঘুরতে লাগল। আমি হেসে উঠলাম। ওরা আমায় নামিয়ে দিল মেঝেতে। হাসির রোল উঠল ভিড়ের মধ্যে। আমি তখন খিল খিল করে হাসতে হাসতে আর চিৎকার করতে করতে ছুটাছুটি শুরু করে দিলাম। পাশ কেটে যাবার সময় ওরা প্রত্যেকে নিজেদের মদের গ্লাশটা বাড়িয়ে দিতে লাগল আমার দিকে। আমিও একটা করে চুমুক দিয়ে যেতে লাগলাম। আমি শীগ্‌গীর মাতাল হয়ে গেলাম।

ভিড় থেকে একটা লোক আমায় এবার ডেকে নিয়ে গেল কাছে। ফিশফিশ করে কি সব কথা বললে সে আমার কানে কানে। একটা মেয়েকে দেখিয়ে দিয়ে তারপর জানালে, আমি যদি ওর শিখিয়ে দেয়া কথা ক'টি ওই মেয়েটাকে বলে আসতে পারি তা হোলে সে একটা পয়সা দেবে আমাকে। আমি রাজি হলাম। একটা পয়সা সে দিল তখন আমাকে। মেয়েটার কাছে ছুটে গিয়ে আমি তখন ওর শেখান কথাগুলি বলে এলাম।

আর এক লহর হাসির রোল উঠল শুঁড়িখানার মধ্যে।

'এখনো একেবারে বাচ্চা ছেলেমানুষ, এসব শিখিয়ো না ওকে।' কে যেন বললে।

'ছাইপাশ কি যে বলছে, নিজেই জানে না।' আর একজন তার জের টানলে।

তারপর থেকে যে কেউ একটা পয়সা কি একটা পাই পয়সা দিয়ে কানে কানে আমায় কিছু বলতো আমি তা অপরকে শুনিয়ে আসতে লাগলাম।

মত্ত, বিভল অবস্থায় আমার অসংলগ্ন কথাগুলি শুঁড়িখানার মেয়ে

আর পুরুষদের মনে কি কুহকের যে সৃষ্টি করে সেটাই কেবল মুগ্ধ করে তুলল আমাকে। এক জনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে ছুটে যেতে লাগলাম আমি হাসতে হাসতে। হিক্কি আর বমি করতে দেখে আমায় ওরা হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল একরূপ।

'বাচ্চাটাকে এবার ছেড়ে দাও হে!' কে যেন বললে।

'না না; কিচ্ছু ওর হবে না,' অপর এক জন জানাল।

'ম্যাগো, কি ঘেন্নার কথা!' হাসতে হাসতে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল।

'এই বাচ্চা, বাড়ি যা এবার', আমার দিকে তাকিয়ে কে যেন বলে উঠল।

সন্ধ্যের দিকে আমি ছাড়া পেলাম শুঁড়িখানা থেকে। মত্ত, স্খলিত পা ফেলে রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে চললাম। বিড় বিড় করে মুখ দিয়ে এমন সব অশ্লীল অকথ্য কথা আওড়াতে লাগলাম যা শুনে পাশের মেয়েরা কানে আঙুল দিতে লাগল। আর দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতি লোকেরা আমোদ করতে লাগল।

শুঁড়িখানায় গিয়ে অপর লোকের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে মদ খাওয়াটা আমার এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় মা আমাকে দেখতেন, মত্ত হয়ে এদিক ওদিক আমি ঘোরা-ফিরা করছি। আমায় তিনি বাড়ী নিয়ে যেতেন। তারপর শাসন করতেন আচ্ছা করে। কিন্তু পরদিনই মা কাজে চলে গেলে আমি ছুটে আবার বেরিয়ে আসতাম শুঁড়িখানায়। অপেক্ষায় থাকতাম, ভেতরে নিয়ে গিয়ে কেউ যদি আমায় একটু মদ কিনে খাওয়ায়। শুঁড়িখানার মালিকের কাছে মা একদিন এসে কেঁদে পড়লেন। তিনি অগত্যা আমায় এখানে ঢুকতে মানা করে দিলেন। কিন্তু শুঁড়িখানার খদ্দেররা অমন একটা রগড়

থেকে বাদ পড়তে নাছোড়বন্দা। মদ কিনে ওরা আমাকে খাওয়াবেই। তাই রাস্তার উপরই নিজেদের বোতল থেকে মদ ঢেলে আমায় খাওয়াতে লাগল। আর অকথ্য, অশ্লীল কথা শিখিয়ে দিয়ে আমার মুখ থেকে তা আবার শুনতে চাইত।

ছয় বছর বয়সে লেখা-পড়ায় হাতে খড়ি দেওয়ার আগেই আমি এভাবে শিখে গেলাম মদ খেতে। কালো এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে মিশে আমি টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়। লোকের কাছ থেকে পয়সা ভিক্ষে করতাম। তারপর সেই পয়সা নিয়ে ছুটে যেতাম শুঁড়িখানার দিকে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি রোজ যা দেখতাম তার অনেক কিছুর মানেই বুঝতাম না, যা শুনতাম অনেক কিছু তা মনেও থাকত না। পরের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে মদ খাওয়ার কথাটাই আমার কেবল মনে আছে। মা খুব দমে গিয়েছিলেন। তিনি শাস্তি দিতেন আমাকে। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলতেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, আমার যেন সুমতি হয়। দিন-রাত তাঁকে কত খাটতে হচ্ছে আমি কি তা দেখতে পাই না?—তিনি আমায় বলতেন। কিন্তু আমার উড়ু-উড়ু মনে মার কথা কোন দাগই কাটত না। শেষটা তিনি আমাকে ও আমার ভাইকে রেখে যেতেন কৃষ্ণাঙ্গ এক বুড়ীর হেপাজতে। হুইস্কির জন্য শুঁড়িখানার দিকে আমি যাতে পা বাড়াতে না পারি সে তা সদাসর্বদা নজরে রাখত। মদের নেশা একদিন আমার কেটে গেল। তার কথা একদিন আমি ভুলেই গেলাম।

ওপাড়ার অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রোজ ইস্কুলে যেত। বিকেল বেলা ফিরবার পথে ওরা আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলত। খাতাপত্তরগুলি রাস্তার একপাশে রেখে দিত গাদা করে। ওদের

বইগুলি কোলে নিয়ে আমি পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যেতাম। কালো কালো অক্ষরগুলির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। প্রশ্নে প্রশ্নে হয়রাণ করে তুলতাম ওদের। আমার যখন কিছুটা অক্ষর পরিচয় হোল, ওদের মত আমিও লেখাপড়া শিখব বলে মাকে একদিন জানালাম। মা সায় দিলেন। ছেলে-পিলেদের বই-পত্তর পেলেই আমি অমনি পড়তে শুরু করে দিতাম। আশ-পাশের সঞ্চারমান পৃথিবীটার প্রতি আমার অদম্য কৌতূহল দিন দিন এত বেড়ে গেল যে সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর মা যখন বাড়ি ফিরতেন, আমি তখন তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম নানান সব প্রশ্ন করে। অনেক সময় মা চুপ করেই থাকতেন। জবাব দিয়ে উঠতে পারতেন না।

কনকনে এক শীতের সকালবেলা মা আমায় জাগিয়ে দিলেন ঘুম থেকে। বললেন, ঘরে কয়লা ফুরিয়ে গেছে। ভাইকে নিয়ে তিনি এখন কাজে যাচ্ছেন। পথে কয়লাওয়ালাকে বলে যাবেন কয়লা দিয়ে যেতে। বিছানা ছেড়ে আমি যেন কোথাও না যাই। কয়লার দাম বাবদ কিছু টাকা আর একখানা চিঠি তিনি রেখে গেলেন কয়লার বাক্সটার মধ্যে। কি আর করি? আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। কয়লাওয়ালাকে আমি গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। টাকা আর চিঠিটাও দিলাম তার হাতে। কয়েক বস্তা কয়লা সে নিয়ে এল। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আমার শীত করছে কিনা।

'হ্যাঁ।' কাঁপতে কাঁপতে আমি জবাব দিলাম।

চুল্লিটাতে সে তখন আগুন ধরিয়ে দিলে। বসে পড়ে তারপর তামাক খেতে লাগল।

'আচ্ছা বলো তো দেখি, কত দাম দিতে হবে কয়লার জন্তে?' ও আমায় প্রশ্ন করলে।

'আমি জানি নে?'

'কি লজ্জার কথা! তুমি বুঝি গুণতে জানো না?'

'আজ্ঞে না!'

'তবে এক কাজ করো, আগে ভালো করে শোন—তারপর মুখে মুখে আমার সঙ্গে বলে যাও।'

এক থেকে দশ পর্যন্ত ও তখন গুণে গেল। মন দিয়ে আমি তা শুনলাম। ও তখন বললে আমায় নিজে থেকে গুণতে। গুণে গেলাম আমি। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতি যুগ্ম সংখ্যাগুলি ও তখন আমায় দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিলে। তারপর তাদের সঙ্গে এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি একক সংখ্যাগুলি যোগ করতে বললে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এভাবে এক শ' পর্যন্ত গুণতে আমি শিখে ফেললাম। আমি তখন ফেটে পড়লাম খুশিতে। রাত্রির বাসি পোষাক পরেই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলাম বিছানার উপর। আর বারবার আউড়ে যেতে লাগলাম এক থেকে এক শ' পর্যন্ত। আমার ভয় হতে লাগল: কি জানি, যদি ভুলে যাই সবটা! কাজকর্ম সব সেরে রাত্রিবেলা মা যখন বাড়ি এলেন, আমি তখন তাঁকে ধরে বসলাম: এক শ' পর্যন্ত আমি গুণে যাব—মাকে তা শুনতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মা সত্যি অবাক হয়ে গেলেন। তারপর থেকে পড়তে হয় কি করে তিনি আমাকে শিখাতে লাগলেন; শোনাতে গল্প বলে। প্রত্যেক রবিবার দিন মার কাছে বসে বানান করে করে আমি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলাম।

এটা-ওটা সবটাতে অবান্তর নানান প্রশ্ন করে আমি সবাইকে ত্রাহিত্রাহি অতিষ্ঠ করে তুললাম। পাড়ার আশেপাশে যা কিছুই ঘটুক না কেনো,

আমার তাতে একবার নাক ঢোকানো চাই! ঠিক এমনি করেই একদিন আমি প্রথম জানতে পারলাম: 'শ্বেতাঙ্গ' আর 'কৃষ্ণাঙ্গ'দের মধ্যে পার্থক্যের কথা! আমি যা শুনলাম তাতে আমার পিলেটা চমকে উঠল রীতিমত। 'শ্বেতাঙ্গ' বলে যে কিছু লোক আছে, একথা আমি পূর্বেই জানতাম। কিন্তু কথাটা আমার মনে কোনদিন কোন রেখাপাতই করে নি। হাজারে হাজারে কত অজস্র 'শ্বেতাঙ্গ' নর-নারীকে আমি তো হামিশা দেখেই থাকি রাস্তায়। আমাদের সঙ্গে ওদের একটা ভয়ানক আশ্চর্য রকমের প্রভেদ থাকলেও ওরা ছিল আমার নিকট আর পাঁচটা লোকেরই মত অতি সাধারণ। বিশেষ কোন বিশেষত্ব আমি কোনদিন আরোপ করিনি। 'শ্বেতাঙ্গ' বলে ওদের আমার কোনদিন মনেই হয় নি। অবশ্য আমি তখনও ওদের কোন নিকট সংস্পর্শে আসি নি। শহরের কোথায় যেন ওরা থাকে, এই টুকুন ছাড়া ওদের সম্বন্ধে আমি আর কোন খবরই রাখতাম না। 'শ্বেতাঙ্গ'দের প্রতি আমার এই অবহেলার মস্তো একটা কারণ ছিল হয়ত আমাদের পরিবারের অনেকেই 'শ্বেতাঙ্গ'দের মত দেখতে ফরসা ছিলেন বলে। গায়ের রঙের দিক থেকে দিদিমা তো যে কোন 'শ্বেতাঙ্গিনী'কে হার মানিয়ে দিতে পারেন রীতিমত। তবু কিন্তু তাঁকে 'শ্বেতাঙ্গিনী' বলে কোনদিন আমার মনে হয়নি। তাই আমাদের পাড়ায় যখন কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে নিগ্রো একটি ছেলেকে একজন শ্বেতাঙ্গ অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে, আমার তখন মনে হোল, 'শ্বেতাঙ্গ' ওই লোকটা বুঝি ছেলেটির বাবাই হবে। তাই অমনভাবে মেরেছে! ছেলেদের মারবার অধিকার বাবাদের নিশ্চয় আছে বইকি! বাবার মত সবাই বুঝি ছেলেদের ধরে এমনি করে মারেন! আমি তখন মনে করতাম, ছেলের গায়ে হাত তুলবার একমাত্র অধিকার রয়েছে বাবাদেরই।

কিন্তু মা এসে যখন বললেন, 'শ্বেতাঙ্গ' সেই লোকটা নিগ্রো ছেলেটির বাবা নয়—এমন কি ওর কেউ নয়, তখন আমার কেমন যেন খটকা লাগল।

'তা হোলে 'শ্বেতাঙ্গ' ওই লোকটা ওকে চাবুক পেটা করবে কেনো ?' আমি মাকে প্রশ্ন করলাম।

'চাবুক পেটা তো করে নি, এমনি মেরেছে মাত্র।' মা জানালেন।

'তাও বা মারবে কেনো ?'

'তুই এখনো ছেলে মানুষ, ওসব বুঝবি নে।'

'হুঁ, বুঝবো না ! আমার গায়ে হাত তুলতে কেউ আসুক না দেখি !'

'এখন থেকে তা হোলে রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করা ছেড়ে দাও গে।'

অনেকক্ষণ ধরে আমি তারপর ভাবতে লাগলাম, 'শ্বেতাঙ্গ' সেই লোকটা ছেলেটিকে মিছিমিছি মারতে গেল কেন ? যতই ভাবতে লাগলাম ততই আমার গুলিয়ে যেতে লাগল সবটা। তারপর থেকে 'শ্বেতাঙ্গ' লোক দেখলেই ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে থাকতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম, সত্যি সত্যি ওরা দেখতে কেমন !

হাউয়ার্ড্ ইন্স্টিটিউটে আমি যখন ভর্তি হলাম, ভর্তি হবার বয়স তখন আমার পেরিয়ে গেছে। ইস্কুলে পরে যাবার মত উপযুক্ত কাপড় চোপড়ও মা আমায় কিনে দিতে পারেন নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেই প্রথম দিন আমি ইস্কুলে গেলাম। ইস্কুল মাঠের কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই ভয় করতে লাগল আমার ভয়ানক। একবার ইচ্ছে হোল, বাড়ি ফিরে যাই ছুটে। সঙ্গের ছেলেরা আমায় কিন্তু ছাড়ল না। হাত ধরে নিয়ে চলল ইস্কুলের মধ্যে। গলাটা আমার শুকিয়ে গেল

ভয়ে। আর সব ছেলেরা আমায় নিশ্চয় দেখে ফেলেছে! আমার নাম আর ঠিকানা হয়ত বলে দেবে শিক্ষয়িত্রীকে। ছেলেরা এবার সুর করে পড়তে লাগল। আমি সব দেখতে লাগলাম বসে বসে। নিজের পাঠও তৈয়েরী করে নিলাম। কিন্তু আমার যখন পালা এল পড়া বলার, আমি কিছুই বলতে পারলাম না মুখ ফুটে। আশে-পাশের চটপটে আর সব ছেলেদের সামনে আমি ঘাবড়ে গেলাম রীতিমত।

দুপুর বেলা এক দঙ্গল বড় বড় ছেলের সঙ্গে আমি ভিড়ে পড়লাম। ওদের কথাবার্তা সব শুনতে লাগলাম কান পেতে। নানান সব প্রশ্ন লাগলাম করতে। দুপুর ছুটির মধ্যেই যৌন ও দেহতত্ত্ব সংক্রান্ত 'চার অক্ষরের' সব কটা শব্দই আমি প্রায় শিখে ফেললাম ওদের কাছ থেকে। অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, এই কথা-গুলিই আমি কতদিন আওড়ে গেছি শুঁড়িখানায় অর্থ না বুঝে! নর-নারীর দেহগত সব ব্যাপার বর্ণনা করে লম্বা মত কালো একটা ছোকরা তো আবৃত্তি করে গেল নোংরা সুদীর্ঘ এক অতি অশ্লীল রসাল ছড়া। একটু শুনতেই তার প্রত্যেকটা কথা মুখস্ত হয়ে গেল। স্মরণ শক্তি আমার চিরকালই প্রবল। তবু কিন্তু ক্লাসে এসে বিন্দু-বিসর্গও এর শুনিয়ে দিতে পারলাম না কাউকে পুনরাবৃত্তি করে। মাষ্টার মশাই আমার নাম ধরে ডাকতেই বই খুলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। অপরিচিত অতগুলি ছেলে-মেয়ে; নিশ্চয় ওরা কান পেতে রয়েছে আমার পড়া শুনবার জন্য! একটা শব্দও বেরুল না আমার মুখ দিয়ে।

ইস্কুল ছুটি হতেই বাড়ির দিকে আমি ছুটে চললাম লাফাতে লাফাতে। মাথাটা আমার কিলবিল করে উঠল। প্রথম দিনেই নতুন নতুন কত সব রসাল কথা শিখে নিলাম। একটা কথাও তার

নাই বা রইল বইতে। টেবিলের উপর ঠাণ্ডা খাবারটা চাপা পড়ে থাকতে দেখে আমি রাগে গড়গড় করে উঠলাম। তারপর এক টুকরা সাবান নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সকাল থেকে নতুন নতুন যা কিছু শিখেছি তা সবাইকে একবার জানিয়ে না দিলে কি চলে? সাবানের টুকরাটা দিয়ে প্রত্যেকটা জানালায় নতুন শেখা 'চার-অক্ষরের' আদিরসাত্মক কথার ভাণ্ডটা আমি ঢেলে উজাড় করে দিতে লাগলাম। পাড়ার সব কটা জানালায় জানালায় আমি লিখে চললাম সমানে। হঠাৎ এক সময় এক মহিলা বুঝি আমায় দেখে ফেললেন। আমায় তিনি তাড়িয়ে নিয়ে এলেন বাড়ি পর্যন্ত। রাত্রিবেলা তিনি এলেন মার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রত্যেক জানালার উপর মনের সুখে আঁচড় মাচড় কাটা আমার লেখা কীর্তিখানা দেখালেন। মা দেখে তো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন, এসব কথা কোথায় আমি শিখেছি। ইস্কুলে গিয়ে শিখেছি বলে মাকে বললাম। তিনি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বেস করলেন না। এক মগ জল আর একখানা তোয়ালে আমার হাতে দিয়ে নিয়ে এলেন আমাকে জানলার কাছে। আদেশ করলেন:

'যাও, মুছে ফেল ওসব!'

পাড়া শুদ্ধ সবাই এসে জড় হয়ে গেল বাইরে। খিল খিল করে ওরা হাসতে লাগল। অবাক হয়ে সবাই মাকে শুধাতে লাগল: ওইটুকুন বয়সে অত সব কথা আমি শিখলাম কোত্থেকে? তোয়ালে দিয়ে জানলা থেকে লেখাটা মুছতে মুছতে আমি ফুলতে লাগলাম অন্ধ আক্রোশে। তারপর কেঁদে ফেললাম ফোঁপিয়ে। অনুনয় করলাম:

'অমন কাজ আর কখনও করবো না মা, এবারকার মত ছেড়ে দাও!'

লেখার শেষ আঁচড়টি নিশ্বেষে মুছে না যাওয়া পর্যন্ত মা কিন্তু

কিছুতেই ছাড়লেন না। অমন কাজ আর জীবনে কোনদিন কোরব না বলে আমি নাকে খৎ দিলাম।

বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে ধর্ম কর্মের দিকে মার মতিগতি গিয়েছিল ভয়ানক বেড়ে। গীর্জার রবিবারের ইস্কুলে গিয়ে আমায় প্রায় দিতে হোত হাজিরা। ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি লম্বা নিগ্রো পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে সেখানে দেখা হোত। প্রতি রবিবার দুপুরে মা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন চিকেন ফ্রাই করে। আমি তাতে খুব খুশি হতাম। খুশি হতাম পাদ্রীমশাই আমাদের বাড়ি আসছেন বলে নয়; চিকেন ফ্রাই হচ্ছে বলে। পাড়ার দু' একজনও প্রায়ই নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। পাদ্রীমশাইকে দেখলে কিন্তু চোখ দুটি আমার টাটিয়ে উঠত। কেন না, আমি জানতাম বাবার মত তিনিও তাঁর নিজের গোঁ নিয়েই থাকেন ব্যস্ত। একদিন খাবার-দাবারের পূর্বে বড়োদের পাশ কেটে আমি টেবিলে গিয়ে বসে পড়লাম আগে ভাগে। ওঁরা তখন বসে বসে গল্প-গুজব করছিলেন আর হাসছিলেন। টেবিলের মাঝখানটায় একটা প্ল্যাটের উপর পিঙ্গল সোনালী রঙের আস্ত একটা কুক্কুটশাবক রয়েছে দেখলাম সাজানো। কিন্তু আমার ডিসে দেয়া হয়েছে 'সুপ'। হুঁ, চিকেন ফ্রাই ছেড়ে 'সুপ' কেউ আবার খেতে যাবে! মনে মনে আমি ঠিক করলাম, চিকেন ফ্রাই আমি খালি খাবো। সবাই এদিকে 'সুপ' খেতে সুরু করেছে। আমি কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে রইলাম।

'ঝোলটা খেয়ে নে?' মা বললেন চাপা গলায়।

'আমার যে একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না মা?'

'ঝোলটা খেয়ে না নিলে তুমি কিন্তু আর কিছু পাবে না বলে রাখলাম।'

পাদ্রী মশাই নিজের 'সুপটা' এর মধ্যে শেষ করে ফেললেন। আস্ত ফ্রাইটাকে এবার বললেন তাঁর পাতের দিকে এগিয়ে দিতে। চোখ দুটি আমার টাটিয়ে উঠল। পাদ্রীমশাই তো খুশিতে আটখানা! ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক ওদিক তিনি একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর ফ্রাই থেকে বাছাই বাছাই অংশটুকু মুখে পুরতে লাগলেন গোগ্রাসে। 'সুপটা' তাড়াতাড়ি শেষ করে নেয়ার জন্য এক চামসে ঝোল আমি ঢেলে দিলাম গলার মধ্যে। তারপর পাল্লা দিয়ে চললাম পাদ্রীমশাই সবটা খেয়ে নেয়ার আগে 'সুপটা' আমি শেষ করে নিতে পারি কিনা তার। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। এর মধ্যেই প্ল্যাটের উপর হাড়গোড় জমে স্তূপিভূত হয়ে উঠেছে বিরাট হয়ে। তবু তিনি সমানে খেয়ে চললেন। ঝোলটা আমি আরও তাড়াতাড়ি শেষ করে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। আর সবাইও নিজেদের ঝোল শেষ করে এবার চিকেন ফ্রাই খেতে শুরু করেছে। ডিসের অর্দ্ধেকটা এর মধ্যে কখন কাবার হয়ে গেছে! আমি হাল ছেড়ে দিলাম। হাত গুটিয়ে বসে থেকে কেবল দেখতে লাগলাম চিকেন ফ্রাইটা টপাটপ কি করেই না উঠে যাচ্ছে!

'ঝোলটা খেয়ে নে না? নইলে যে কিছুই খেতে পাবি নে।' মা আবার তাগাদা দিলেন।

কাতর চোখ দুটি তুলে আমি মার দিকে তাকালাম। কিছু বলতে পারলাম না মুখ ফুটে। ফ্রাই-এর সবটাই ওরা খেয়ে নিচ্ছে খামচা খামচা করে, অথচ এদিকে আমি আমার 'সুপটা' এখনও শেষ করে উঠতে পারলাম না। আমি রাগে ফুলতে লাগলাম। পাদ্রীমশাই তখনও

হেসে আর ঠাট্টা-তামাসা করে চলেছেন সমানে আর সবাই তাই গিলছে হাঁ করে। তাঁর প্রতি আমার আক্রোশ ধর্ম কি ভগবানকেও পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠল। নিজেকে আমি আর সামলাতে পারলাম না। ধপ করে নেমে পড়লাম চেয়ার থেকে। জানতাম, কাজটা নেহাৎ অভদ্রের মতই হচ্ছে। তবু ঘর থেকে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম অন্ধের মত। চিৎকার করে বলে উঠলাম :

'দেখলে তো, মুরগীর সবটা কেমন একা একা নিজে খেয়ে নিলে পাদ্রীটা !'

পাদ্রীমশাই শুনে হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে। মা কিন্তু ভয়ানক রেগে গেলেন। খেতে বসে অশিষ্ট ব্যবহার করার অপরাধে রাত্রির খাবার আজ বন্ধ বলে জানিয়ে দিলেন।...

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মা বললেন, আজ আমাদের বিচারপতির কাছে যেতে হবে। আমার ও আমার ভাইয়ের ভরণপোষণের খাই-খরচা তিনি নাকি আদায় করে দেবেন বাবার কাছ থেকে। ঘণ্টা খানেক পরে প্রকাণ্ড একটা হলঘরে আমরা তিনজন এসে উপস্থিত হলাম। চারপাশে লোক গিসগিস করছে। অপরিচিত সব মুখ। ওরা সবাই বলাবলি করছে কি সব পরস্পর—বিন্দু-বিসর্গও যদি আমি তার বুঝতে পারতাম! আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। উঁচু এক মঞ্চের উপর বসেছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ লোক। মা বললেন, তিনিই নাকি বিচারপতি। প্রকাণ্ড হলঘরটার অপর প্রান্তে বসেছিলেন বাবা। আমাদের দিকে বার বার তিনি তাকাচ্ছিলেন আর হাসছিলেন চিবিয়ে চিবিয়ে। মা আমাদের সাবধান করে দিলেন, বাবার মিষ্টি কথাতে

আমরা যেন কিছুতেই না ভুলি। তিনি আরও বললেন, বিচারক হয়তো আমাকে নানান সব প্রশ্ন করতে পারেন। আমি যেন তার ঠিকঠাক উত্তর দিয়ে যাই। আমি রাজী হলাম। মনে মনে কামনা করলাম, বিচারক আমাকে কোন প্রশ্ন না করলেই যেন ভালো হয়।

নানান কারণে ব্যাপারটা আগাগোড়া অনাবশ্যক ভুল মনে হোল আমার কাছে। এত কাণ্ডের পর বাবা যদি আমাদের খাওয়ানই, আদালতের নির্দেশমানার পূর্বেই তা তিনি করতেন। আর যত খিদেই পাক, খাবার-দাবারের ব্যাপারে বাবার কথা আমার আদৌ মনে হত না। তিনি আমাকে বসে খাওয়াবেন, এটা আমি কখনও ভাবিও না। এখানে এতক্ষণ বসে থাকায় আমার খিদে পেয়েছিল। অস্থির হয়ে উঠছিলাম। শুকনো এক পাটি স্যাণ্ডুইস্ খেতে দিলেন মা। তাই চিবুতে লাগলাম। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কখন বাড়ী যাব ভেবে। মার নাম ধরে ডাকতে শোনা গেল এবার। মা উঠেই অমনি ভয়ানক কান্না শুরু করে দিলেন যে কিছুক্ষণ তিনি কোন কথা বলতেই পারলেন না। কান্নার বেগটা একটু থামতেই তিনি কোন রকমে জানলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে ও তাঁর দুই শিশু পুত্রকে ত্যাগ করে চলে গেছেন; অনাথ শিশু পুত্রদের মুখে এখন প্রায় অন্নই জোটে না। তাঁকেও কায়ক্লেশে জীবন যাপন করতে হয়। শিশু সন্তানের ভরণপোষণের সব ভার তাঁকেই একলা একলা বইতে হচ্ছে। মার আবেদন শেষ হবার পর বাবাকে এবার তলব করা হোল। বাবা চট করে এসে অমনি হাজির হলেন। মুখে তাঁর সেই চাপা হাসি। মাকে তিনি চুমু খেতে চাইলেন। মা কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাবার একটা কথা কেবল আমি শুনতে পেলাম:

'কি করবো হুজুর, আমি তো প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।'

মা বসে কাঁদছেন আর বাবা বসে হাসছেন—এ দৃশ্য দেখে আমি খুব

ব্যথিত হলাম। তাই বেরিয়ে এসে যখন রাস্তার রোদে নেমে পড়লাম, আমার তখন আর আনন্দ ধরে না। বাড়ি ফিরে এসেও মা কাঁদতে লাগলেন গুমরে গুমরে। আর অনুযোগ করতে লাগলেন, বিচারপতির একতরফা অন্যায় বিচারের। আদালতের এই ঘটনার পর বাবার কথা আমি ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম। বাবা আমাকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নি। তবু তাঁর কথা মন থেকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতাম। যখন ভয়ানক খিদে পেত তখন মা আমাদের প্রায় বলতেন, বাবার আপিসে গিয়ে এক-আধটা ডলার, ডাইম, কি পয়সা চেয়ে আনতে তাঁর কাছ থেকে। আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হতাম না। তাঁর মুখ দেখতে পর্যন্ত আমার আর ইচ্ছে হত না।

এর কিছুদিন পর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খাদ্য-সমস্যা আমাদের এবার সঙ্গীন হয়ে উঠল দিন দিন। সব সময় খিদে আমাদের লেগে থাকত। সময় সময় প্রতিবেশীরা নিয়ে গিয়ে আমাদের খাওয়াতেন। দিদিমাও মাঝে মাঝে এক-আধটা করে ডলার পাঠাতেন ডাক মারফৎ। তখন শীতকাল। রোজ সকালে উঠে আমি মোড়ের কয়লার দোকান থেকে এক ডাইম মূল্যের কয়লা কিনে আনতাম। দিন কয়েকের জন্য ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মার সেবা-শুশ্রূষা করতে আমি লেগে গেলাম। আমাদের বাড়িতে দিদিমা যখন এলেন, আমি আবার ইস্কুলে যেতে লাগলাম।

দিদিমার কাছে গিয়ে আমরা থাকব কিনা, এই নিয়ে রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ চলত। কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হয়ে উঠত না। হয়ত রেল ভাড়ার মত উপযুক্ত টাকা ঘরে ছিলনা। আইন-আদালত পর্যন্ত ব্যাপারখানা টানা-হেঁচড়া করতে হয়েছিল বলে বাবা ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে সব যোগা-

যোগ এবার থেকে তিনি ছিন্ন করলেন একেবারে। সুখের এক সংসারে আগুন লাগিয়ে দেবার জন্ম সর্বনাশা সেই মেয়েমানুষটাকে খুন করা উচিত কিনা, এই নিয়ে দিদিমা আর মার মধ্যে ফিসফিস করে জল্পনা-কল্পনা চলত অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু শুধু কথাই সার, কাজের বেলায় কিছুই হোত না। আমার ভয়ানক বিরক্তি লাগত। কেউ যদি বলত যে বাবাকে মেরে ফেলা উচিত, আমি হয়তো তাকে সায় দিতাম। কিংবা যদি কেউ বলত যে তাঁর নাম করাও উচিত নয়, আমার তাতেও কোন আপত্তি থাকত না। অথবা কেউ যদি বলত যে আমরা আর কোন শহরে চলে যাবো, আমি তাতে বরং খুশিই হতাম। কিন্তু এ তা নয়। কেবল কথাই সার, কাজের বেলায় সব হনুমান! এর চাইতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান ঢের ভালো। আমি তাই করতাম। এ সব বাজে কথায় কান না দিয়ে যতখানি সম্ভব আমি বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিতাম।

দিদিমা বাড়ি যাবার আগে যে কটা ডলার দিয়ে গিয়েছিলেন সব কটা এখন খরচ হয়ে গেল। অবশেষে বাড়ী ভাড়ার টাকা জুটানই দায় হয়ে উঠল। রুগ্ন, অসুস্থ শরীর নিয়ে মা তাই সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিলেন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দোর-গোড়ায়। অবশেষে এক অনাথ আশ্রমের খোঁজ পাওয়া গেল। ওরা আমাদের আশ্রয় দিতে রাজী হোল। অবশ্য মা যদি কাজ-কর্ম কিছু করে কিছুটা খরচা বহন করেন। আমরা দুজনকে এভাবে আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে মা একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না।

মিস্ সাইমনের এই 'অনাথ আশ্রম'টি দোতালা। চারদিকে অনেক খালি স্থান জুড়ে মাঠ আর গাছপালায় বাগান। একদিন সকালে

আমার ও আমার ভাইয়ের হাত ধরে মা আমাদের নিয়ে এলেন মিস্ সাইমনের কাছে। কাফ্রি আর শ্বেতাঙ্গ রক্তের বর্ণশংকর 'মিউল্যাটো' এক মহিলা হলেন তিনি। দেখতে খুব লম্বা আর কৃশ। আমাকে দেখেই তিনি ভালোবেসে ফেললেন। আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। যে কয় দিন আশ্রমে ছিলাম এ ভয়-ভয় ভাবটা আমার কিন্তু লেগেই ছিল। যায়নি কিছুতে।

নানান বয়সের ছেলে মেয়েতে ভর্তি 'অনাথ আশ্রম'টা। সোর গোল লেগেই থাকত সব সময়। আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যসূচী আমাকে যখন বুঝিয়ে দেয়া হোল, আমি ঠিক তা বুঝে উঠতে পারলাম না। খিদে আর ভয়-ভয় ভাবটাই আমার লেগে থাকত সব সময়। দু'বার আমাদের যে খাবারটুকুন দেয়া হোত তা খুব সামান্যই। তাতে কারো পেট ভরত না। রাত্রিবেলা ঘুমুবার আগে আমাদের বরাতে জুটতো গুড় মাখানো এক টুকরো রুটি। ছেলে-মেয়ে সবাই বুঝি তাতেই খুশি! নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি ওরা খিদে পাবার অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়াত আর পরস্পর পরস্পরকে করত গালাগালি রেষারেষি। এই হোল আশ্রম পরিবেশ।...

মাঠের ঘাসটা অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছিল। কলের সাহায্যে তা কাটাবার মত পয়সা ছিল না আশ্রম কর্তৃপক্ষের। হাত দিয়ে তাই উঠাবার রেওয়াজ ছিল এখানে। প্রত্যেকদিন সকাল বেলা প্রাতঃরাশ-পর্ব (প্রাতঃরাশ বলে তাকে মনেই হতো না) সমাধা হলে বয়স্ক কোন ছেলের নেতৃত্বাধীনে এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে নেমে পড়ত প্রশস্ত উঠানটায়। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি একটি করে উপড়ে ফেলতে হোত ঘাস। বিশ্রামের সময় মিস

সাইমন পরিদর্শন করতে আসতেন কাজ। প্রত্যেক ছেলের পাশে ঘাসের স্তূপগুলির উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন তিনি। পরিমানটা বেশী হলে বাহাবা দিতেন ছেলেটাকে আর কম হলেই তার বরাতে জুটত ভর্ৎসনা, তিরস্কার। এক এক দিন সকাল বেলা খিদের চোটে আমি এমন কাবু হয়ে পড়তাম যে ঘাস তুলতে পারতাম না মোটেই। আমার মাথাটা তখন ঘুরতে থাকত। মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো। অনেক সময় বেঁহুস হয়ে পড়তাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখতাম হাত আর হাঁটুর উপর ভর করে আমি পড়ে আছি। স্থির, অপলক চোখদুটি তুলে তাকিয়ে আছি ঘাসের সবুজ স্তূপটার দিকে। বুঝে উঠতে পারতাম না, কোথায় পড়ে আছি। মাথাটা তখনও ঘুরছে বন্ বন্ করে। মনে হোত, আমি যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নটা ভাঙল বুঝি এই মাত্র!...

প্রথম কয়দিন মা রোজই আসতেন আমাদের দুই ভাইকে দেখতে। তারপর থেকে তিনি আসা যাওয়া একরূপ বন্ধ করে দিলেন। আমার ভয় হতে লাগল, কি জানি, মাও বুঝি বাবার মত আমাদের ফেলে অন্ধকারে ডুব মারলেন। দিন দিন আমি আস্থা হারিয়ে ফেলছিলাম সব কিছুরই উপর। মা যেদিন এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এতদিন তিনি আসেন নি কেনো? মা বললেন, মিস সাইমন তাঁকে নাকি আসতে মানা করেছেন। তিনি নাকি আমাদের অধিক পরিমাণে আস্কারা দিয়ে গোল্লায় দিচ্ছেন একেবারে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে মাকে আমি আবার মিনতি করলাম। তিনি বললেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। শীগগীর আমাদের আরকান্সাসে নিয়ে যাবেন বলে তিনি জানিয়ে গেলেন। মা চলে যেতেই আমার বুকটা কেঁদে উঠল হু হু করে।

আমার ভালবাসা পেতে সচেষ্ট হয়ে উঠছিলেন মিস্ সাইমন। মা যদি রাজী হন তবে আমি তাঁর পোষ্যপুত্র হতে চাই কিনা, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন একদিন। আমি তাঁকে স্পষ্ট করে না বলে দিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বোঝালেন অনেক করে। কিন্তু বিশেষ কোন সুরাহা হোল না। ভয় আর সন্দেহ-অবিশ্বাসে ইতিমধ্যেই আমার হৃদয়টা পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো কানায় কানায়। সাবধান হতে শিখেছিলাম। যখন তখন বেফাঁস কিছু যাতে বলে না বসি, তার জন্যও সতর্ক হয়ে তাকতাম। কত সব স্বপ্ন দেখতাম। এখান থেকে পালাবার ফন্দিও আঁটতাম। প্রত্যেকদিন ঘুম ভাঙতেই আমি মনে মনে শপথ করতাম আজকে আমি পালাব—পালাবই। কিন্তু পালানর সময় হলে বুকটা আমার দুড়দুড় করে কেঁপে উঠত। আমার আর পালানই হয়ে উঠত না কোনদিন।

একদিন মিস সাইমন বললেন, এবার থেকে আমাকে তাঁর আপিস-ঘরে কাজ করতে হবে। দুপুরের খাবারটা আমি তাঁর সঙ্গে বসে খেয়ে নিলাম। আশ্চর্য, মুখোমুখি হয়ে তাঁর সঙ্গে টেবিলে খেতে বসলেই চক্ষের পলকের মধ্যে আমার পেটের সব খিদেটা কোথায় যেন অন্তর্ধান হয়ে যেত। কিই যে কুহকমন্ত্র তিনি জানেন, কে জানে!

ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে একদিন তিনি ঠিকানা লিখছিলেন খামের উপর। আমায় কাছে ডাকলেন। সস্নেহে বললেন: 'ভয় কি? আরো কাছে এসো।'

আমি তাঁর কাছে গিয়ে কনুই ঘেঁষে দাঁড়ালাম। চিবুকের উপর তাঁর একটা কাল আঁচিল। আমি তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে।

খানিকটা দূরে ছিল একটা ব্লটার। ওটা দেখিয়ে তিনি আমায় বললেন :

'ঠিকানাগুলো যেই লেখা হয়ে যাবে, ব্লটারটা দিয়ে তুমি অমনি কালিটা মুছে নিয়ো, বুঝলে ?'

আমি কেবল হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কোন জবাব দিতে পারলাম না।

'কই, ব্লটারটা নিলে না ?' মিস্ সাইমন আবার বলে উঠলেন।

ব্লটারটার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

'এই যে নাও।' তিনি নিজেই ব্লটারটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। একটা খামের উপর ঠিকানা লিখে এগিয়ে দিলেন ওটা আমার দিকে। ব্লটারটা হাতের মুঠোয় নিয়ে খামটার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম স্থাণুর মত।

'কই, কালিটা মুছে নাও ?'

তবু কিছুতেই আমি হাতখানা বাড়াতে পারলাম না। তিনি যে আমায় কি আদেশ করছেন, আমি জানি। স্পষ্টই তা শুনেছি। চোখ তুলে আমি একবার তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। কেন মুছতে পারছি না, বুঝিয়ে বলতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার চোখদুটি মেঝের উপর স্থির হয়ে পড়ে রইল। মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে তিনি যে বসে আছেন! তাকিয়ে আছেন আমার দিকে! আমি যে তাই সাহস পারছি না কিছুতেই। এ কথা তাঁকে কি করে জানাই ?

'কই, মুছে নাও!' তিনি আবার বলে উঠলেন চড়া গলায়।

তবু মুছতে পারলাম না। নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলাম।

'মুখ তোল এদিকে ?'

আমি তবু ঘাড় গুঁজে রইলাম। হাত বাড়িয়ে তিনি আমার চিবুকটা তুলে ধরতেই আমি কেঁদে ফেললাম।

'য়্যাঁ, হোল কি তোমার ?'

কান্না শুরু করতেই ঘর থেকে তিনি আমায় দিলেন বার করে। রাত্রি হলে আমি ঠিক আজ পালিয়ে যাবো, স্থির করলাম মনে মনে। খাবারের ঘণ্টা যখন বেজে উঠল, আমি তাই খেতে গেলাম না। লুকিয়ে রইলাম হলঘরের এক কোণায়। টেবিলের উপর টুং টাং প্ল্যাট রাখার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দরজা খুলে আমি তখন বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার তখন সবেমাত্র ঘনিয়ে আসছে। অনিশ্চিত আশংকায় গতি আমার মন্থর হয়ে এল। ফিরে যাওয়াটাই কি ঠিক হবে আমার ?—আমি শুধালাম নিজেকে। —না, কিছুতেই না। ফিরে গেলে ওখানে না খেয়েই আমায় থাকতে হবে। মরতে হবে শুকিয়ে। ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে চব্বিশটা ঘণ্টা। রাস্তার পাশে রোয়াক ঘেঁষে আমি এগিয়ে চললাম। কত লোক গেল পাশ কেটে। আচ্ছা, এখন চলেছি কোথায় ?—আমি আবার শুধালাম নিজেকে।—কই, তাতো বলতে পারি না। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম, ততই আমি ক্ষ্যাপা, পাগলের মত লাগলাম হয়ে যেতে। সব কিছু আমার গুলিয়ে যেতে লাগল। ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে উঠল সব কিছু। এক সময় আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম পথের উপর। রাস্তাগুলি দেখে আমার ভয় হতে লাগল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালানগুলি অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। দু পাশের গাছগুলি কালো কালো লম্বা ছায়া ফেলেছে ভূতের মত। না, এক পাও আর এগোন যাবে না। ফিরেই যাবো আমি। আমি মন স্থির করে ফেললাম। কিন্তু এতখানি পথ হেঁটে এসেছি, অনেকগুলি মোড় এসেছি

পার হয়ে—এখন ফিরেই বা যাই কি করে? রাস্তাটা যে ঠাহর করে উঠতে পারছি না কিছুতেই। কোন রাস্তা ধরে গেলে আবার 'অনাথ আশ্রমে' গিয়ে পৌঁছব, আমি তা পারলাম না ঠিক করে উঠতে। সব কিছু আমার গুলিয়ে গেল। পথ ফেললাম হারিয়ে।

গলির মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আমি কেঁদে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ ছুটে এল। আমার ভয় হচ্ছিল, ও বুঝি এসেই আমায় মার দেবে। কিন্তু না। পুলিশটা এসে জিজ্ঞেস করল: আমার কি হয়েছে? মার কাছে যাবো বলে ওকে আমি জানালাম। শ্বেতাঙ্গ পুলিশটা আমায় আবার ভয় পাইয়ে দিল। সেই যে সেবার শ্বেতাঙ্গ এক লোক আমাদের পাড়ার নিগ্রো ছেলেটাকে বেদম প্রহার করেছিল, কথাটা আমার মনে পড়ে গেল হঠাৎ। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে গেল চারদিকে। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, কোথায় আমি থাকি? ঘাবড়ে গিয়ে আমি আবার কেঁদে ফেললাম। মিস্ সাইমনের 'অনাথ আশ্রম' থেকে আমি যে পালিয়ে আসছি, কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম শ্বেতাঙ্গ পুলিশটাকে। কিন্তু বলতে পারলাম না ভয়ে। আমাকে অবশেষে নিয়ে যাওয়া হোল থানায়। খেতে দিলে ওরা আমায় সেখানে। অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। মস্ত একটা চেয়ারে গিয়ে তারপর আমি ডুবে বসলাম। আমার চারদিকে ঘিরে বসেছে অনেকগুলি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। চোখ তুলে ওরা কিন্তু একবার তাকাচ্ছেও না আমার দিকে। জানলা দিয়ে তাকালাম বাইরে। রাত হয়েছে অনেক। রাস্তার আলোগুলি জ্বলছে মিটমিট করে। ঘুম পেয়েছিল। ঝিমুতে লাগলাম। ঘাড়টা একটু নাড়া দিয়ে আমি একসময় চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম, আমার পাশে বসে আছে একজন 'শ্বেতাঙ্গ' পুলিশ। খুব নিকট পরিচিতের মত ও আমায় নানান প্রশ্ন করতে লাগল। 'শ্বেতাঙ্গ'

বলে ওকে আমার মনেই হোল না একেবারে। মিস্ সাইমনের 'অনাথ আশ্রম' থেকে আমি যে পালিয়ে আসছি, আমি ওকে সব বলে ফেললাম।

মিনিট কয়েক পরেই এক পুলিশ কর্মচারী আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চলল 'অনাথ আশ্রমে'র দিকে। আশ্রমে আমরা এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন মিস সাইমন। আমাকে দেখে তিনি চিনে ফেললেন। আমাকে ছেড়ে দেয়া হোল তাঁর হেফাজাতে। আমায় যেন তিনি না মারেন, কাতর অনুনয় করলাম আমি। কিন্তু তিনি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমায় নিয়ে চললেন উপরে। তারপর খালি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব করে পিটালেন বেত দিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আবার পালিয়ে যেতে হবে। এর পর থেকে কিন্তু বিশেষ কড়া নজর রাখা হত আমার উপর।

পরের বার মা যখন আমাদের দেখতে এলেন তাঁকে তখন সব জানান হোল সবিস্তারে। আমার পালানোর কাহিনী শুনে মা মুষড়ে পড়লেন খুব।

'কেন অমন কাজ করতে গেলি ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'এখানে আমার যে থাকতে ভালো লাগে না, মা।'

'এ ছাড়া উপায় কি বাবা', মা জানালেন। 'নইলে আমি কাজ করবো কি করে ? বাবা যে তোমার থেকেও নেই সেকথা ভুললে চলবে কেন !'

'না, এক দণ্ডও আমি আর এখানে থাকবো না, মা।' আমি আবার গোঁ ধরলাম।

'তা হলে তুই তোর বাবার কাছে গিয়ে থাকবি ?'

'না ; তাঁর কাছেও থাকবো না।'

'না রে, থাকতে বলছিনে। তাঁর কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনবি। আমরা তা হোলে আরকান্‌সাসে মাসীর বাড়ি গিয়ে থাকব অথন।'

যা আমি কথনও পছন্দ করি না আমাকে সেই পথ আবার বেছে নিতে বলা! অবশেষে রাজী হলাম। যাই হোক, এই অনাথ আশ্রমের চাইতে বাবার প্রতি আমার বিরাগ, বিতৃষ্ণা তেমন প্রবল নয়।

সপ্তাখানেক কি আরও কিছু পরে একদিন এক রাত্রিবেলা আমরা এসে দাঁড়ালাম এক কাঠের ঘরের মধ্যে। তোলা একটা উনানে একরাশ কয়লা গন্‌গন করে জ্বলছিল। উনানটার পাশে বসে আছেন বাবা আর অপরিচিত এক মহিলা। মা আর আমি হাত কয়েক দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরও কাছে যেতে সাহসে কুলোল না।

'আমার জন্যে নয় গো', শুনলাম মা বলছেন—'তোমার ছেলেদের জন্যই টাকা চাইতে এসেছি।'

'আমার হাতে এখন কিছু নেই।' বাবা বলে উঠলেন হাসতে হাসতে।

'এদিকে এসো খোকা', অপরিচিত মহিলাটি আমায় কাছে ডাকলেন।

আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কিন্তু এক পাও নড়তে পারলাম না।

'বেশ চালাক ছেলেটা তো!' তিনি আবার বলে উঠলেন। 'ওগো, পয়সা টয়সা কিছু একটা দাও না ওকে।'

'রিচার্ড, এদিকে আয়।' বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি পিছিয়ে এলাম মাথা নেড়ে। উনানটার দিকে চোখ তুলে তারপর তাকিয়ে রইলাম।

'সত্যি, বেশ চালাক ছেলেটি কিন্তু!' অপরিচিত মহিলাটি আবার বলে উঠলেন।

'লজ্জার মাথা খেয়েছো তাই, নইলে কচিকচি ছেলেদের না খাইয়ে রাখবে কেনো?" অপরিচিত মহিলাটির দিকে তাকিয়ে মা উঠলেন খেঁকিয়ে।

'নাও, হু' সতীনের লড়াই এবার দাও শুরু করে।' বাবা হেসে উঠলেন।

'উনানের ওই ডাণ্ডাটা দেখছো তো? ওটা দিয়ে আমি কিন্তু তোমায় এক ঘা বসিয়ে দেবো আচ্ছা করে!' আমি গর্জে উঠলাম বাবার দিকে তাকিয়ে।

বাবা আবার হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে। '—তুমি বুঝি ওকে শিখিয়ে দিয়েছো?' তিনি প্রশ্ন করলো।

'ছিঃ, রিচার্ড্, ওসব কথা কি বলতে আছে বাবাকে?' মা শাসালেন।

অপরিচিত মহিলাটীকে লক্ষ্য করেও আমি বলে উঠলাম— 'তোমাকেও আমি মেরে ফেলবো একদম।'

তিনিও হেসে ফেললেন। তারপর বাবাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন। আমার লজ্জা করতে লাগল। চলে যেতে চাইলাম।

'হ্যাঁ গো, তোমার ছেলেদের তুমি উপোষ করিয়ে রাখ কি করে, বলতো?' মা আবার অনুনয় করলেন।

'বেশ তো, রিচার্ড্ থাক না এখানে আমার সঙ্গে।' বাবা জবাব দিলেন।

'রিচার্ড্, থাকবি নাকি তুই তোর বাবার কাছে?' মা আমায় জিজ্ঞাস করলেন।

'না।'

'এখানে থাকলে কিন্তু পেটভরে তুমি খেতে পাবে খুব।' বাবা বললেন।

'আমার হাজার খিদেই পাক তবু কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকছি নে।'

'আহা, ছেলেটার হাতে একটা পয়সা দাও গো!' অপরিচিত মহিলাটি আবার বলে উঠলেন।

বাবা তাঁর পকেটে হাত গলিয়ে একটা পয়সা বার করলেন। বললেন:

'এই নে রিচার্ড।'

'নিস না তুই।' মা বলে উঠলেন।

'বোকার মতো চালচলন ওকে শিখাচ্ছ কেনো?' বাবা শুধালেন—'এই নে, রিচার্ড, পয়সা নে।'

মা, বাবা, অপরিচিত সেই মহিলাটীর দিকে আমি একবার করে তাকাতে লাগলাম। তারপর তাকিয়ে রইলাম আগুনের চুল্লিটার দিকে। পয়সাটা নিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। তবে বাবার কাছ থেকে নয়। না, কিছুতেই না।

'একটুও লজ্জা করে না তোমার', মা কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—'ছেলেটা ইদিকে খিদেয় কাতড়াচ্ছে তার হাতে তুমি একটা পয়সা মাত্তর দিতে চাচ্ছো? এখনও ঈশ্বর আছেন গো, এখনও আছেন—সবই তিনি দেখছেন—শাস্তি একদিন পেতেই হবে।'

'আর একটি কাণাকড়িও কিন্তু নেই আমার কাছে, এই যা একমাত্র সম্বল।' বাবা জবাব দিলেন হেসে হেসে। তারপর নিকেলের পয়সাটা আবার রেখে দিলেন নিজের পকেটে।

আমরা তারপরে চলে এলাম্। আমার মনটা খিঁচিয়ে উঠল। মনে হোল নোংরা কিছু যেন করে এসেছি এইমাত্র। বহু বৎসর পরেও অনেক দিন বাবা আর অপরিচিত সেই ভদ্রমহিলার মুখ দুটি ভেসে

উঠত আমার মনের পর্দায়। মনে হোত প্রজ্জলিত এক উনানের পাশে যেন বসে আছেন তাঁরা। এত জীবন্ত, এত প্রাণময়—হাত বাড়ালেই আমি বুঝি তাঁদের ধরে ফেলব এক্ষুনি! আমি এক দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম তাঁদের চোখ দুটি সত্যি কি যাদুই জানে! আমি মুগ্ধ, প্রলুব্ধ হয়ে উঠতাম।

বাবা আর অপরিচিত মহিলাটীকে পাশাপাশি বসে থাকতে সেই যে দেখেছিলাম তারপর প্রায় পঁচিশটা বৎসর কেটে গেছে। বাবার সঙ্গে আবার যখন দেখা হয়েছিল তিনি তখন পোড়ামাটীর দেশ মিসিসিপির বাগানের এক ক্ষেত চাষী। রুক্ষ ওভারঅল পরে শিরবহুল খাঁজ-কাটা হাতে মাটীমাখা এক নিড়ানী নিয়ে মাঠের উপর তিনি তখন দাঁড়িয়েছিলেন একা একা। বাবারই রক্তধারা বয়ে চলেছে আমার ধমনীতে, আমার মুখে তাঁরই প্রতিকৃতি, আমার কণ্ঠে তাঁরই প্রতিধ্বনি। তবু দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের বিরাট ব্যবধানের পর আজ আমার মনে হোল আমরা যেন দুজন সম্পূর্ণ আলাদা, অপরিচিত, স্বতন্ত্র দুই পৃথিবীর মানুষ। কথা কইছি আলাদা দুই ভাষায়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলাম উন্মুক্ত মাঠের উপর তিনি তখন দাঁড়িয়ে আছেন রোদেতে। ফোকলা মুখে সেই হাসিটি কিন্তু এখনও লেগে আছে। চুলগুলি পেকে গেছে সব শাদা হয়ে। দেহটা তাঁর ঝুঁকে পড়েছে বয়সের গুরু ভারে। চোখ দুটি ঝাপসা স্তিমিত হয়ে এসেছে পুরোন স্মৃতির অস্পষ্টতায়। আগেকার সেই উগ্র ভীতিজনকরূপ আজ আর তাঁর নেই। বাবা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না আমার জীবনের সেদিন আর আজকের মধ্যে কত পরিবর্তনের উষ্ণ প্রবাহই না বয়ে গেছে। আজ তাই আমি সিটকে পড়েছি তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে। আমার পৃথিবী আজ তাই তাঁর নিকট অপরিচিত, সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত!...

উৰ্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ ভূস্বামীদের দৌলতে কর্তব্যপরায়ণতা, হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি, কি দেশাচারের শিক্ষার কোন সুযোগই তিনি কোনদিন জীবনে পান নি। হর্ষ কি বিষাদ দুই ছিল তাঁর নিকট অপরিচিত। সর্বংসহা ধরিত্রী মায়ের সন্তানের মত তিনি ছিলেন জীবন্ত, সজীব, স্বয়ংভূ। কোন ঝড়-ঝাপটাতেই ভেঙে পড়তেন না; চোখ বুজে সয়ে যেতেন সব কিছু। জীবনে তাঁর বড়ো রকমের কোন একটা আশাও ছিল না, হতাশাও না। মা, ছোট ভাই, আর আমার সম্বন্ধে সহজ সাবলীল ভঙিতে অর্নগল নানা প্রশ্ন তিনি করে গেলেন। আমি তাঁদের কথা যখন বললাম তিনি তখন উচ্চ স্বরে দিল্‌খোস হাসি হেসে উঠলেন। মহাকৌতুক বোধ করলেন। জীর্ণ বিবর্ণ তাঁর নড়বড়ে কাঠের কুঠিরটার দিকে চোখ পড়তেই কিন্তু মনটা আমার টনটন করে উঠল ব্যথায়। তাঁর সকল অন্যায়-অবিচারের কথা তখন ভুলে গেলাম। শুষ্ক নিষ্প্রাণ ওই আবাদ ভূমির দূর সীমান্ত রেখা ভেদ করে আমার চোখের উপর তখন ভেসে উঠল নিগ্রো এক চাষীর বেশে বাবার অবয়বটি। জীবিকা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন ধূসর শহরে। কিন্তু মুখর শহরের চারিটি ইঁটের প্রাচীরের মধ্যে গেঁয়ো এই নিগ্রো চাষীটির জীবন হয়ে উঠল বিপর্যস্ত। হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি দু' দিনেই। ব্যর্থ হয়ে তাই আবার ফিরে এসেছে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়েতেই। ধূসর এই শহরই কিন্তু আমায় গ্রহণ করে নিল উষ্ণ তার কোল পেতে—হাত ধরে নিয়ে চলল অজানা-অপরিচিত এক স্বপ্নাতীত জ্ঞানসমুদ্রের উপকূল ভাগের দিকে!

দুই

স্বাধীন! কোন বাধা নেই, কোন বন্ধন নেই, তার জন্য কোন মাথা ব্যথাও নেই। এবার থেকে মর্জি-মাফিক চললেও কেউ কিছু বলতে আসবে না। জবাবদিহি দিতে হবে না কারো কাছে। অনাগত ভবিষ্যতের সুখময় দিনগুলির কথা ভেবে আমি তো রীতিমত মেতে গেলাম উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারে।

মা একদিন বিকেলবেলা খবর নিয়ে এলেন, আর্কানসাস্-এর ইলেনে আমরা নাকি থাকব এবার গিয়ে মাসীর বাড়ীতে। হ্যাট্‌চেজ্‌ থেকে মিসিসিপির জ্যাকসন শহরে উঠে এসেছিলেন দিদিমা। যাবার পথে আমরা নাকি তাঁর সঙ্গেও একবার দেখা করে যাবো। মার কাছে কথাটা শোনার পর থেকেই দীর্ঘ, অধীর প্রতীক্ষায় আমি দিন গুণতে লাগলাম। বিস্তর ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করে ছেঁড়া, আধ-ময়লা আমার জামা-কাপড়কটি গুছিয়ে নিতে লেগে গেলাম মহাব্যস্ত হয়ে। নিঃশব্দ, নিষ্করুণ মৃত্যুর কালো ছায়ার মত ঘৃণ্য যে আশ্রমবাটীটা ক্ষুধা আর তৃষ্ণার সশঙ্ক পদ-সঞ্চারে মুখরিত হয়ে উঠত, তার কাছ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি ভেবে মনটা নেচে উঠল আনন্দে।

জিনিষ-পত্র সব বাঁধা-ছাঁদা করছিলাম, এমন সময় সতীর্থ এক বন্ধু এসে বলল, দড়িতে ঝোলান ভিজে একটা শার্ট আমি নাকি ভুলে ফেলে যাচ্ছি। এখান থেকে বিদায় নেবার উদাত্ত আনন্দে আমি এত মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, শার্টটা ওকে দিয়েই দিলাম! বললাম:

'তুই নে, আমার আর চাইনে।'

ভাবখানা এই, সামান্য একটা শার্টে কি অমন আমার এসে যাবে?

আশ্রমের আর সব ছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে সুটকেসের মধ্যে আমাদের জিনিষপত্র গুছান সব দেখছিল আর বুঝি মনে মনে ফুলছিল ঈর্ষায়। চোখ তুলে ওদের দিকে একবার তাকাবার মত ফুরসৎও বুঝি আমার ছিল না। যে মুহূর্তে এখানকার 'অনাথ আশ্রমে'র পিঁজরাপোল থেকে নিষ্কৃতি পাবার অনুমতি পেলাম, তখন থেকেই এখানকার সব স্মৃতি আমার যেন হারিয়ে গেল। পাশে দণ্ডায়মান অতগুলো ছেলে-মেয়ের অস্তিত্বের কথা বুঝি ভুলেই গেলাম একেবারে।

আর এক মুহূর্তকালও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। জিনিষপত্র সব বেঁধে নিয়ে তাই যখন হল-ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, সপ্তার পর সপ্তা-ধরে এখানকার যে সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে হেসেছি, খেলেছি, ঘুমিয়েছি, ঘোরাফিরা করে বেড়িয়েছি, তাদের কাছ থেকে মামুলি একটু বিদায় নিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। মা তা জানতে পেরে আমায় খুব বকলেন। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আমায় অগত্যা তাই করতে হোল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ওরা যখন ওদের নোংরা ময়লা হাতগুলো বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে, আমি তখন চোখদুটি নামিয়ে নিলাম। মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ভয়াল মূর্তি স্পষ্ট হয়ে যেন ভেসে উঠল ওদের মুখে চোখে। আমি শিউড়ে উঠলাম। ওদের করমর্দন

করতে গিয়ে আর পাঁচ জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি যা আমার সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ। অনাগত ভবিষ্যতে তাই বুঝি আমায় করতে হবে বারেবারে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, সমান তালে পা ফেলে ওদের সঙ্গে আমি যে চলতে পারি না কিছুতেই!

(ছেলেবেলাকার এ সব ঝড় ঝাপটার জের যখন কেটে গেল, আমি যখন সবটা তলিয়ে দেখতে শিখলাম, চুপচাপ বসে বসে আমি তখন ভাবতাম, নিগ্রোদের মধ্যে খাঁটি দয়া মায়ার অমন ধারা একান্ত অভাব কেনো? শুধাতাম, তাদের হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তগুলো কেনো এমন অস্থির, ভঙ্গুর? প্রকৃত হৃদয়াবেগের কেনই বা একান্ত অভাব তাহাদের? বড় রকমের কোন আশা নেই, কোন আকাঙ্খা নেই। মুখ ফুটে এতটুকু আনন্দ করবারও বুক নেই। আর আমাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস—চিরাচরিত প্রথা কি উৎকট, কি উলঙ্গই না! এতটুকু গভীরতাও কি নেই আমাদের স্মরণ শক্তির? মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন সূক্ষ্ম অদৃশ্য যে ডোরে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে তার লেশটুকুও যদি থাকত আমাদের। দুঃখে প্রাণ খুলে একটু কাঁদতেও আমরা যেন জানি না! পরবর্তী কালে জীবনে যখন আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম, নিগ্রোদের নৈতিক জীবন উচ্ছৃঙ্খল-ময় বলে যেসব লোক ধোঁয়া তুলে বসে, বসে আমি তখন তাদের কথা ভাবতাম। নিয়তির এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আমার তখন মনে হোত: আমাদের সকল গলদ, সব চপলতা, সব ভয়, আতঙ্ক আর নিপীড়নের মূলে রয়েছে আমাদের মানসিক বিকৃতি আর নির্বুদ্ধিতাই। এরাই সব দায়ী। (আমেরিকার কালা আদমীদের জীবনের নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, নিরানন্দ দিকটার কথা আমার যখন মনে পড়ত, আমার তখন মনে হোতো পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণাঙ্গীন রূপ

থেকে কি ভাবেই না বঞ্চিত নিগ্রোরা। আর কালা-আদমীদের শুভ্র সাংস্কৃতিক অবদানের কথা যখনই ভাবতাম তখন মনে হোত: প্রীতি, সম্মান, আনুগত্য কিংবা মানুষের স্মৃতি শক্তির সুস্থ, সবল, সুকোমল দলগুলি বুঝি নিঃশেষে উঠে গেছে আজ মানুষের বুক থেকে। নানান সংশয় তখন দানা বেঁধে উঠত আমার মনে। নিজেকে নিজে তখন শুধাতাম, মানব হৃদয়ের ওই বৃত্তগুলিকে কেউ কি আর প্রতিপালিত করে না? জয় করে নেয় না আপনার করে? এতটুকু ত্যাগ, এতটুকু কষ্ট স্বীকারও কি কেউ করে না আর তাদের জন্য? জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের কি কেউ জীয়িয়ে রাখবে না?)

জ্যাক্‌সনে দিদিমার বাড়িখানা দেখতে ভারী চমৎকার। দোতালা দালান বাড়ি, সবশুদ্ধ সাতখানা ঘর। লম্বা, সরু তার হলঘরের বারান্দায় আর সিঁড়ির নীচে আমি আর আমার ভাই লুকোচুরি খেলতাম। সামনে ও পিছনে গাড়ি বারান্দাওয়ালা লম্বা লম্বা থামের শাদা চুণকাম করা এই বাড়িখানা ক্লার্ক মামাই কিনেছিলেন দিদিমার জন্য। আমার মনে হোত, দিদিমাদের এই বাড়িখানার মত অত সুন্দর বাড়ি বুঝি সারা দুনিয়ায় আর একটিও নেই।

সামনে তার অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিল সবুজ মাঠ। আমরা দুজন তাতে টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিতাম। খেলতাম। পাড়ার ভীরু ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসেও জড়ো হোত। রাজ্যের সব খবর বলে বেড়াতাম আমরা ওদের কাছে। রেলগাড়ীতে চাপবার সেই বিচিত্র কাহিনী, ঘুমন্ত মিসিসিপি নদী কেমন দেখায়, 'ক্যাম্প এ্যাডেমস্', মেম্‌ফিস শহর, 'অনাথ আশ্রম' থেকে আমার পলায়নের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—সব আমি ওদের শুনাতাম। ওরা অবাক হয়ে শুনত। আর ভাবত ওদের চাইতে কত বেশীই না আমরা জানি!

এখানে বেশীদিন আমরা থাকছি না ; দুদিন পরেই নতুন আর এক দেশে চলে যাবো—এ কথাও ওদের আমরা জানিয়ে দিতাম। বলতাম, সে দেশ কিন্তু এর চাইতেও সুন্দর !

সংসারের ব্যয় ভার কিছুটা লাঘব করবার জন্য নিগ্রো একটি মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন দিদিমা। মেয়েটির নাম ইলা। কোন এক ইস্কুলের বুঝি তিনি শিক্ষয়িত্রী। শান্ত শিষ্ট স্বভাবের মেয়ে ; হৈ-চৈ মোটেই পছন্দ করতেন না। দূর দূরান্তে পড়ে থাকা চোখ দুটীতে তাঁর স্বপ্নালু এক আবেশ। ইলাকে আমার যেমন ভালো লাগত, তাঁর কাছ ঘেঁসতেও তেমনি আবার ভয় করত। তিনি সব সময় বসে বসে বই পড়তেন। অনেক দিনই আমার ভারী ইচ্ছে হোত, তাঁর কাছে গিয়ে একবার বলি : তিনি যা পড়ছেন আমায় তা যেন একবার পড়ে শুনান। কিন্তু বলবার মত সাহস পেতাম না কিছুতেই। একদিন বিকেল বেলা দেখলাম, সামনের গাড়ি বারান্দার নীচে একলা বসে বসে তিনি কি-যেন পড়ছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম :

'কি পড়ছ ইলা ?'

ইলা মুখ তুলে একবার তাকালেন। তারপর আমায় এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন :

'এই এমনি একখানা বাজে বই।'

'ওখানে কি লেখা আছে. ইলা ?'

'হ্যাঁ, আমি তোকে এখন নাটক নভেল পড়ে শুনাই, আর দিদিমা তোর তেড়ে আসুক ?'

মমতায় তিনি যেন গলে পড়লেন।

'ওঁকে আমি গ্রাহ্যি করি না।' সাহসে বুক বেঁধে আমি জোর গলায় বলে উঠলাম।

'ছিঃ ছিঃ, ওসব কথা কি কখনও বলতে আছে ভাই?' তিনি বলে উঠলেন।

'কিন্তু কি লেখা আছে একবারটি বলো না।'

'তুমি যখন বড়ো হবে, এমনি কত বই তুমি তখন নিজে নিজেই পড়তে পারবে। কত কথা জানতে পারবে।' ইলা বুঝিয়ে বললেন আমায়।

'তাই বলে এখন জানতে পাবো না কেনো?'

ইলাদি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। তারপর বইখানা মুড়ে রাখলেন। বললেন :

'তবে এদিকে আয়।'

পায়ের কাছে তাঁর বসে আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

'থুড়থুড়ে এক বুড়ো লোক ছিল এক সময়। নাম ছিল তার ব্লু-বিয়ার্ড।...' ইলা চাপা গলায় শুরু করলেন।

'ব্লু-বিয়ার্ড আর তার সাত গিন্নীর কাহিনী' তিনি বলে যেতে লাগলেন। মশগুল হয়ে আমি শুনতে লাগলাম। গাড়িবারান্দা, সূর্যের রোদ, ইলার মুখখানা—আশপাশের সব কিছু যেন একাকার হয়ে গেল। ইলার মুখের প্রত্যেকটি কথাই যেন আমার অন্তরের অন্তস্থল হতে উৎসারিত হয়ে বাস্তব রূপ ধরে ফুটে উঠতে লাগল। তিনি বলে যেতে লাগলেন, ব্লু-বিয়ার্ড কি করে সাত সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করল। কেমন করেই বা ভালোবাসলে ওদের। তারপর কি করে সে একে একে সাত জনকে হত্যা করে অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে তাদের টাঙিয়ে রাখলে চুলে চুলে বেঁধে—বলে যেতে লাগলেন ইলা। কাহিনীটি শুনতে শুনতে

আমার চারদিকের জগৎটা যেন জীবন্ত মুখর সঞ্চারমান হয়ে উঠল। কেমন যেন গুলিয়ে গেল সব। চোখের উপরকার বাস্তব সব কিছুর ভোল যেন বদলে গেল।

কার সোনার কাটি আর রূপোর কাটির স্পর্শে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে পড়লাম। বার বার ইলাকে মাঝ পথে থামিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চনচন করে উঠল আমার মনটা। মহা তোলপাড় করে কাহিনীটি আমার মনের পর্দায় শিহরণের ঝড় তুলল। কাহিনীটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, ঘনিয়ে এসেছিল সব রহস্যটা—আশ-পাশের বাস্তব জগৎটার কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক এমনি সময় দিদিমা এসে উপস্থিত হলেন গাড়িবারান্দায়।

'এই চুপ কর, বজ্জাৎ মেয়ে!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন—'অমন জাতের মেয়েকে আমি আমার বাড়ির ত্রিসীমায় ঢুকতে দেবো না কিছুতেই!'

দিদিমার অপ্রত্যাশিত কণ্ঠে আমি চমকে উঠলাম। নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম জোরে জোরে। কয়েক মুহূর্ত আমি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস্ উইলসন!'

ইলা দাঁড়িয়ে উঠে বলে উঠলেন তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে—'ও খুব ধরে বসলে কিনা তাই—'

'দুগ্ধপৃষ্য ছেলেমানুষ, ওর আবার কি কথা?'

দিদিমা খিঁচিয়ে উঠলেন আবার।

মাথা নীচু করে ইলা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

'কিন্তু ইলা যে এখনো সবটা শেষ করেনি, দিদিমা?'

চুপ করে থাকাই যে এ ক্ষেত্রে আমার উচিত, একথা জেনে শুনেও আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

দিদিমা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। তারপর ডানহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আমাকে একটা প্রচণ্ড থাপ্পর মারলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন ক্রুদ্ধ আক্রোশে :

'ফের কথা বলে!'

'তারপর কি হোল আমি কিন্তু শুনবোই।'

দিদিমার আর একটা থাপ্পর এড়িয়ে গিয়ে আমি কঁকিয়ে কেঁদে উঠলাম।

'সব শয়তানের নষ্টামি!'

দিদিমা ধমক দিলেন। শ্বেতাঙ্গদের মত ধবধবে ফরসা তাঁর থুলথুলে মুখখানা কুঁচকে উঠল। কোটরে-বসা বড়ো বড়ো চোখদুটি তুলে তিনি জ্বালাময় দৃষ্টি হানলেন আমার দিকে।

তাঁর চওড়া কপালেও বিরক্তির খাঁজ ফুটে উঠল। খুব রেগে গেলে চোখদুটি তাঁর আধা-আধিভাবে বুজে আসে। ভয়াবহ দেখায় তখন তাঁকে খুব।

'কিন্তু গল্পটা আমার যে ভালো লাগছিল।' আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

'ওসব শুনলে তোকে নরক-কুণ্ডে গিয়ে পুড়ে মরতে হবে।' দিদিমা অটুট বিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলে উঠলেন। আমি তাঁকে বিশ্বাস না করে আর পারলাম না কিছুতেই।

অসমাপ্ত কাহিনীটির শেষ পরিণতিটুকু পর্যন্ত শুনতে না পারায় মনটা আমার হু হু করে উঠল। ক্ষুধিত উন্মুখ হয়ে রইলাম ওই কাহিনীটির সশঙ্ক, সকরুণ, অনিরুদ্ধ, রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির জন্য।

মনে মনে তাই শপথ করলাম, একটু বুড়ো হয়েই আমি রাজ্যের সব কটা গল্প-উপন্যাসের বই কিনে ফেলব। রুদ্ধশ্বাসে তারপর ওগুলি

পড়ে নেবো। কালো যবনিকার অন্তরালে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, গুপ্তহত্যার লোমহর্ষক কাহিনীর অতৃপ্ত বাসনা আমার মিটিয়ে নেব দুই করপুটে। ইলার ওই কাহিনীর কুহকমন্ত্র আমাকে অমন করে অভিভূত ঝঙ্কৃত করে তুলেছিল যে মা ও দিদিমার সব রকমের চোখ রাঙানি ও ধমকানীকে আমি গায়ে মেখে নিতাম নির্বিকারে। আমারই এ গোঁয়ারতুমি আর বোকামি বলে ওঁরা ভাবতেন। মনে করতেন, দুদিন পরে এ বুঝি আমার কেটে যাবে। তাঁরা কিন্তু কেউ জানতেন না, ইলার ওই রোমাঞ্চকর কাহিনী আমার কৈশোর হৃদয়ে দুর্বার, প্রচণ্ড কি তুফানই না তুলে গেছে! অনুরণিত করে গেছে আমার হৃদয়ের প্রত্যেকটি দলকে, সাড়া জাগিয়েছে। শাস্তি কি তিরস্কার কিছুই আমায় আর বোধ হয় নিরত করতে পারবে না। জীবনের স্বাদ আমি যেন পেয়ে গেছি এখনই। এ আমি আরও পাবো—আরও আস্বাদন করব যে করেই হোক অদূর ভবিষ্যতে। বুঝতে পারলাম আমার চিন্তাধারার হদিশ ওঁরা কেউ পাননি। চুপ করেই রইলাম। আশেপাশে কেউ যখন আর থাকবে না, ইলার ঘরে আমি তখন চুপিচুপি ঢুকে পড়ব। গোলাঘরে লুকিয়ে একখানা করে বই নিয়ে এসে পড়ব বসে বসে। অনেক কথার মানেই হয়ত তখন বুঝে উঠতে পারব না। তবু উপন্যাস পড়বার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। অপরিচিত, নতুন কোন শব্দ পেলেই তার অর্থ জানবার জন্য উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম মাকে। উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম তার কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে নয়। তুলতাম কেন না, ওই কথাটাই আমায় যদি মায়াময় নিষিদ্ধ, স্বপ্নরাজ্যের মনিকোঠায় পৌঁছে দেয়!

একদিন বিকেল বেলা মা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শয্যাই তাঁকে নিতে হোল। সন্ধ্যে বেলা আমরা দু'ভাই-এর গা

ধোবার তদারক করছিলেন তাই দিদিমা। ঘরের মধ্যে দুটো 'টব' জলে ভর্তি করে দিয়ে তিনি আমাদের সাজ-পোষাক সব খুলে ফেলতে বললেন। আমরা তাই করলাম। ঘরের এক প্রান্তে বসে তিনি পশম বুনছিলেন আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন চোখ তুলে। আমি ও আমার ভাই এদিকে হাসি-হল্লা করে খেলতে শুরু করে দিলাম জল নিয়ে। একে অপরের চোখে সাবান গোলা জল ছুঁড়ে দিতে লাগলাম পরম আনন্দে। টব থেকে জল ছিটকে পড়ে মেঝেটা এমন কদাকার চটচটে হয়ে উঠল যে মা আমাদের ধমকে উঠলেন :

'কি করছিস? গা ধুয়ে নে না শীগগির!'

'নিচ্ছি গো, নিচ্ছি।' আমরা দুজন ওকথায় কান না দিয়ে বলে উঠলাম। তারপর আবার জল ছিটিয়ে খেলতে লাগলাম।

দুহাতে সাবান গোলা জল নিয়ে আমি ভাইকে সহসা ডেকে উঠলাম। মুখ তুলে ও তাকাতেই জলটা তাক করে ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। তার আগেই কিন্তু সে তার মুখখানা গামলার মধ্যে ডুবিয়ে নিয়েছিল। সাবান গোলা জলটা মেঝেতে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

'রিচার্ড, শীগগির স্নান করে নে এখন!' দিদিমা আদেশ দিলেন।

'নিচ্ছি গো, নিচ্ছি—' অতর্কিতে ভাইকে আক্রমণ করার ফিকিরে তার ওপর একটা চোখ রেখে আমি বলে উঠলাম।

'এদিকে আয়, রিচার্ড!' দিদিমা সেলাইটা রেখে দিলেন।

টব থেকে উঠে স্যাংটো হয়েই আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তোয়ালেখানা তিনি আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। তারপর আমার মুখ, কান, ঘাড় সব রগড়িয়ে দিতে লাগলেন। এক সময় বলে উঠলেন :

'এবার বোস উবু হয়ে।'

আমি উবু হয়ে বসলাম। তিনি আমার পাছা রগড়িয়ে দিতে লাগলেন। আমার মনটা কেমন যেন এক অস্পষ্ট স্বপ্নাবেশে ভরপুর হয়ে উঠল। যে কথার সম্যক অর্থ সত্যি সত্যি আমি কখনও উপলব্ধি করিনি এমন একটা কথা আমার নিজেরই অজ্ঞাতে কখন খসে পড়ল মুখ থেকে।

'তোমার হয়ে গেলে পর ওখানটায় একবার চুমু খেয়ো তো।'

ঝোঁকের মাথায় আমি বলে ফেললাম মৃদুস্বরে ফস করে। কি যে বললাম, একবার তলিয়েও দেখলাম না।

ভারী অন্যায় কিছু একটা যে বলে বসেছি এটা তখনই টের পেলাম যখন দেখলাম দিদিমা পাথরের মত স্তব্ধ, অচল হয়ে গেছেন একেবারে। সম্বিৎ ফিরে পেয়েই তিনি আমায় দূরে সরিয়ে দিলেন ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে। আমি মুখ ফিরে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর ফরসা মুখখানা হয়ে গেছে যেন বরফের মত। আর কোটরে-বসা কালো কালো চোখদুটি ভাঁটার মত যেন জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। প্রচণ্ড জ্বালাময় তাঁর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝে নিলাম, সাংঘাতিক রকমের অন্যায় কিছু একটা আমি করে বসেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তখনও ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারলাম না। দিদিমা উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। হাতের তোয়ালেখানা মাথার ওপর বাগিয়ে নিয়ে পুঞ্জিভূত সব ক্রোধ বুঝি উজাড় করে তিনি আমার আদুড় দেহে আঘাত করলেন প্রচণ্ড বেগে। পিঠটা আমার জ্বলে উঠল। দম বন্ধ করে আমি যন্ত্রণাটা সহ্য করতে লাগলাম। তারপর ভয়ে জড়সড় হয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কি যে বলে ফেলেছি তার অর্থ তখনও আঁচ করে উঠতে পারলাম না। তাই অহেতুক এই আক্রোশের কারণ খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। ভিজে তোয়ালেখানা দিয়ে দিদিমা এবার আমায় এমন জোরে আঘাত

করলেন যে আমি হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে। নাগালের বাইরে পালিয়ে যেতে না পারলে উনি হয়তো আমায় মেরে খুনই করে ফেলবেন। উলংগ অবস্থাতেই আমি তাই ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে চিৎকার ছেড়ে।

মা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন।

'কি হয়েছে, মা ?'

হল-ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম থর থর করে। আর দিদিমার দিকে বারবার তাকাতে লাগলাম। কি যেন বলতেও যাচ্ছিলাম। কিন্তু পারলাম না। ঠোঁট দুটি কেবল কেঁপে উঠল। দিদিমা বুঝি একেবারে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছেন। পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্বালাময় দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। মুখে একটিও কথা নেই।

'কি করেছিস, রিচার্ড ?' মা আমায় এবার জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা নাড়লাম। দৌড়ে পালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

'কি হয়েছে মা, বলো না ?'

আমার, দিদিমার আর ছোট ভাইয়ের মুখের ওপর একবার তাকিয়ে নিয়ে মা আবার শুধালেন।

দিদিমার মুখখানা শাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। হাতের তোয়ালেখানা তিনি এবার আছড়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। তারপর কেঁদে ফেললেন।

'আমি—আমি ওর গা ধুয়ে দিয়েছিলাম', ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠলেন দিদিমা। নিজ অপাঙ্গের একটা বিশেষ স্থান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তিনি এবার বললেন : 'তখন…তখন ও নচ্ছার পাজীটা বলে কিনা…' অপমান আর ব্যর্থ আক্রোশে সর্বাঙ্গ তার কেঁপে উঠতে

লাগল থর থর করে।—'গা মোছা হয়ে গেলে ওর গুখানটায় একবার চুমু খেতে।'

শুনে মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'না, কখ্খনো না!' মা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, বলেছে।' দিদিমা আবার ফোঁপিয়ে উঠলেন।

'অমন কথা কখ্খনো ও বলতে পারে না।' মা আবার প্রতিবাদ করলেন।

'হ্যাঁ। বলেছে।' দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমি সব শুনলাম। এবার ব্যাপারটা কিছুটা যেন বুঝতে পারলাম। এমন একটা গুরুতর অন্যায় করে বসেছি যার কোন প্রতিকার নেই; এমন একটা কথা ফস করে বলে বসেছি যাকে আমি সহজে উড়িয়ে দিতে পারি না,—টুঁটি টিপে মেরে ফেলতেও পারি না। কথাটা উচ্চারণ করবার আগের মুহূর্তটি যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত, তাহলে বুঝি নিজেকে বাঁচাবার একটা সুযোগ পেতাম। ভিজে তোয়ালেখানা মেঝের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মা তেড়ে এলেন আমার দিকে। ন্যাংটো ঐ অবস্থায় চিৎকার ছেড়ে আমি ছুটলাম রান্নাঘরের দিকে। মাও আমার পিছু পিছু ছুটলেন। পেছনের অন্ধকার উঠানের দিকে আমি দৌড়ে পালালাম। গাছপালা আর তারের বেড়ায় মাথাটা আমার ঠুকে যেতে লাগল। কাঠের ধারাল খুঁটিতে পা কেটে রক্ত ছুটল। তবু চিৎকার করতে করতে আমি দৌড়তে লাগলাম। মনে হোল, আজ বুঝি আমার আর রক্ষা নেই। মুখ বুঁজেই সব শাস্তি সইতে হবে আমাকে। কিন্তু শাস্তি পেতে হবে এ কথা ভাবতেই ভয়ে গলাটা আমার শুকিয়ে গেল কাঠ হয়ে।

'এদিকে আয় বেল্লিক কোথাকার!' মা চীৎকার করে উঠলেন।

পাশ কাটিয়ে আমি ঘরের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম। অন্ধকার

এক কোণে গিয়ে ঘুপটি মেরে পড়ে রইলাম। মা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর। আমি পাশ কেটে সেরে গেলাম।

'দাঁড়া বলছি! নইলে মেরে আজ তোকে খুন করে ফেলব, যাই থাক কপালে।'

মা আবার তেড়ে এলেন আমার দিকে। এবারও আমি পাশ কেটে গেলাম। ভিজে তোয়ালেখানার উদ্ধত আঘাতটা এবারও এড়িয়ে গেলাম কোন রকমে। অবাক স্তব্ধ হয়ে ভাই এতক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

'কি হয়েছে, দাদা?' ও আমায় জিগ্‌গেস করলে। আমার কথা ও শুনতে পায় নি কিছুই।

মুখের ওপর প্রচণ্ড একটা থাপ্পর এসে পড়ল। একটা চক্কর খেয়ে আমি মুখ তুলে তাকালাম। দিদিমা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আমার ওপর। মাথায় আরও একটা আঘাত পেলাম। ইতিমধ্যে মাও এসে পড়েছেন ঘরের মধ্যে। হুমড়ি খেয়ে আমি পড়ে গেলাম মেঝের ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে তারপর ঢুকে পড়লাম খাটের নীচে।

'বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।'

'না।'

'বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে মেরে আজ একেবারে আধমরা করে ফেলব।'

'না।'

'তবে দাদামশাইকে একবার ডাকতো।' আদেশ দিলেন দিদিমা।

ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। দাদামশাইকে সাংঘাতিক ভয় করতাম আমি। দিদিমা বুঝি ভাইকে পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মিশমিশে

কালো, লম্বা-চওড়া, রুক্ষ, মানুষটি দাদামশাই। গায়ের চামড়া সব কুঁচকিয়ে গেছে তাঁর। কথাবার্তা বড় বেশী বলেন না। ইউনিয়ন সৈন্যদেয় হয়ে লড়াই করেছিলেন গত গৃহযুদ্ধের সময়। রেগে গেলে তাঁর দাঁত দুপাটি ভয়ানক কিড়মিড় করে ওঠে সশব্দে। ঘরের এক কোণে ঠেস দিয়ে তিনি রেখে দেন গুলী-ভরা তাঁর সরকারী বন্দুকটা। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের লড়াই যে ফের বেধে যেতে পারে—এ ভ্রান্ত ধারনা তাঁর এখনও কাটেনি। ঘর থেকে ভাইকে দেখলাম ছুটে বেরিয়ে যেতে। দাদামশাই এক্ষুনি নিশ্চয় এসে পড়বেন। হাত পা গুটিয়ে খাটের একটা পায়া আঁকড়ে ধরে আমি গোঁঙিয়ে উঠলাম :

'না—না—' !

দাদামশাই এসে পড়লেন। খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি হুকুম দিলেন। এক চুল নড়তেও আমি কিন্তু রাজি হলাম না।

'বেরিয়ে আয়, ছোকরা !'

'না।'

'তাহলে, বন্দুকটা নিয়ে আসব নাকি ?'

'না—না ; দোহাই, গুলি করো না আমায়।' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'তাহলে বেরিয়ে আয় !' চুপ করে আমি তবু পড়ে রইলাম। দাদামশাই বিছনা ধরে টানতে শুরু করলেন। হাঁমাগুড়ি দিয়ে আমি কিন্তু চলে গেলাম তাঁর নাগালের বাইরে।

'ভালো চাস্ তো বেরিয়ে আয় বলছি।' মা বলে উঠলেন।

মুখ বুঁজে আমি তবু পড়ে রইলাম। দাদামশাইকে অবশেষে হার মানতে হোল। নিজের ঘরে তিনি ফিরে গেলেন।

'আচ্ছা, বেরিয়ে এসো না, মেরে হাড় তোমার গুঁড়ো করে দেবো না?' মা শাসিয়ে উঠলেন।—'দেখি, কতক্ষণ তুমি ওখানে পড়ে থাকতে পারো? বেরুতে হবে তো? রাত্রির খাবার আজ তোমার বন্ধ বলে রাখলাম।'

'দাদা কি করেছে, মা?' ছোটভাই জিগ্‌গেস করল।

'ও যা করেছে, ওকে আজ মেরে খুন করা উচিত।' জবাব দিলেন দিদিমা।

'কিন্তু করেছে কি?' ভাই আবার জিগ্‌গেস করল।

'হয়েছে, হয়েছে; এখন গিয়ে শুয়ে পড়্‌গে, যা!' মা ধমকিয়ে উঠলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানার নীচে আমি পড়ে রইলাম। গোটা বাড়িটা নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি অবশেষে বেরিয়ে এলাম। উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, চৌকাটের পেছনে মা ওৎ পেতে আছেন আমার অপেক্ষায়।

'এদিকে আয়।'

তাঁর পিছু পিছু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতেই তিনি আমায় মারতে শুরু করলেন। তবে আর ভিজে তোয়ালে দিয়ে নয়। তোয়ালে দিয়ে মারতে নাকি বারণ করে গেছেন দাদামশাই। তিনি আমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন, ওসব নোংরা অশ্লীল কথা আমি কোথায় শিখলাম। কোন জবাবই আমি দিতে পারলাম না। আমার এই অক্ষম নীরবতায় তিনি আরও চটে গেলেন ভয়ানক।

'বল, নইলে মারতে মারতে তোর আজ হাড় ফেলবো গুঁড়ো করে?' তিনি জানিয়ে দিলেন।

আমি যে নিজেই জানি না। তাঁকে আর বলব কোত্থেকে? মেম্‌ফিসের সেই ইস্কুলে-শেখা কোন অশ্লীল কথাও এমনি ধারা বিকৃত

রুচির রূপ নিতে পারে না। মাতাল হয়ে স্যালুনের আশ-পাশে যখন ঘোরাফেরা করে বেড়াতাম, তখনই বুঝি শিখেছিলাম ওসব। দিদিমা পরদিন জোর গলায় জানিয়ে গেলেন, আমার এই অধঃ-পতনের মূলে কে, তিনি এবার সব টের পেয়েছেন। ইলার বই পড়েই আমি এসব "চার প্রক্রিয়ার" কথা শিখেছি। "চার-প্রক্রিয়া" ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে আমি যখন জানতে চাইলাম, মা আমায় ফের আর এক চোট মারতে শুরু করলেন। আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে,অমন কথা আমি কোন বইতে পড়ি নি কিংবা আমায় কেউ শিখিয়েও দেয় নি। মা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। দিদিমা তো অবশেষে ইলাকে চেপে ধরলেন এই বলে যে, উনি আমায় অমন সব কথা শিখিয়েছেন যা কখন আমার জানা উচিত নয়। বিস্তর কান্নাকাটি করেও তিনি দিদিমার ভুল ভাঙাতে পারলে না। ইলাকে তাই জিনিষ পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে অবশেষে ছাড়তে হোল এ-বাড়ি। ফস্ করে হঠাৎ মুখ থেকে খসে-পড়া ওই কথা গুলি সৃষ্টি করল আমার মনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল অপূর্ব রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে। স্থির করলাম, কেনো ওঁরা আমায় অমন করে মারলেন, কেনই বা অমন করে সবাই ভর্ৎসনা করলেন, তার অর্থ ভবিষ্যতে আমি একদিন না একদিন সম্যক উপলব্ধি করে নেবোই নেবো।...

দিন আর প্রতিটি মুহূর্ত এবার থেকে আমার কাছে যেন অধিকতর স্পষ্ট আর মুখর হয়ে উঠতে লাগল। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতারই বুঝি মুখর স্বকীয় ভাষা আছে—বলবার কথা আছে নিজের নিজের!...

ঘুম কাতুরে গ্রীষ্মের রাত্রিতে উড়ন্ত জোনাকিগুলির পিছু পিছু ছোটার মধ্যে উদ্দাম, অনিরুদ্ধ কী কৌতুকই না নিহিত আছে!...

ম্যাগনোলিয়া ফুলে ফুলে চারিদিক যখন ছেয়ে যায়—মাতিয়ে তোলে যখন চারিদিক সুমিষ্ট গন্ধে, কে যেন আমায় তখন ডাকে হাতছানি দিয়ে !...

সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসগুলি স্বচ্ছন্দ অবাধগতিতে এদিক ওদিক আন্দোলিত হ'য়ে ঝলমল করে ওঠে রৌদ্র আর বাতাসের আলো-ছায়ায় !

মনে পড়ে : তুলো গাছের পাকা পাকা বিচিগুলো যখন ফেটে যেতো আর শাদা শাদা রোঁয়াগুলো যখন মাটীর দিকে ঝুলে পড়ত, নৈর্ব্যক্তিক কী প্রাচুর্যের কথাটাই না আমার তখন মনে পড়তো !...

মনে পড়ে : আমাদের পিছনের উঠানটায় একবার মোটা নাদুস-নুদুস এক হাঁসকে দেখেছিলাম যেতে হেলে-দুলে। তাই দেখে কণ্ঠ আমার ছেয়ে গিয়েছিল বোবা, অব্যক্ত কান্নায়।...

মনে পড়ে : শ্বেত গোলাপগুলোর উপর ফিকে কালো মৌমাছিটী যখন পরম ধৈর্য-সহকারে গুণগুণ করে উড়ে বেড়াতো, তাই দেখে মনটা আমার দুলে উঠত কেমন এক সন্দেহ-দোলায় !...

মনে পড়ে : একটু একটু করে চেকে চেকে যখন গ্লাশের দুধটা খেতাম দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে, আমার মনটা তখন আচ্ছন্ন হয়ে যেতো তন্দ্রাতুর এক নেশায়। মনে হোত : এই বুঝি প্রথম আমি দুধ পান করছি জীবনে। ঢক ঢক করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে ফুরিয়ে যাবে সবটা !...

মনে পড়ে : দিদিমার সঙ্গে যখন শহরে আসতাম আর তিনি যখন আমাদের হাত ধরে ক্যাপিটেল স্ট্রীটের এক দোকান থেকে অপর দোকানে ঘুরে ঘুরে সওদা করে বেড়াতেন, শ্বেতাঙ্গিণী এক ভদ্রমহিলাকে চঞ্চল দুই নিগ্রো ছেলের হাত ধরে এমনি করে ঘুরে বেড়াতে দেখে রাস্তার 'শ্বেতাঙ্গ'রা তাকিয়ে থাকত ফ্যাল ফ্যাল করে। তিক্ত এই অভিজ্ঞতা পরম কৌতুক সহকারে আমি করতাম উপভোগ !...

মনে পড়ে : তুলোর বিচিগুলো যখন রান্না হোত বাড়িতে আর টাটকা মিষ্টি একটা ঘ্রাণ যখন বেরুত, আমার জিভে তখন জল এসে পড়ত !...

মনে পড়ে : গাঁয়ের শুরু শুরু খাড়ি আর খালগুলির পাঁকের মধ্যে বর্ষার দিনে দাদামশাই-এর সঙ্গে মাছ ধরার সে কী উদ্দাম উচ্ছল মাদকতা !...

আরও মনে পড়ে : দাদামশাই যখন করাত দিয়ে কাঠ-চেরা দেখাতে নিয়ে যেতেন—হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে ইশ্পাতের প্রকাণ্ড করাত-খানা যখন কাঁচা গুঁড়িটাকে চিরে দু'খান করে ফেলত, তাই সব দেখে আমার মনটা ভয় ও আতঙ্কে উঠত সঙ্কুচিত হয়ে।...

মনে আছে : সেবার আধ-পাকা বিলেতি গাব ফলটা প্রথম খেয়ে মুখটা আমার কুঁচকে উঠেছিল। আর একটু হলে বুঝি কেঁদেই ফেলেছিলাম !...

বুনো আখরোট ফলের জন্য আমাদের মধ্যে লুব্ধ কি কাড়াকাড়ি হৈ-উল্লাসই না পড়ে যেত !...

গ্রীষ্মের সেই সকাল বেলাকার কথা মনে পড়ছে। কালোজাম কুড়োতে গিয়ে হাতের উপরটায় অনেকখানি ছড়িয়ে ফেলেছিলাম কাঁটা গাছে। তবু যখন বাড়ি ফিরলাম, আমার ঠোঁট দুটি আর আঙ্গুল কটা কালোজামের মিষ্টি রসে হয়ে গেছে কালো কুচকুচে।

মনে পড়ে : সেবার প্রতিবেশীদের পীচ্ গাছ থেকে চুরি করে কাঁচা পীচ ফল খেতে গিয়ে সারা রাত ধরে পেট কামড়িতে কি অসহ্য যন্ত্রণাটাই ভুগতে হয়েছিল !

সেদিন সকাল বেলাকার কথাটাও মনে পড়ছে। চিকচিকে ছোট্ট সবুজ এক হেলে সাপকে খালি পায়ে বাগানে মাড়িয়ে কি ভয়টাই না হয়েছিল আমার !

রাত নেই, দিন নেই, দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি সেই তন্দ্রাতুর বৃষ্টিপড়ার কথাও আজ বেশ মনে পড়ছে!...

পোটলা পুঁটলি নিয়ে একদিন আমরা ইষ্টিশানে এসে উপস্থিত হলাম। আরক্যানসাসের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি এই প্রথম দেখলাম টিকিট ঘরের কাছে টিকিটের জন্য দুটি কিউ দিয়ে যাত্রীরা দাঁড়িয়েছে সার বেঁধে। এক সারিতে রয়েছে কেবল 'শ্বেতাঙ্গরা'! অপরটায় 'কালা আদমী'রা। দিদিমার এখানে বেড়াতে আসার পর থেকে বিভিন্ন দু' জাতের কথা দাগ কাটছিল আমার মনে একটু একটু করে। বৈষম্যের এই গভীর পদচিহ্ন বুঝি আমার জীবদ্দশায় আর কখনও মুছে যাবে না। গাড়ীতে চেপেই টের পেলাম ব্যাপারখানা। আমরা—অর্থাৎ নিগ্রোরা—সবাই গিয়ে চেপেছি গাড়ির ঘিঞ্জি এক অংশে। আর 'শ্বেতাঙ্গ'রা দিব্যি আরামে আছে বসে গাড়ির অপর অংশে। আসল ব্যাপারটা জানতাম না। শ্বেতাঙ্গরা তাদের নিজেদের জায়গায় কেমন আছে তা একবার দেখে আসতে আমি যেতে চাইলাম। মাকে জিজ্ঞাস করলাম: 'ওদের একবারটি গিয়ে দেখে আসবো, মা?'

'চুপ, ও কথা মুখে আনতে নেই।'

'কেনো মা?'

'তুই চুপ করে থাকবি কি?'

দেখতে পাবো না কেনো মা?,

'কথা বলিস না বলছি বোকার মত, চুপ কর।'

অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, মাকে 'শ্বেতাঙ্গ' আর 'কৃষ্ণাঙ্গ' সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলেই তিনি মহা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এর কারণটা কি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। স্বতন্ত্র এই দু' জাতের

লোক প্রতিদিন পাশাপাশি বসবাস করে। তবুও—এক কেবল মার-ধোর করার সময় ছাড়া—কেউ কারোর দিকে চোখ তুলে চায় না, ভুলেও ছোঁয় না একে অপরকে। আমি এর অর্থ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম। এই তো রয়েছেন দিদিমা!—ধবধবে কেমন ফরসাই না দেখতে তিনি। তিনি কি শ্বেতাঙ্গিনী নন? শ্বেতাঙ্গরাই বা কি মনে করে তাঁকে দেখে?

'আচ্ছা মা, দিদিমা ফরসা না?'

অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন এগিয়ে চলেছে হুস্ হুস্ করে। মাকে আমি প্রশ্ন করে বসলাম।

'চোখ নেই তোর, দেখতে পাসনে দিদিমার গায়ের রঙ কেমন?'

'বাঃ রে, আমি বলছি, শ্বেতাঙ্গ লোকেরা কি তাঁকে নিজেদের মত একজন মনে করে?'

'ওদের জিজ্ঞেস করলেই পারিস!' মা পাল্টা জবাব দিলেন।

'কিন্তু তুমি তো জানো, বলো না।'

'আমি কি করে জানবো?' মা শুধালেন। বললেন: 'আমি তো আর ওদের মত ফরসা নই।'

'হ্যাঁ, দিদিমা ঠিক ওদের মত একজন।' আমি মেনে নিলাম—'আচ্ছা, তাই যদি হয়, দিদিমা আমাদের মত কালা আদমীদের সঙ্গে থাকেন কেনো, মা?'

'কেনো, তুই বুঝি চাসনে উনি আমাদের সঙ্গে থাকুন?'

'তা নয়।'

'তবে জিগ্‌গেস করছিস কেনো?'

'আমি সব জানতে চাই, মা।'

'উনি কি আমাদের সঙ্গে থাকেন না?'

'হ্যাঁ, থাকেন তো।'

'তা হোলে আবার জিগ্‌গেস করছিস কেন?'

'কিন্তু দিদিমা কি সত্যি সত্যি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান?'

'এ প্রশ্ন তুই ওঁকে করলেই পারিস।' মা আমায় এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

'আচ্ছা মা, দাদামশাই-য়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকেই কি দিদিমা অমন কালা আদমী বনে গেলেন?'

'এ সব বাজে প্রশ্ন রেখে এখন তুই চুপ করবি?'

'কিন্তু তাই না মা?'

'না, কালা আদমী বনা নয়।' রেগে গিয়ে মা জবাব দিলেন—'কালা আদমীদের ঘরেই তাঁর জন্ম—'

সত্যের দ্বার বুঝি আবার রুদ্ধ হয়ে গেল!

'অপর কোন শ্বেতাঙ্গ লোককে দিদিমা বিয়ে করলেন না কেনো মা?' আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

'কোরলেন না, ওঁর ইচ্ছে হয়নি বলে।' মা জবাব দিলেন বিরক্ত হয়ে।

'বাঃ রে, জবাব দিচ্ছো না কেনো?' মা এবার আমায় একটা চড় মারলেন। গলা ছেড়ে আমি কেঁদে উঠলাম। নির্লিপ্ত, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে মা তারপর বকবক করতে করতে বলে গেলেন, দিদিমা অমন এক নিগ্রো বংশ থেকে এসেছেন যাঁর সঙ্গে আইরিশ, স্কচ আর ফরাসী রক্ত-ধারা আছে মিশে।

'দাদামশাইকে বিয়ে করার আগে দিদিমার কি নাম ছিলো, মা?'

'বোল্‌ডেন।'

'ও নাম তাঁর কে রাখলে?'

'শ্বেতাঙ্গ যে লোকটা ওঁকে দাবী করত সেই।'

'সে কি! দিদিমা কি ক্রীতদাসী ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দিদিমার বাবার নাম ছিল বুঝি বোলডেন?'

'বাপ কে ছিলেন উনি তা জানেনই না!'

'তাই বুঝি ওরা চেয়ে-চিন্তে একটা নাম তাঁকে দিয়ে দিলে?'

'নাম একটা দিলে, এটুকুন খবরই আমি জানি বাপু।'

'বাবা কে ছিলেন, দিদিমা একবার খোঁজ করে দেখলেন না?'

'কেন রে, বোকা কোথাকার?'

'বাঃ রে, তা হোলে যে উনি সব জানতে পারতেন!'

'জেনে কি লাভ?'

'এমনি জানতেন।'

'তবু কেনো?' আমি অতখানি তলিয়ে দেখতে শিখিনি। কারণ বলতে পারলাম না। একটু পরে মাকে আবার জিগ্‌গেস করলাম:

'হ্যাঁ মা, বাবার নাম কে রেখেছিল?'

'ওঁর বাবা।'

'আচ্ছা, বাবার বাবার নাম রেখেছিল কে?'

'দিদিমার নামের মত শ্বেতাঙ্গরা কেউ রেখেছিল হয়ত?'

'ওঁরা জানতেন মা, উনি কে?'

'আমি অত সব জানিনে বাপু।'

'ওঁরা একবার খোঁজ করে দেখলে না কোনো মা?'

'কেনো?' মা জানতে চাইলেন।

বাবার বাবা কে, তাঁকে বা কেনো তিনি খুঁজে বেড়াবেন, আমি তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ভেবে উঠতে পারলাম না।

'আচ্ছা, বাবার মধ্যে কি কি রক্ত মিশানো আছে, মা ?'

'এই খানিকটা শ্বেতাঙ্গদের, খানিকটা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের আর খানিকটা নিগ্রোদের।'

'ইণ্ডিয়ান, শ্বেত আর নিগ্রো রক্ত ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হোলে আমি কি, মা ?'

'তুইও যখন বড়ো হবি, তোকে সবাই বলবে কালা আদমী।' মা জবাব দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হেসে ঠাট্টা করেই বললেন : 'কি গো, রাগ হোলো নাকি রাইট্ মশাই-এর !'

এবার আমি রেগে উঠলাম সত্যি সত্যি। কোন উত্তর দিলাম না। আমায় কালা আদমী ডাকার জন্য আমি কিছু মনে করিনি ! কিন্তু আমি ঠিক টের পেলাম, মা কি যেন লুকোলেন আমার কাছে। তেমন বড়ো রকমের কোন ব্যাপার যে গোপন করে রাখলেন, তা নয়। কিন্তু তিনি তাঁর আবেগ, অনুভূতি আর আত্মবিশ্বাসের কিছুই আমায় জানতে দিলেন না। এ-নিয়ে তাঁকে বারবার খোঁচা দিতেই তিনি মহা রেগে গেলেন। আচ্ছা, নাই বা বললেন মা ! আমি একদিন ঠিক জানবই। আমায় আরও একটু সবুর করতে হবে। বেশতো হলামই বা আমি কালা আদমী ! তাই বেশ ! আগে থেকে অমন ভয় পাবার, কি ঘাবড়ে যাবার কি আছে ? কালা আদমীদের ওপর মারধোর করা হয়, এমন কি তাদের পেলে একদম জানে মেরে ফেলাই হয়, সত্যি অমন অনেক কথা কতই না শুনেছি। আমার বেলায় ওসব কিন্তু চলবে না। কেউ যদি আমায় খুন করতে আসে, আসুক না ! প্রাণ নিয়ে বাছাধনকেও আর ফিরতে হবে না। জান আমি তার আগেই কবুল করব। সোজা কথা বলে রাখলাম। আমি শপথ নিলাম।

আমরা এসে পৌছলাম এলেনে। এখানকার ম্যাগী মাসির বাড়িখানা বাংলো ধরণের। চারদিকে পাচিল দিয়ে ঘেরা। রীতিমত বাটীর মতনই মনে হোল। আমি মহা খুশী হয়ে গেলাম। মাত্র দিন কয়েক এখানে আমায় থাকতে হবে, আমি তাই জানতাম। এবং এও জানতাম যে, এখানেই আমার প্রথম দীক্ষা শুরু হবে জাতিগত বৈষম্যমূলক জীবনধারার সঙ্গে।

ম্যাগী মাসির বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে গেঁয়ো একটা পথ। রাস্তাটার তুই পাশে বুনো অনেকগুলো ফুল গাছ গজিয়ে ছিল। গ্রীষ্মকাল। মাটির সোঁদালি গন্ধে চারদিক উঠেছিল ভরে। প্রত্যেকদিন সকাল বেলা, ঘুম থেকে উঠে শিশির ভেজা ওই ধূলোকাদা মাথা রাস্তা ধরে খালি পায়ে আমি হেঁটে যেতাম অনেকদূর।

একটু রোদ উঠলেই মৌমাছিরা এসে জুটত ফুল গাছে। হাতের তালু তুটোকে চট করে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলতে পারলে একটা মৌ-মাছিকে পিষে মেরে ফেলা যায়, এ কৌশল আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। ও সব না করতে মা আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন অনেকদিন। বলেছিলেন মৌমাছিদের কাছ থেকে মধু পাওয়া যায়, খাবার তৈয়ারী করে যারা তাদের মারতে নেই। মৌমাছিদের তাড়া করলে ওরা একদিন আমায় হুল ফুটিয়ে দেবে—মা বললেন। যে কোন মৌমাছিকেই আমি বোকা বানিয়ে ফেলতে পারব বলে আমার ধারণা ছিল। একদিন সকালবেলা প্রকাণ্ড একটা মৌমাছি ফুলের উপর উড়ে এসে বসতেই, তু হাতে থাবা দিয়ে আমি তাকে মারতে গেলাম। পাজি মৌমাছিটা কিন্তু আমার বাঁ হাতের তালুর ঠিক মধ্যিখানে হুল ফুটিয়ে দিলে অনেকখানি।

চীৎকার করতে করতে আমি বাড়ীর দিকে ছুটলাম।

'বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি সাজা।' মা বলে উঠলেন শুষ্ক নিষ্প্রাণকণ্ঠে। এর পর থেকে মৌমাছি মারতে আমি আর কখনও যাইনি।

ম্যাগী মাসির স্বামী হস্‌কিন্স মেসো ছিলেন এক মদের দোকানের মালিক। আশ-পাশের অঞ্চলের কাঠের কারখানার শত শত নিগ্রো শ্রমিকের খাবার-দাবার সব কিছু সরবরাহ হোত হস্‌কিন্স মেসোর ওই স্যালুন থেকে। মেম্‌ফিসের সেই স্যালুনের কথা মনে পড়ায় আমি একদিন হস্‌কিন্স মেসোকে ধরে বসলাম, আমায় একবার ওখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে; তিনি রাজি হলেন। মা কিন্তু যেতে দিলেন না! মনে মনে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। ভাবলেন, স্যালুনে গিয়ে ওবারের মত আমি বুঝি আবার মাতাল হয়ে উঠব। মা কিছুই বুঝলেন না। ওখানে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে আসতেও তো পারতাম?

ম্যাগী মাসিদের খাবার টেবিলটা সব সময়েই পাঁচ রকমের নানান খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। সবটাই যে সত্যিকারের খাবার, আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারতাম না। অত খাবার, পেট ভরে হয়ত আমি খেয়ে উঠতেই পারব না। আমার কেমন ভয় হোত, এবেলা সব খেয়ে ফেললে ওবেলা আর কিছুই জুটবে না। ম্যাগী মাসিদের সঙ্গে প্রথমদিন খেতে বসে সন্দেহটা দূর না করে কিছুতেই আমি খাবারে হাত দিতে পারলাম না। ফস করে তাই প্রশ্ন করে বসলাম:

'ইচ্ছে মত সব খেতে পারবো তো?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাবে বই কি—যা তোমার ভালো লাগে তাই খেয়ো।' মেসোমশাই জবাব দিলেন। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কথাটা বুঝি বিশ্বেস করতে পারলাম না। আমি গোগ্রাসে খেয়ে

চললাম। শেষকালে আমার পেটটা টিমটিমে হয়ে উঠল। তবু টেবিল ছেড়ে উঠতে আমার ইচ্ছে হোল না। মা তা লক্ষ্য করে বললেন:

'যা, এবার ওঠ! চোখ দুটো যে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে পেটের চাইতে!'

'না—না, ওকে খেতে দাও পেট ভরে।' মেসোমোশাই বললেন আবার।

রাত্রির খাবার-দাবারের পাট সব চুকে যাবার পরও দেখলাম টেবিলের উপর একগাদা বিস্কুট পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম রীতিমত। নিজের চোখকে কেমন বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না, চোখের সামনে গাদা গাদা এত বিস্কুট পড়ে আছে দেখেও। রান্নাঘরেও কত ময়দা রয়েছে জমে। তবু কিন্তু আমার কেমন আশংকা হোত, কাল সকালে চায়ের সঙ্গে বুঝি আর কিছু মিলবে না! কেমন যেন ভয় হোত, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়লেই সব বিস্কুটই বুঝি লোপাট হয়ে যাবে কোথাও। সকালবেলা জেগে বিছানা ছাড়তে আমার ইচ্ছে হোত না। কেননা, ঘুম থেকে উঠলেই খিদে পেয়ে যেত ভয়ানক আমার। সারাটা বাড়ি পাঁতি পাঁতি করে খুঁজলেও কিন্তু এককণা খাবার কোথাও যে আমি পাব না, তা আমি জানতাম। আগে এমনি ঘটনা বহুবারই ঘটেছে। তাই বিস্কুটের ঝাঁকি থেকে খান কয়েক বিস্কুট লুকিয়ে আমি রেখে দিতাম আমার প্যাণ্টের পকেটের মধ্যে। লুকিয়ে রাখতাম খাব বলে নয়। ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা করে। টেবিলের ওপর থরে থরে সাজান খাবার দেখেও আমি এই অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারি নি। কাপড় জামা কাচবার সময় মা ভিজে চটচটে, গলে-যাওয়া রুটির সেই টুকরোগুলো দেখতে পেয়ে আমায় খুব বকতেন। বলতেন ওই স্বভাব ছেড়ে দিতে। যতদিন পর্যন্ত না আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে

গেল যে টেবিলে গিয়ে খেতে বসলেই অমনি খাবার আসবে, ততদিন কিছুতেই চুরি করার এই অভ্যাস আমি ছাড়তে পারলাম না।

হস্‌কিন্স মেসোর একটি ঘোড়া ও একখানি গাড়ি ছিল। কর্মস্থান হেলেনায় যাবার সময় তিনি আমাকে প্রায় সঙ্গে করে নিতেন। একদিন গাড়ীতে চেপে তাঁর সঙ্গে আসছিলাম। তিনি শুধোলেন:

'রিচার্ড, নদীর মধ্যিখানে গিয়ে ঘোড়ার জল খাওয়াটা দেখবে নাকি?'

'হ্যাঁ, দেখবো।' আমি হেসে বলে উঠলাম। 'অদ্দূর কিন্তু গাড়ী কিছুতেই যেতে পারবে না।'

'দেখবে পারে কি না? একটু সবুর করো!' মেসোমশাই জবাব দিলেন।

ঘোড়াটাকে কষে একটা চাবুক লাগিয়ে গাড়িখানা তিনি সিধে চালিয়ে দিলেন মিসিসিপি নদীর মাঝখানে।

বুকটা আমার ঢিপ ঢিপ করে উঠল। জিগগেস করলাম: 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'ঘোড়াটা জল খাবে কি না?'

বাঁধের ওপর দিয়ে তিনি গাড়ি হাঁকালেন। লম্বা লম্বা শীলা পাথরের নীচ দিয়ে গাড়িখানা একেবারে জলের ধাবে এসে পড়ল। ঘোড়াটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। মাইল খানেক ব্যাপী বিস্তৃত মিসিসিপি নদীর থৈ থৈ জলরাশির দিকে তাকিয়ে আমার ভয়ানক ভয় হতে লাগল।

'না, না'! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'বা রে, ঘোড়াটা বুঝি একটু জল খাবে না? ও এখানকার জল খায় না যে।' মেসোমশাই ঘোড়াটার পিঠে সফাৎ করে আর একটা চাবুক দিলেন বসিয়ে।

গাড়িখানা আরও কিছুদূর অগ্রসর হোল। ঘোড়ার গতিটা আবার মন্দা হয়ে এল। স্রোতের উপর মাথা দোলতে লাগল ঘোড়াটা। সাঁতার না জানলেও ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। গাড়িখানার একটা পাশ জোরে আঁকড়ে ধরলাম।

'চুপ করে বসো, নইলে পড়ে যাবে যে।' মেসোমশাই সাবধান করে দিলেন উচ্চ স্বরে।

'না, নেমে যেতে দিন আমায়?' গাড়ির চাকা কটা এবার জলে ডুবে গেল। নদীতে ঝাঁপ দিতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেসোমশাই আমার পা চেপে ধরে রাখলেন। চারদিকে আমাদের থৈ-থৈ করতে লাগল জল!

'নেমে যেতে দিন না আমায়?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

গাড়িখানা গড়িয়ে যেতে লাগল। ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল জল। ঘোড়াটা মাথা দোলাতে লাগল সমানে। ঘাড়টা বাঁকালে ধনুকের মত করে। লেজটা আঁছড়াতে লাগল এদিক ওদিক। চোখ বুঁজে তারপর ঘোৎ ঘোৎ করে শব্দ করতে লাগল নাক দিয়ে। গাড়ির কিনারটা আমি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম। প্রস্তুত হয়ে রইলাম গাড়িটা গভীর জলে গিয়ে পড়লেই যাতে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। মেসোমশাই-এর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি শুরু করে দিলাম ধস্তাধ্বস্তি।

'হোয়া-আ!' ঘোড়ার উদ্দেশ্যে তিনি মুখ দিয়ে কেমন একটা শব্দ করলেন।

ঘোড়াটা এবার থেমে গেল। ডাক ছাড়লে একবার। নদীটার এতদূর গাড়িখানা এসে পড়ে ছিল যে হাত বাড়ালেই, আমি যেন

নদীর কলকলে ঘোলাটে জলটা ছুঁয়ে ফেলতে পারতাম। মেসো-মশাই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন :

'কেমন, তুমি ভেবেছিলে বুঝি নদীর মাঝ খানে নিয়ে গিয়ে গাড়িখানা আমি ডুবিয়ে দেবো সত্যি সত্যি ?'

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোন জবাবই দিতে পারলাম না। শরীরের পেশীগুলো বুঝি ধরে গিয়েছিল। কন্‌কন করতে লাগল পেশীগুলি।

'চল এবার, হয়েছে।' প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন।

গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি নদীর বাঁধের দিকে চালাতে লাগলেন। গাড়ির কিনারটা আমি কিন্তু তখনও আঁকড়ে ধরে রইলাম প্রাণপণে। হাতের মুঠিটা শিথিল হতে দিলাম না।

'যাক, আর কোন ভয় নেই।' মেসোমশাই জানালেন।

গাড়িটা এবার শুকনো ডাঙায় উঠে এল। ভয়টা প্রশমিত হোল কিছুটা। মনে হোল, উঁচু এক পাহাড়ের চুড়া থেকে আমি যেন পা পিছলিয়ে যাচ্ছি পড়ে। আমার মনে হোল খানিকটা ঝাঁঝাল গন্ধ কোথা থেকে যেন এসে লাগল আমার নাকে। কপালটা ঘেমে উঠল রীতিমত।

টিপটিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে।

'আমি নেমে যাবো।' আমি বলে উঠলাম।

'কি হোল আবার ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'না, আমি নেমে যাবো !'

'বা রে, আমরা তো এখন ডাঙায় এসে পড়েছি।'

'না-না। গাড়ি থামান, আমি নেমে যাবো।'

গাড়ি তিনি থামালেন না। আমার দিকে একবার চেয়েও

দেখলেন না। বুঝলেন না আমায়। সহসা সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে নিজের পা-দুটো আমি ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম রাস্তার ধূলোর উপর। তবে চোট লাগল না বিশেষ। মেসোমশাই গাড়ি থামালেন।

'ভয় পেয়েছ নাকি সত্যি সত্যি' ? তিনি জিগগেস করলেন।

কথা বলতে পারছিলাম না। আমি কোন জবাব দিলাম না। ভয়টা আমার কেটে গিয়েছিল। তবুও মেসোমশাই-এর মুখখানা আমার চোখের উপর ভেসে উঠল প্রকাণ্ড হয়ে। মনে হোল, তিনি যেন এক অজানা অচেনা অপরিচিত লোক। ইতিপূর্বে তখনও বুঝি চাক্ষুষ দেখা হয় নি তাঁর সঙ্গে। অমন একটা লোকের সঙ্গে একত্র থাকা এক মুহূর্তও চলে না।

'রিচার্ড, উঠে পড়ো শীগগির গাড়ির মধ্যে। চল, তোমায় রেখে আসি বাড়িতে।'

আমি মাথা নাড়লাম। কাঁদতে শুরু করে দিলাম।

'তুমি বুঝি আমার কথা আর বিশ্বেস করছো না ?' তিনি প্রশ্ন করলেন। বললেন : 'বুড়ো এই নদীটার তীরেই আমার জন্ম। তার কথা আমি আর জানি নে ? এর জলের নীচেটা রয়েছে থান থান ইঁট আর পাথর। আধ মাইলটক্ পর্যন্ত তুমি যাও না কেনো দিব্যি পায়ে হেঁটে, এই এক বুক জলও তোমার হবে না।'

কথাগুলো কেবল তাঁর বলাই সার হোল। কোন দাগ কাটল না। গাড়িতে আমি আর উঠলাম না কিছুতেই। তাই বুঝি তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন : 'চল তোমায় বাড়িতে রেখে আসি'।

ধুলোময় রাস্তা ধরে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। গাড়ি থেকে তিনি নেমে এলেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। কেনা-কাটা

করা সেদিন তাঁর আর হয়ে উঠল না। আমায় কেন ভয় দেখাচ্ছিলেন, তিনি এবার তা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। আমি কিন্তু তা একটুও বিশ্বাস করলাম না। তাঁর উপর সব আস্থাই আমি হারিয়ে ফেললাম। তাঁর মুখখানা দেখলেই আমার তখন স্পষ্ট করে মনে পড়ে যেত মাঝ নদীর পথের বিভীষিকাময় সেই মুহূর্তগুলির কথা। সে স্মৃতিটাই আমাদের দুজনের মধ্যে মহা প্রাচীর তুলে দিলে!

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা হসকিন্স মেসো চলে যেতেন তাঁর মদের দোকানে। রাত্রিতে আর ফিরতেন না। ভোর হলেই বাড়ি আসতেন। বাবার মত তিনিও দিনের বেলা ঘুমোতেন। কিন্তু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হাজার গোলমাল করলেও তিনি কখনও টুঁ শব্দটি করতেন না। আমি আর ছোট ভাইটি তো যতক্ষণ খুশিই হাঁকাহাকি করে কিংবা টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে গোলমাল করতাম! তিনি ঘুমিয়ে পড়লে কতদিন তো আমি তাঁর ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়তাম। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম বালিশের পাশে রক্ষিত চকচকে তাঁর বড়ো রিভলবারটার দিকে। হাতের কাছে অস্ত্র রেখে তিনি ঘুমান কেনো, ম্যাগী মাসিকে আমি একদিন শুধিয়েছিলাম। তিনি বললেন, শ্বেতাঙ্গ লোকেরা মেসোমশাইকে খুন করবে বলে নাকি শাসিয়েছে।...

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, মেসোমশাই নাকি কাল বাড়ি ফেরেন নি স্যালুন থেকে। ম্যাগী মাসি খুব ব্যস্ত আর খিটখিটে হয়ে উঠলেন। কারণটা কি স্যালুনে গিয়ে নিজে একবার দেখে আসতে চাইলেন। কিন্তু ওখানে যেতে তাঁকে বারণ করেছিলেন মেসোমশাই। বেলা বেড়ে চলল। দুপুরের খাবারের সময় হয়ে এলো।

'নিজে গিয়ে একবারটি দেখে আসি'? মাসী বললেন।

'না, তোমার যাওয়া ঠিক উচিত হবে না।' মা উত্তর দিলেন—'বলা যায় না, কি বিপদ না আবার ঘটে বসে।'

উনানের ওপর খাবার সব রেখে দেয়া হোল গরমে। সামনের গাড়ি বারান্দায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন ম্যাগী মাসি। সন্ধ্যে হয়ে এল। স্যালুনে গিয়ে দেখে আসবার জন্য তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে এবারও মা নিরস্ত করলেন। সন্ধ্যা বসে গেল। হয়ে এল অন্ধকার। তবু তিনি ফিরলেন না। মাসী এবার ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলেন। মুখের কথা যেন তাঁর হারিয়ে গেল।

'ঈশ্বর না করুন, শেতাঙ্গ লোকেরা আবার ওঁর পিছু নেয়নি তো?' তিনি একসময় বলে উঠলেন।

একটু পরেই তিনি গিয়ে ঢুকলেন শোবার ঘরে। নাকি সুরে প্যান প্যান করতে করতে তিনি তারপর বেরিয়ে এলেন।

'ও যে আবার বন্দুকটাও সঙ্গে নেয় নি! মা গো, কপালে আজ কি লেখা আছে কে জানে!'

আমরা সবাই নীরবে কিছুটা খেয়ে নিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে সামনের গাড়ি বারান্দায় ভারী বুটের দ্রুত শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে কড়া নড়ে উঠল। ছুটে গিয়ে মাসী খুলে দিলেন দরজাটা। লম্বা পানা নিগ্রো একটি ছোকরা ঘামে চুপসে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। টুপি খুলে এবার সে নমস্কার জানালে।

'মিঃ হস্‌কিনস্‌...খুন হইছেন। এক শেতাঙ্গ আইসা গুলি কইরা গেল।' ছোকরাটা ধুঁকতে লাগল। আবার বলল: 'মিসেস্ হস্‌কিনস্‌, কর্তার মৃত্যু হইছে।'

মাসী আর্তনাদ করে উঠলেন। তারপর গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে ধূলি-ধূসরিত রাস্তা ধরে ছুটে চললেন অন্ধকারে।

'ম্যাগী !' মা চিৎকার করে উঠলেন।

'খবরদার, ওই ম্বালুনপানা যাইবেন না কেউ আপনারা।' ছোকরাটি সাবধান করে দিল।

'ম্যাগী !' ম্যাগীমাসীর পিছু পিছু মাও ছুটলেন।

'খবরদার, ওদিকপানা আপনারা কেউ যাইবেন না। গেলে পর আপনাদেরও মাইরা ফেলিব ওঁনারা।' ছোকরাটি ডেকে বলে উঠল : 'শ্বেতাঙ্গ লোকেরা আরো কইতেছিল, পরিবারের সকলকেও মাইরা ফেলিবে !'

ম্যাগী মাসীকে টানতে টানতে মা বাড়িতে নিয়ে এলেন। ভয়ের কাছে শোকের মুর্চ্ছনা উবে গেল। সেই রাত্রিতেই আমরা প্রয়োজনীয় বাসন-কোসন আর কাপড়-জামা কয়টি বাঁধা ছাঁধা করে গাঁয়ের এক চাষীর মাল-টানা গাড়ির মধ্যে বোঝাই করে দিলাম। গা আঁধারি থাকতেই তারপর প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এলাম। হসকিন্স মেসোকে কেন শ্বেতাঙ্গদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম। মেসোমশাইয়ের লাভজনক ওই মদের দোকানখানার উপর শ্বেতাঙ্গদের নজর ছিল বহু দিন থেকে। দোকানখানা হাতছাড়া করতে ওরা অনেক দিনই বলেছে। নইলে তাঁকে জানে কবুল করে দেবে বলেও শাসিয়ে গেছে অনেকদিন। আরও কিছুটা টাকা জমিয়ে নেবেন বলে মেসোমশাই দোকানখানার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

পশ্চিম হেলেনাতে এসে আমরা খান কয়েক ঘর পেলাম। ম্যাগীমাসী আর মা দিনরাত্রি চোব্বিশ ঘণ্টাই ঘরের এক কোণে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকতেন। রাস্তায় বেরুতে সাহস পেতেন না। পরে অবশ্য মাসী ভয়টা কাটিয়ে উঠেছিলেন। প্রায় যাতায়াত করতেন এলেনে। তবে যেতেন রাত্রি বেলায় গোপনে। এক মাকে ছাড়া তিনি আর কাউকে জানাতেন না এসব কথা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ-আয়োজন কিছুই অনুষ্ঠিত হোল না। শ্রুত হোল না শোকব্যঞ্জক কোন সংগীতই। শবানুগমণের কোন অনুষ্ঠানও না। শুভ্র এক গুচ্ছ পুষ্পও যদি কেউ বর্ষণ করত মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে! কেবল মৌন ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস, নিঃসীম নীরবতা আর ত্রস্ত ভীত-সংকুল কানে কানে কথা কহার মধ্যেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান হোল। কখন বা কোথায় হসকিন্স মেসোমশাইকে সমাধিত করা হয়েছে, আমি জানি না। তাঁর শবটা ম্যাগী মাসীকে পর্যন্তও দেখতে দেওয়া হয়নি একবারটি। বিষয় আশয় কোন-কিছুর দাবীও না। আমাদের কাছ থেকে একরূপ অতর্কিত ভাবেই এমনি করে ছিনিয়ে নেয়া হোল হসকিন্স মেসোমশাইকে। শ্বেতাঙ্গদের ক্রুদ্ধ ক্ষুধিত আক্রোশ এখনও যে সর্বত্র আমাদের হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, আমরা তা জানতাম। তাদের রোষ কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় আমরা সদা-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম। আমরা একরকম আত্মগোপন করেই ছিলাম। শ্বেতাঙ্গ বিভীষিকার মত এও আমাকে কেমন যেন অভিভূত করে তুলল। ভন ভন করে আমার মনটি ঘুরতে লাগল চরকির মত। আমরাও কেন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম না, তার কারণ মাকে শুধালাম। প্রশ্ন শুনে মা শংকিত হয়ে উঠলেন। ঠ্যাস করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। বললেন চুপ করতে।

এমনি করে স্বামী কিংবা বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে রিক্তা হয়ে মা আর মাসীমা আঘাত পেয়েছিলেন খুবই। আস্থা হারিয়ে ফেললেন নিজেদের উপর। বিস্তর কথা কাটাকাটি ও দ্বিধা-সংকোচের পর তাঁরা অবশেষে স্থির করলেন, দিদিমার কাছে ফিরে যাবেন। ওখানে কিছুদিন থেকে তারপর না হয় ভাবা যাবে জীবিকা সংস্থানের কথা নতুন করে। হঠাৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়

যাওয়া-আসার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল আমার অল্পবয়স থেকেই। তাই নতুন আর এক স্থানে যাবার মাদকতাটা আমায় মাতিয়ে তুললে না। নতুন কি পুরোন কোন স্থানপরিবর্তন করবার সময় আমার মনে একটুও খাঁজ কাটত না। ও আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

বয়স আমার নয় বৎসর চলছিল। কিন্তু একটানা একটি বছরও এ পর্যন্ত আমার ইস্কুলে কাটেনি। সে বিষয়ে আমার কোন তাগিদও ছিল না। পড়তে পারি, গুণতেও জানি। কি বড়ো কি ছোট অমন তা কয় জনেই বা জানে? আমাদের পরিবারেও ভাঙ্গন ধরল। আসবাবপত্র কিছুটা বিক্রয়, কিছুটা বিতড়ন আর বাদবাকিটা ফেলে আসাই ঠিক হোল। আমরা আবার ট্রেনে চাপলাম।

দিদিমাদের বাড়িতে আসার কিছু দিন পরের কথা। একলা একলা আমি একদিন খেলছিলাম অপরিচ্ছন্ন এক মাঠে। পুরোন একখানা ছুরি দিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ছিলাম। হঠাৎ ছন্দ-মুখর এক শব্দলহরী আমার কানে এসে পৌঁছল। আমি মুখ ফিরালাম। দূরের ওই পাহাড়টার আড়াল থেকে খাকি রঙের পোষাকপরা কালো কালো এক দল লোক এগিয়ে আসছে যেন আমার দিকে রাগতভাবে। তড়াক করে আমি কখন লাফিয়ে উঠলাম। বুকের ভিতরটা আমার টিপটিপ করতে লাগল সশব্দে। এ কি! আমায় ধরতে আসছে নাকি ওরা! লাইনের পর লাইন ধরে সারির পর সারি দিয়ে কিম্ভুতকিমাকার ওই লোকগুলো বিদঘুটে কেমন একটা ঝাণ্ডা উড়িয়ে সিধে আমার দিকে যেন নেমে আসছে পাহাড় থেকে। তালে তালে পা পড়ছে তাদের নীচের মাটির ওপর। দামামা বাজছে সশব্দে। আমি ছুটে বাড়িতে ঢুকে পড়তে চাইলাম। কিন্তু একপাও নড়তে পারলাম না। মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। এ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন যে

যদি আমায় করে দেয়! কিন্তু কোথাও কাউকেও দেখলাম না। সার বেঁধে লোকগুলো আমার দিকে তখনও এগিয়ে আসতে লাগল। বুকের স্পন্দন দ্রুত বেড়ে গেল। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠতে লাগল থরথর করে। আমি একবার দৌড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নড়তে পারলাম না এক পাও। মা বলে এবার চিৎকার করতেও গেলাম। কোন শব্দই বেরুল না কিন্তু মুখ দিয়ে। ওরা এবার এসে পড়ল আমার আশেপাশে। ঠিক একে অপরের মত হুবহু দেখতে। তালে তালে পা ফেলে ধূলো উড়িয়ে ওরা আবার চলে গেল পাশ কেটে। পাশ কেটে যাবার সময় দেখলাম, ওরা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাসির রেখাও বুঝি ফুটে উঠেছে কারো কারো মুখে। প্রত্যেকেরই কাঁধে রয়েছে লাঠির মত কি যেন একটা। এক জন কি যেন বলেও গেল চিৎকার করে আমার উদ্দেশে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার কাছ থেকে ওরা এবার অনেক দূরে চলে গেল। ধূসর পিঙ্গল একরাশ ধূলির বেড়াজাল সৃষ্টি করে বুঝি মিলিয়ে গেল একে একে। ওরা চোখের আড়াল হতে ভয়টা কেটে গেল। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলাম বাড়িতে। এক নিশ্বাসে ঘটনাটা সব বলে ফেললাম মাকে। জিগগেস করলাম:

'অদ্ভুত ওই লোকগুলো কারা মা?'

'সৈন্য।' মা উত্তর দিলেন।

'সৈন্যরা কারা, মা?'

'যে সব লোক যুদ্ধ করে।'

'যুদ্ধ করে কেনো মা?'

'দেশের ডাক এলে যুদ্ধে যেতে হয়।'

'আচ্ছা মা, লাঠির মত কালো লম্বা লম্বা ওগুলো কি ছিলো ওদের কাঁধের ওপর?'

'ও হোল রাইফেল্।'

'রাইফেল কি মা ?'

'বন্দুকের মতই অনেকটা—যা থেকে বুলেটের গুলি ছোঁড়া হয়।'

'পিস্তলের মত ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বুলেটের গুলি তোমায় মেরে ফেলতে পারে ?'

'হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় লাগলে পারে বই কি ?'

'ওরা কাদের মারতে যাচ্ছে মা ?'

'জার্মানদের।'

'জার্মানরা কারা মা ?'

'আমাদের শত্তুর।'

'শত্তুর কারা মা ?'

'যে দেশের লোক তোমায় মারতে আসে কিংবা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় তোমাদের দেশ—।'

'ওরা কোথায় থাকে মা ?'

'সমুদ্রের ওপারে।' মা বুঝিয়ে বললেন।—'এখন লড়াই চলেছে তোকে বলেছি মনে নেই বুঝি ?'

এবার মনে পড়ল। কথাটা যখন মা বলছিলেন, আমি তখন তাতে কোন গুরুত্ব আরোপ করিনি। যুদ্ধ কেন হচ্ছে মাকে যখন জিগগেস করলাম, তিনি তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আর জার্মানীর কথা সব বলে গেলেন। কাতারে কাতারে লোক কি করে যুদ্ধক্ষেত্রে মরছে তাও বললেন। কিন্তু সব ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন গুলিয়ে গেল। এত ব্যাপক আর এত অপরিচিত মনে হোল যে কোন দাগই কাটল না আমার মনে।

আর এক দিনের কথা।

বাড়ির বাইরে আমি খেলছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালাম রাস্তার দিকে। দেখলাম এক পাল হাতি যেন ঠিক এগিয়ে আসছে আমার দিকে গুটি গুটি পা ফেলে। ওবার সৈন্য দেখে আমার মনে যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, এবার কিন্তু তা কিছুই হোল না। তা ছাড়া অদ্ভুত ওই জীবগুলোকে দেখলাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নীরবে। ওদের হাবভাবের মধ্যে ভীতিপ্রদ তেমন কিছুই ছিল না। তবু চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দরজার দিকে আমি পা বাড়ালাম। গতিক মন্দ দেখলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে রাখলাম নিজেকে। হাতির মত অদ্ভুত সেই জীবগুলো আমার হাত কয়েকের মধ্যে এবার এসে পড়ল। অবাক কাণ্ড, চোখ-মুখ যে ওদের ঠিক মানুষের মতই! আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

তালগোল সব পাকিয়ে গেল আমার বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে। এরা আবার কেমনতরো লোক? আমি নিজেকে শুধালাম। অনেকটা মানুষের মতনই যে মনে হচ্ছে দেখে! দু-একটা শ্বেতাঙ্গ লোকের মুখও দেখা গেল। কিন্তু বেশীর ভাগই হোল কৃষ্ণাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গরা আর পাঁচ জনার মতই বেশভূষা পরেছে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের পোষাক দেখে ওদের হাতি বলেই আমার মনে হোল। আমার মুখোমুখি এসে পড়তেই দেখলাম, ওদের সকলের পা রয়েছে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা; হাতেও বেড়ী। নড়া চড়া করবার সময় ঝন্‌ঝন করে একটা শব্দ হচ্ছে ভারী মিষ্টি। ওরা রাস্তার দু-পাশে ঢালু মত একটা গড় খুঁড়ছিল নীরবে মাথা গুঁজে। কোদালি করে ঝাঁকায় ঝাঁকায় মাটি রাস্তার মাঝখানে ফেলবার সময় ওরা হাঁফাতে

'ও হোল রাইফেল্।'

'রাইফেল কি মা?'

'বন্দুকের মতই অনেকটা—যা থেকে বুলেটের গুলি ছোঁড়া হয়।'

'পিস্তলের মত?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বুলেটের গুলি তোমায় মেরে ফেলতে পারে?'

'হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় লাগলে পারে বই কি?'

'ওরা কাদের মারতে যাচ্ছে মা?'

'জার্মানদের।'

'জার্মানরা কারা মা?'

'আমাদের শত্তুর।'

'শত্তুর কারা মা?'

'যে দেশের লোক তোমায় মারতে আসে কিংবা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় তোমাদের দেশ—।'

'ওরা কোথায় থাকে মা?'

'সমুদ্রের ওপারে।' মা বুঝিয়ে বললেন।—'এখন লড়াই চলেছে তোকে বলেছি মনে নেই বুঝি?'

এবার মনে পড়ল। কথাটা যখন মা বলছিলেন, আমি তখন তাতে কোন গুরুত্ব আরোপ করিনি। যুদ্ধ কেন হচ্ছে মাকে যখন জিগগেস করলাম, তিনি তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আর জার্মানীর কথা সব বলে গেলেন। কাতারে কাতারে লোক কি করে যুদ্ধক্ষেত্রে মরছে তাও বললেন। কিন্তু সব ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন গুলিয়ে গেল। এত ব্যাপক আর এত অপরিচিত মনে হোল যে কোন দাগই কাটল না আমার মনে।

আর এক দিনের কথা।

বাড়ির বাইরে আমি খেলছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালাম রাস্তার দিকে। দেখলাম এক পাল হাতি যেন ঠিক এগিয়ে আসছে আমার দিকে গুটি গুটি পা ফেলে। ওবার সৈন্য দেখে আমার মনে যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, এবার কিন্তু তা কিছুই হোল না। তা ছাড়া অদ্ভুত ওই জীবগুলোকে দেখলাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নীরবে। ওদের হাবভাবের মধ্যে ভীতিপ্রদ তেমন কিছুই ছিল না। তবু চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দরজার দিকে আমি পা বাড়ালাম। গতিক মন্দ দেখলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে রাখলাম নিজেকে। হাতির মত অদ্ভুত সেই জীবগুলো আমার হাত কয়েকের মধ্যে এবার এসে পড়ল। অবাক কাণ্ড, চোখ-মুখ যে ওদের ঠিক মানুষের মতই! আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

তালগোল সব পাকিয়ে গেল আমার বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে। এরা আবার কেমনতরো লোক? আমি নিজেকে শুধালাম। অনেকটা মানুষের মতনই যে মনে হচ্ছে দেখে! দু-একটা শ্বেতাঙ্গ লোকের মুখও দেখা গেল। কিন্তু বেশীর ভাগই হোল কৃষ্ণাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গরা আর পাঁচ জনার মতই বেশভূষা পরেছে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের পোষাক দেখে ওদের হাতি বলেই আমার মনে হোল। আমার মুখোমুখি এসে পড়তেই দেখলাম, ওদের সকলের পা রয়েছে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা; হাতেও বেড়ী। নড়া চড়া করবার সময় ঝন্‌ঝন করে একটা শব্দ হচ্ছে ভারী মিষ্টি। ওরা রাস্তার দু-পাশে ঢালু মত একটা গড় খুঁড়ছিল নীরবে মাথা গুঁজে। কোদালি করে ঝাঁকায় ঝাঁকায় মাটি রাস্তার মাঝখানে ফেলবার সময় ওরা হাঁফাতে

লাগল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। ডোরাকাটা পোষাক-পরা ওদের একজন এবার তাকাল আমার দিকে মুখ তুলে।

'ওখানে কি করছো তোমরা?' আমি ওকে প্রশ্ন করলাম ফিস্‌ফিস করে। মানুষ কি করে যে সত্যি সত্যি হাতিকে প্রশ্ন করতে পারে আমি তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

হাতিটা মাথা নাড়লে। শ্বেতাঙ্গ পাহারাদারটার দিকে আড়চোখে একবার তাকালে। ঘাড় গুঁজে তারপর আবার মাটি কেটে চলল। শ্বেতাঙ্গদের প্রত্যেকের কাঁধে রয়েছে দেখলাম একটি করে লম্বা কালো ভারী লাঠির মত কি যেন—রাইফেল! ওরা চলে গেলে উর্দ্ধশ্বাসে আমি ঘরে এসে ঢুকলাম।

'মা!' চীৎকার করে আমি ডাকলাম মাকে।

'কি রে?' মা সাড়া দিলেন রান্নাঘর থেকে।

'রাস্তার কত হাতি মা!'

রান্নাঘরের চৌকাটের উপর মা এসে দাঁড়ালেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন:

'হাতি!'

'হ্যাঁ মা। তুমি এসে দেখে যাও না। রাস্তার ওপর মাটি খুঁড়ে দিচ্ছিল ওরা।'

ভিজে হাতখানা মা মুছে নিলেন তাঁর গাউনে। তারপর বাইরের ঘরের দরজার দিকে ছুটে এলেন। ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে বলবার জন্য আমিও তাঁর পিছু পিছু এলাম। দরজার বাইরে তিনি মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন:

'দূর, হাতি কোথায় রে!'

'তবে কি মা?'

'ওরা হোল ডাণ্ডাবেড়ীর দল।'

'ডাণ্ডাবেড়ীর দল কারা মা?'

'দেখতে পারছিস নে ওরা কারা?' মা জবাব দিলেন। বললেন—'শেকল দিয়ে যাদের বেঁধে রাখা হয় কাজকর্ম করিয়ে নেবার জন্যে।'

'কেন মা?'

'ওরা অপরাধ করেছে, তাই সাজা পেতে হচ্ছে।'

'ওরা কি করছে মা?'

'আমি কি করে জান্‌ব?'

'আচ্ছা, ওদের শেকল পরিয়েছে কেন মা?'

'পাছে যদি পালিয়ে যায়।' মা উত্তর দিলেন—'আর ডোরা-কাটা ওদের জামাকাপড় দেখে সবাই যাতে বুঝতে পারে, ওরা কয়েদী।'

'শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো ও পোষাক পরলে না কেনো, মা?'

'ওরা যে সব পাহারাদার।'

'কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরাই কি খালি ডোরা-কাটা পোষাক পরে মা?'

'পরতে হয়—কারণ—জানিস না, ওরা আমাদের উপর খুব কড়া শাসন করে?'

'কারা...শ্বেতাঙ্গ ওই লোকগুলো?'

'হ্যাঁ।'

'শ্বেতাঙ্গদের চাইতে কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরাই তো সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। লড়াই করে সবাই ওদের হটিয়ে দিলে না কেনো?...'

'ওদের সঙ্গে যে বন্দুক আছে।' মা উত্তর দিলেন। তারপর বুঝি আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'ওদের তুই হাতি বলছিলি কেনে রে?'

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারলাম না তৎক্ষণাৎ। শাদা আর

কালো ডোরাকাটা ওদের পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ভাবতে ভাবতে পরে অবশ্য কারণটা মনে পড়েছিল। রঙ-চঙয়ে ভারী মজাদার একখানা আমার ছবির বই ছিল। অনেক বন্য জন্তু জানোয়ারের নাম লেখা ছিল ইবটাতে। রঙ-বেরঙের ছবির মত বিচিত্র দাগ-কাটা জেব্রাগুলোই আমার মনে দাগ কেটেছিল বিশেষ করে। তারপর যে জন্তুটি আমার শিশু মনকে গভীরভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল সে হোল হাতি। হাতি আর জেব্রার প্রতীতির এই অপূর্ব সম্মেলনের ফলে শাদা-কালো ডোরা-কাটা ওই পোষাক-পরা নিগ্রো কয়েদীদের দেখে আমার মনমুকুরে তখন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল জেব্রার কথাই। আমার মনে হয়েছিল তখন গভীর জংগলের হাতিই হবে বুঝি ওরা!

কিছুদিন দিদিমাদের ওখানে থাকার পর পশ্চিম হেলেনায় আমরা আবার ফিরে যাব বলে মা এক দিন জানালেন। এ বাড়ির চাল-চলন, ধর্মের কড়া আচার-নিষ্ঠায় তিনি রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যহ ছয়-সাতবার করে পারিবারিক প্রার্থনা করতে পীড়াপীড়ি করতেন দিদিমা। প্রত্যূষে সূর্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আর সায়াহ্নে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দিনমানের সব কাজ শুরু ও পরিসমাপ্ত কোরতে হবে—এই ছিল তাঁর অমোঘ নির্দেশ। দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে বাইবেল পাঠ, প্রত্যহ খাবার-দাবারের পূর্বাহ্নে জনে জনে নিঃশব্দ মন্ত্রপাঠের রেওয়াজও ছিল এই বাড়ীতে। শুধু তাই নয়, শনিবার হোল পরম প্রভুর বিশ্রামের দিন॥ তাই এই বাড়ির কেউ সেদিন হাতে কুটোটি পর্যন্ত ছিঁড়তে পারবে না বলে তাঁর ছিল কড়া হুকুম। আমাদের আত্মার কল্যাণ কামনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বুঝি একদিন দিদিমা জানালেন, পশ্চিম হেলেনায় গেলে আমরা হয়ত এবার মাথা গুঁজবার মত একটা বাড়ি-টাড়ি যোগাড় করে নিতে পারব, ইত্যাদি—। এক জায়গা থেকে

আর এক জায়গায় যাবার আনন্দ আমার কোনকালেই মন্দ লাগত না। আমরা আবার বাঁধা-ছাঁদা করে নিতে লাগলাম। চিরাচরিত সকলের কাছ থেকে আবার বিদায় নিয়ে ট্রেণে চেপে বসলাম। পশ্চিম হেলেনায় আবার আমরা এসে পৌছলাম।

শহরের শেষ প্রান্তে একখানা বাড়ির অর্দ্ধেকটা অংশ আমরা ভাড়া নিলাম। বাড়ীখানার সামনেই ছিলো মজা একটা ডোবা। সব নর্দমার জল এসে জমা হোত সে গর্তটার মধ্যে। ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর থেকে সুরু করে ছেলে-মেয়ে, আঁধা, খোঁড়া, গণকঠাকুর, ব্যবসাদার, দালাল, বেশ্যারা সকলেই কিলবিল গিস্‌গিস করে বেড়াত বাড়ীর আশ-পাশে চারিদিক। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের দিকটায় ছিল ঘেরা দেওয়া প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। ইঞ্জিন আর রেলগাড়িগুলো সেখানে ধোয়া-মোছা কিংবা সারান হোত। স্টীমের হুস্‌হুস শব্দ লেগেই থাকত সব সময়।

ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ আর স্টিল ইঞ্জিনের তীব্র শব্দ কান দুটোকে তুলত ঝালাপালা করে। ধোঁয়ায় চারিদিক আঁধার করে ফেলত আর পোড়া কয়লার গুঁড়ো উড়ে এসে ঘরবাড়ি, বিছানা-পত্তর, রান্নাঘর, খাবার-দাবার সব কিছুই একাকার করে দিত। আলকাতরার কেমন এক বোঁটকা গন্ধ নাকে এসে লাগত নিশ্বাস নেবার সময়।

প্রকাণ্ড লোহার ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে কালা আদমীগুলো একবার ঢুকত, একবার বেরুত। আমি আর আমার ভাই খালি পায়ে আর খালি মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতাম। পাড়ার নাম-গোত্রহীন একদল নিগ্রো ছেলেও তাই দেখত আমাদের সঙ্গে জুটে। লোক-জন সব সরে পড়লে আমরা অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তাম। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাবতাম, আমরা

যেন মস্ত বড়ো হয়ে গিয়েছি। ট্রেন চালানোর কাজ পেয়ে গেছি যেন। এই বুঝি রাত হয়ে গেল! চারদিকে ঝড় উঠছে প্রচণ্ড: যাত্রী বোঝাই লম্বা এক সারী গাড়ি রয়েছে আমাদের পিছনে—যাত্রীদের নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার সব ঝক্কি বুঝি আমাদেরই!

'হু—উ—উ—উ—ই—ই—ই—!' আমরা চিৎকার করে উঠতাম হুইসিল দেয়ার।

'ঢং—ঢং—ঢং—!'

'হুস্—হুস্! হুস্– হুস্! হুস্—হুস্—হুস্!' ছুটে চলল বুঝি ট্রেন!

কিন্তু নর্দমার মধ্য দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়াটাই ছিল আমাদের সব চাইতে মজার খেলা। ভাঙ্গা শিশি-বোতল, ছেদা টিনের মধ্যে ছোট ছোট ক্রফিস্, নোংরা চামচে, লোহার টুকরো, দাঁতের পুরোন ব্রাস, মরা কুকুর-বিড়াল আর মাঝে সাঝে বা এক-আধটা পয়সা প্রায় আমরা কুড়িয়ে পেতাম সেখানে। চুরুটের বাক্স দিয়ে আমরা কাঠের নৌকা বানাতাম। রবার দিয়ে তার সঙ্গে পর পর কাঠের ছোট ছোট দাঁড় জুড়ে দিতাম। ডোবার মধ্যে নৌকাটা ছেড়ে দিয়ে দেখতাম, কেমন ভেসে যায় আপনা থেকে। অনেক দিন বিকেল বেলা পাড়ার ছেলে-পিলেদের বাবারাও এসে জুটতেন আমাদের সঙ্গে। পায়ের জুতো খুলে নিজেরাই কাঠের নৌকো তৈয়েরী করে জলে ভাসিয়ে দিতেন আমাদের মত।

মা আর মাসীমা শ্বেতাঙ্গদের বাড়ীতে রান্নার কাজ করতেন। আমি আর ছোট ভাই তখন খুশি মত ঘুরে বেড়াতাম। দুপুরে কিছু কিনে খাবার জন্য একটি করে ডাইম ওঁরা আমাদের দিয়ে যেতেন রোজ। সারাটা সকালবেলা আমরা সল্লা-পরামর্শ জল্পনা কল্পনা করতাম, ও দিয়ে কি কিনব।

বেলা দশটা এগারোটা আন্দাজ মোড়ের ইহুদীটার মুদির দোকানে এসে হাজির হতাম আমরা। পাঁচ সেণ্ট দিয়ে খালি বিস্কুট কিনতাম, এক বতল 'কোকা-কোলা'ও। দুপুরের খানা বলতে ওই বুঝতাম।

ইহুদীদের সঙ্গে ইতিপূর্বে কখনও সাক্ষাৎ ঘটেনি আমার। তাই মোড়ের মুদির দোকানের মালিকটিকে আমার কেমন যেন অদ্ভুত, অপরিচিত বলে মনে হোত। এর আগে কাউকে বিদেশী কোন ভাষায় কথা বলতেও আমি শুনি নি কোন দিন। কেমন একটা বিদঘুটে শব্দ করে ওরা যখন কথা কইত, ওৎ পেতে তা শুনবার জন্য আমি মুদির দোকানের দোরগোড়ায় ঘোরা-ফেরা করতাম। আশপাশের সব নিগ্রো কালা আদমীরাই ঘৃণা করত ইহুদীদের। ঘৃণা করতাম, ওরা আমাদের সকলকে শোষণ করছে বলে নয়—'যীশু খ্রীষ্টের হত্যাকারী' বলেই। এভাবে ঘৃণা করতে ওদের আমরা শিখেছিলাম বাড়িতে আর রবিবারের গির্জার ইস্কুলে। ইহুদীদের এমনি করে আর সকলের কাছ থেকে পৃথক করে রাখায়, আমরা ওদের ক্ষ্যাপিয়ে বেড়াতাম সব সময়।

সাত, কি আট, এমন কি বছর নয়েকের সব নিগ্রো ছেলে মেয়েরাই আমরা ইহুদীদের দোকানে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠতাম :

ইহুদী রে, ইহুদী,
খাচ্ছিস কি কড়মড়িয়ে
রাত-বিরেতে নিশুতি ?

কিংবা, আমরা ওর দোকানের সামনে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যেতাম। তারপর একবার সামনে একবার পিছনে দুলতে দুলতে ছড়া কেটে গেয়ে উঠতাম :

দুই টাকা দিয়ে পাঁচ টাকা ঘরে আসে।
ইহুদীর প্রাণ দাঁত ছরকুটে হাসে॥

কিংবা, আমরা হয়ত আবার বলে উঠতাম :

যীশু-হন্তা ইহুদী ঐ—
মুখে নিস নে নাম,
যীশু-হন্তা ইহুদীদের
অসাধ্যি কোন কাম?

লালচুলো ইহুদীদের একটা ছোকরাকে লক্ষ্য করে আমরা তো ছড়া কেটে গেয়ে উঠতাম :

লাল চুলো ওই
ইহুদী রুটি।
পাঁচ পাইতে
ইহুদী লুটি॥

আর ইহুদীদের স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকটাকে দেখে আমরা নাক সিটকে বলে উঠতাম :

লাল, শাদা নীল ছাপ,
ইহুদী তোর বাপ।
মা ছিল তো ডাইনী বুড়ি,
তুই কে রে? কোন্ পাপ?

গরীব, পেটে যাদের দুবেলা খাবার জোটে না, লেখা পড়ার বালাই নেই যাদের আমরা—সেই হতভাগ্য নিগ্রো ছেলে মেয়েরা—জাতি-বৈষম্যের বিষময় ফলে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলাম এমনি ভাবে।

টেকো মাথা দোকানদারটিকে রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যেতে দেখতাম, তার পিছু পিছু সুর কেটে আমরা টেনে টেনে গেয়ে উঠতাম :

পচা গলা ডিম যায় না ভাজা।
চোট্টা কুত্তা বুঝবে মজা॥

আমাদের ছড়া এ ছাড়াও ছিল অনেক। অনেকগুলোই তার মধ্যে বাজে। কোনটা কোনটা আবার অত্যন্ত নোংরা আর অশ্লীল। শুনলে পর যে কোন লোকের পিত্ত জ্বলে উঠে আপনা থেকে। আমরা যখন এসব করে বেড়াতাম, কেউ তখন কিছুই বলতে আসত না আমাদের। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে এ সবে আমাদের বাপ-মায়েরও সমর্থন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ইহুদীদের প্রতি আমাদের কচি মন বিষিয়ে উঠেছিল এভাবে কেমন এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাসে। এ কে কেবল জাতি-বৈষম্য বলা চলে না, এ আমাদের জন্মাগত সাংস্কৃতিক ধারারই বুঝি অঙ্গ-বিশেষ।

একদিন বিকেল বেলা আমরা গোটা কয়েক নিগ্রো ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে খেলছিলাম। হঠাৎ একসময় দেখলাম, ঢিলে পায়জামা পরা এক কালা আদমী সিঁড়ি বেয়ে এসে ঢুকল আমরা যে ঘরটায় থাকি ঠিক তার পাশের ঘরে।

'ওঃ, আজ যে শনিবার!' একটি মেয়ে সহসা বলে উঠল।

'কি হয়েছে তাতে?'

'আজ যে খুব টাকা লুটবে ওরা।'

লোকটা যে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল, সেদিকে হাত বাড়িয়ে বললে মেয়েটি।

'কি করে ?'

আর একটা লোকও গিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

'ন্যাকা, জানো না বুঝি ?'

অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠে শুধালে মেয়েটি।

'কি জানি না— ?'

'ওরা যে ব্যবসা করে গো... ?'

'কোথায় ?'

'ওই যে, লোকটা যেখানটায় ঢুকল।'

'হুঁ, ওখানে আবার লোকে ব্যবসা খুলে বসেছে !'

'কচি খোকা ! জানেন না কিছু !'

মেয়েটি এবার ফেটে পড়ল হাসিতে।

'সত্যি জানি নে। কিসের ব্যবসা বলো তো ?'

'আহা, উনি যেন জানেন না !' তেরচা করে একবার তাকিয়ে নিয়ে মেয়েটি হাসলে ছেনালি করে।

'আমি বলছি জোর গলায়, কোন ব্যবসা-ট্যাবসা কেউ করছে না ওখানে।'

'ধ্যাৎ, ন্যাকা কোথাকার !'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মেয়েটা বুঝি শূন্যে একটা চড় মারলে আমার উদ্দেশে।

আমার কেমন যেন খটকা লাগল। আমাদের পাশের বাড়িতে কি যে হয় তাও আমি জানি না ? এ বিষ্যে নিয়েই বুঝি আমি বড়াই করে বেড়াই যে পাড়ার সব খবরই আমার রয়েছে নখদর্পণে। পাশের

বাড়িতে লোকে ব্যবসা করে থাকলে, আমাকে তা জানতে হয় রীতিমত। যে ঘরে আমরা থাকি আদতে সেটা হোল ছোট একখানা একতল বাড়িরই অংশ বিশেষ। আগে বুঝি পুরো একখানা ঘরই ছিল। এখন সমান মাঝখানটায় পার্টিশন দিয়ে দুখানা ফ্ল্যাটে পরিণত করা হয়েছে। দরজা জানলা দু'বাড়ির সব এক। এখন ওগুলোকে খিল লাগিয়ে ভালো করে এঁটে তালা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর পাশের বাড়িতে যারা থাকে, তারা বেশ নিরিবিলি শান্ত-শিষ্ট লোক বলেই জানতাম। লোকজন খুব যাওয়া আসা করে বটে ওদের ওখানে, কিন্তু সৃষ্টিছাড়া অমন কোন ব্যাপার সেখানে ঘটে বলে আমার তো মনে হয়নি কখনও। তবু মেয়েটার ওই তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ ইঙ্গিতে আমাদের পাশের বাড়ির দরজার আড়ালে কি ঘটছে তা জানবার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। বাড়িতে ঢুকে দরজার খিলটা এঁটে দিলাম। দু ফ্ল্যাটের মধ্যিখানের সরু দেয়ালটায় কান পেতে তারপর শুনতে লাগলাম। ফিসফাস দু-একটা মৃদু শব্দ কানে এসে পৌঁছল মাত্র। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। দরজাটার উপর আমি কান পেতে রইলাম। শব্দটা এবার অধিকতর স্পষ্ট হোল। কিন্তু ব্যাপারটা তবু বোঝা গেল না কিছু।

একখানা চেয়ার নিঃশব্দে আমি টেনে আনলাম। চেয়ারটার উপর একটা বাক্স রেখে দাঁড়িয়ে দরজার উপর দিককার ছোট একটা ফুটো দিয়ে দেখতে লাগলাম উঁকি মেরে। প্রাচীরের অপর প্রান্তে প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে দেখতে পেলাম, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র স্ত্রী-পুরুষের দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি উৎসঙ্গের উপর উৎসঙ্গ রেখে একান্ত নিবিড় আলিঙ্গনে পড়ে আছে এক শয্যায়! আমি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝের উপর। এভাবে চুপ করে পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভয় হোল একবার, পাছে যদি ওরা শুনতে পায় ওঘর থেকে। কিন্তু নিঃশব্দ,

সব চুপচাপ ; কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। অদম্য ঔৎসুক্য আমায় আবার পেয়ে বসল। দেখবার জন্য আমি যেই চেয়ারের উপর আবার উঠতে গেছি, ঠিক তখন পিছনের জানলার উপর ঠক্‌ঠক করে এক আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি আমি মুখ ফিরালাম। দেখলাম পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বাড়িওয়ালী। আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগল। ঝুপ করে আমি নেমে পড়লাম নীচে। জানলার সার্শির উপর বাড়িওয়ালীর কালো মুখখানা বসে গেল যেন খাঁজ কেটে। ঠোঁটদুটি তার বিড়বিড় করে কাঁপতে লাগল। চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুতে লাগল আগুন। ঘরের মধ্যে থাকতে আমার ভয় করতে লাগল। বাইরে যেতেও সাহস হোল না। মনে করে সার্শিগুলো বন্ধ করে দিলেই পারতাম। বাড়িওয়ালীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক রকম কিছু একটা যেন আমি করে ফেলেছি। জানলা থেকে সরে গেল ওর মুখটা। কিন্তু পর মুহূর্তেই সদর দরজাটা আঁতকে উঠল থরথর করে।

'এই ছোকরা, দরজা খোল!' আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু কোন সাড়া দিলাম না।

'এই শিগ্‌গীর খোল, নইলে দরজা আমি ভেঙে ফেলব!'

'মা তো বাড়ি নেই', আমি জবাব দিলাম।

'বাড়ি এটা আমারই, দরজা খোল বলছি শিগ্‌গীর!' চিৎকার করে উঠল বাড়িওয়ালী।

আমি কেমন ঘাবড়ে গেলাম চিৎকার শুনে। দরজাটা খুলে দিলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকে বাড়িওয়ালী থমকে দাঁড়াল। ফুটো দিয়ে দেখবার জন্য যা কিছু জড় করেছিলাম তাকিয়ে রইল সে ওসবের দিকে। দরজাটা খুলবার পূর্বে ওসব সরিয়ে ফেললাম না কেনো?

'বলি এসব হচ্ছে কি ?'

বাড়িওয়ালী প্রশ্ন করলে। কোন জবাব জোগাল না আমার মুখে। সে আবার বললে :

'আমার খদ্দের সব তুই ভাগিয়ে দিলি !'

'খদ্দের !' ক্যাবলার মত আমি আউড়ে গেলাম।

'নচ্ছার ছোকরা কোথাকার !' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল সে।—'ঠ্যাঙিয়ে আজ তোর আমি ভূত ছাড়াবো !'

'হুঁ, ভূত ছড়াবেন না আর কিছু !'

'তোদের সবাইকে আমি তাড়াব এখান থেকে !' বাড়িওয়ালী গজ গজ করতে লাগল।—'এ করেই আমায় চারটি খেতে হয়। নচ্ছার ছোঁড়াটা এসে আমার অমন শনিবারটা আজ মাটি করে দিলে !'

'আমি—আমি তো খালি একটু দেখছিলাম...'। আমি থতিয়ে উঠলাম।

'দেখছিলাম... ?' বাড়িওয়ালী এবার হেসে ফেল্‌লে ফিক করে। 'কপাল আমার ! দেখছিলাম কি গা ? তা সিকি ডলারটক্ খরচা করে একবারটি এসো না কেনো ? মজা লুটে যাও না কেনো ওদের মত ?'

'দূর, ওই তো তোমার ভাঙ্গা ঘর ! আমি যেতে চাই ওখানে।' ন' বছরের এক ছেলে তার পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণার থলেটা বুঝি উজার করে দিল জবাবে।

'চুলোয় যা তা হোলে !' আমি যে তার একজন খদ্দের হতে পারিনে এটা ভেবেই বুঝি সে উত্তর দিলে।—'তবে এখান থেকে তোদের আমি তাড়াবই তাড়াব !'

রাত্রিবেলা মা আর মাসীমা যখন বাড়ী ফিরলেন, বাড়িওয়ালীর

সঙ্গে তাঁদের তখন শুরু হল তুমুল গলাবাজি। সামনের বারান্দার কাঠের রেলিংটাকে মধ্যিখানে রেখে পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশে সে কি চিৎকার! সে বুঝি আট মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে কান পেতে থাকলে। পাড়া-পড়শিরা সবাই ছুটে এল। ছেলেমেয়েরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল হাঁ করে। ঝগড়াটা শেষে একটা খাঁদে নেমে এলো। বাড়িওয়ালী বারবার জেদ করতে লাগল, মা যেন আমায় আজ শাস্তি দেন এর জন্য। মা কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না।

'বাড়ির মধ্যে ওসব কম্ম তুমি করতে যাও কেনো?'

'এখানা আমার বাড়ি। আমি আমার বাড়িতে যা খুশি তাই করবো, তাতে তুমি না করবার কে?' বাড়িওয়ালী জবাব দিলে।

'ওসব কাজ-কারকার তুমি করো জানলে কখ্‌খনো আমরা এ বাড়ি ভাড়া নিতাম না।'

'মুখ সামলে কথা বলিস্, হা-ঘরে বজ্জাৎ মাগী কোথাকার!' চিৎকার করে উঠল বাড়িওয়ালী।

'অমনতর জঘন্য কাজ তুমি বসে বসে করবে এখানে, ছেলেদের আর দোষ দিই কি?' মা প্রশ্ন করলেন।

'তোদের ওই জারজ ছোঁড়া দুটো সগ্গের কোন দেবদূতটা শুনি?'

'রাস্তার বেবুশ্যেদের চাইতেও এ যে বাড়া দেখছি!' মাসীমা ফোড়ন কাটলেন মাঝখান থেকে।

'মাগী, তুই বা কোন সতী এয়েচিস রে!' সমানে চিৎকার করে উঠল বাড়িওয়ালী।

'খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো কিন্তু। ওসব কথা মুখে এনো না বলছি আমার বোনের নামে!' মা ওকে সাবধান করে দিলেন।

'না, আনবে না! যা দূর হ—দূর হ, এক্ষুনি দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে জিনিষ-পত্তর নিয়ে। কালা হাঘরের মাগী কোথাকার!' বাড়িওয়ালী আদেশ করল।

সে রাত্রিতেই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা উঠে এলাম ও রাস্তারই নিকটবর্তী আর একটা বাড়িতে। বাড়িওয়ালী কিসের ব্যবসা করত তার একটা অস্পষ্ট ধারনা ছাড়া আমি বিশেষ কিছু আর জানতাম না। পরে অবশ্য পাড়ার ছেলেরা কি যেন নাম একটা তার বলেছিল। সবাই ওটাকে সাংঘাতিক রকমের খারাপ কাজ বলে মনে করলেও আমার ঔৎসুক্য কিন্তু রয়েই গেল। এ নিবিড় রহস্যের সম্পূর্ণ অর্থোদ্ধার আমায় একদিন করতেই হবে।

আমাদের বাড়ীতেও কিছু যেন চলছিল গোপনে। আমি যখন জানতে পারলাম, ঘটনাটা তখন অনেক দূর গড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা ঘুম আসার পূর্বে তন্দ্রার ঝোঁকে প্রায় শুনতে পেতাম, ম্যাগী মাসীর ঘরের জানলায় কে যেন এসে মৃদু করাঘাত করল। পরমুহূর্তেই দরজাটা যেন খুলে গেল খ্যাঁচ করে আঁতকে উঠে। ফিসফিস করে একটু কথা—তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চুপ এক নীরবতা। আমি একদিন বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। হামাগুড়ি দিয়ে বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে লুকিয়ে দেখলাম : ফিটফাট পোষাকপরা কৃষ্ণাঙ্গ এক ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন আর ম্যাগীমাসীর সঙ্গে গল্প করচ্ছেন চাপা মৃদু গলায়। সে কি? ভদ্রলোককে আগে যে কখনও দেখিনি। হামাগুড়ি মেরে আমি আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমটা আবার ভেঙ্গে গেল। শুনতে পেলাম, কে যেন কার নিকট বিদায় চাইলেন, অস্পষ্ট চাপা গলায়। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল

রাত্রিতে কে এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। মা জানালেন কেউ নয়।

'বাঃ, আমি যে শুনলাম মা, উনি কথা কইছেন।'

'না, শোন নি,' মা জবাব দিলেন। 'তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।'

'কিন্তু আমি যে সব দেখলাম স্বচক্ষে! ভদ্রলোক বসেছিলেন বাইরের ঘরে।'

'তুই স্বপ্ন দেখেছিস তাই,' মা বললেন।

রাত্রির সেই গোপন দেখা-সাক্ষাতের খবর রবিবার এক সকাল বেলা আমি অবশ্য কিছুটা পেলাম। আমাকে আর আমার ভাইকে ম্যাগীমাসী তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন সেদিনকার সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে। বললেন, উনি নাকি শীগ্গীর আমাদের নতুন মেসোমশাই হতে যাচ্ছেন। নাম তাঁর অধ্যাপক ম্যাথুস্। জামার কলারটা তাঁর বরফের মত শাদা আর খাড়া। চোখে রিমলেশ চশমা। ঠোঁট দুটি বেশ পাতলা। আর চোখের পাতা দুটি অচল, অনড়। কেমন দূর-দূর—নির্জীব, নিঃসঙ্গ, নির্লীপ্ত বলে আমার মনে হোল তাঁকে। তিনি যখন আমায় কাছে ডাকলেন, আমি গেলাম না। এই অবিশ্বাসের লেশটুকু ধরতে পেরেই বুঝি উপঢৌকন দিয়ে তিনি আমায় জয় করতে চাইলেন। একটি 'ডাইম' গুঁজে দিলেন আমার হাতে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে আমরা দু'জন 'পিতৃহীন হতভাগা অনাথ মানব-আত্মার' জন্য তিনি বুঝি প্রার্থনা করলেন। অধ্যাপক ম্যাথুস্ আর মাসী নাকি শীগ্গীর উত্তর অঞ্চলে চলে যাবেন। কথাটা শুনে আমার খুব দুঃখ হোল। কেন না ম্যাগী মাসী ছিলেন আমার কাছে ঠিক মা-র মতনই।

নতুন 'মেসোমশাই'টির সঙ্গে দেখা হোল না আর কোন দিন। তবে তিনি যে রোজ রাত্রিতে আসতেন তার প্রমাণ সকাল বেলা উঠেই পাওয়া

যেত। ভাই আর আমার দু'জনর কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেল। নতুন মেসোমশাই-র হাল-চাল সব নিয়ে আমরা মাথা ঘামিয়ে মরতে লাগলাম। সব সময় রাত করে কেন তিনি আসেন? কেনই বা অমন চুপি চুপি চাপা গলায় কথা বলে থাকেন? নীল রঙের অমন স্যুট আর ধবধবে ফরসা জামার কলার সব কিনবার মত অত পয়সাও বা তিনি পান কোথায়? কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম, মা যখন একদিন আমাদের ডেকে নিয়ে সাবধান করে বললেন, নতুন 'মেসোমশাই' যে আমাদের এখানে আসেন তা যেন আমরা বাইরের কারো কাছে বলে না বেড়াই। মেসোমশাইকে নাকি তল্লাশী করে বেড়াচ্ছে লোকে।

'কোন লোকে মা?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'শ্বেতাঙ্গ লোকেরা।' মা জবাব দিলেন।

আমি শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গদের ভীতি অলক্ষ্যে কেমন করে আমায় আবার পেয়ে বসল। শুধালাম: 'ওরা করবে কি ওঁকে নিয়ে?'

'তার জন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' মা জবাব দিলেন।

'তিনি কি করেছেন?'

'চুপ করে থাক নইলে শ্বেতাঙ্গ লোকেরা তোকেও ধরে নেবে।'

নতুন মেসোমশাইকে নিয়ে শংকিত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। মা বুঝি এটা লক্ষ্য করে ম্যাগী মাসীকে বলে রেখেছিলেন, মাঝে-মাঝে আমাদের হাতে কিছু একটা তুলে দিয়ে আমাদের মুখ যেন বন্ধ করে রাখেন নতুন মেসোমশাই। আস্থা আমাদের যেন পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। তাই বুঝি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠেই দেখতাম, খ্রীস্ট-মাস উৎসবের মত বাড়ীতে যেন মহা সমারোহ পড়ে গেছে। হুট করে বিছানা থেকে নেমে পড়েই আমরা রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতাম।

দেখতাম, নতুন মেসোমশাই আজ আমাদের জন্ত নতুন কি খাবার রেখে গেলেন টেবিলের উপর। একদিন সকালবেলা এসে দেখলাম, লম্বা পশমের মত লোমওয়ালা ছোট্ট একটা মাদী কুকুর তিনি এনেছেন আমার জন্ত। মাদী কুকুরটার আমি নাম রেখেছিলাম বেট্সী। ছুদিনেই ওটা আমার ভয়ানক পোষা আর সাথী হয়ে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, 'মেসোমশাই' এবার থেকে দিনের বেলাতে আসতে শুরু করে দিলেন আমাদের বাড়িতে। কিন্তু তিনি বাড়িতে ঢুকলেই ঘরের সব দরজা আর জানালার শার্সিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি চলে না যান ততক্ষণ পর্যন্ত চোকাটের বাইরে কোথাও এক পা বাড়ান আমাদের ছিল নিষেধ। শিক্ষিত, কৃষ্ণকায়, নীরব-নিঃশব্দ নতুন মেসোমশাইটি সম্বন্ধে হাজারে হাজারে নানান প্রশ্ন করে আমি শুধাতাম মাকে। কিন্তু সব সময় তিনি বলতেন:

'ও সব তুই এখন বুঝবি নে। চুপ করে এখন বাইরে গিয়ে খেল্‌গে যা!'

একদিন রাত্রিবেলা চাপা কান্নার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের ঘরের দিকে আমি এগিয়ে গেলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, জানালার পাশে মেঝের উপর বসে আছেন 'মেসোমশাই' আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে। ছোট একটা ট্রাঙ্কের উপর ঝুঁকে পড়ে মা কি যেন গুছিয়ে দিচ্ছেন ক্ষিপ্রহস্তে। ভয় আর আশংকায় বুকটা আমার দুর দুর করে উঠল। মা কি চলে যাচ্ছেন? ম্যাগী মাসী কাঁদছেনই বা কেনো? শ্বেতাঙ্গরা কি সত্যিসত্যি তাড়া করে আসছে আমাদের?

'চটপট নাও।' মেসোমশাই বলে উঠলেন সহসা।—'এখান থেকে এক্ষুণি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'তোদের আজ না গেলে নয়, ম্যাগি?' মা জিগগেস করলেন।

'এখন আর না করবেন না।' মেসোমশাই জবাব দিলেন। রাস্তার জমাট নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে রইলেন তখনও।

'কিন্তু কাণ্ডটা কি করে এসেছ শুনি?' ম্যাগী মাসী জিগগেস করলেন।

'সে পরে শুনবে অখন,' 'মোসোমেশাই' জবাব দিলেন। 'ওরা এসে পড়বার আগে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে!'

'তুমি নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক অঘটন ঘটিয়ে এসেছ,' ম্যাগী মাসী আবার বললেন।—'নইলে অমন করে পালিয়ে বেড়াতে না কখখনো।'

'বাড়িটা এখনও জ্বলছে।' মেসোমশাই একটু থতিয়ে বললেন।—'আগুনটা যখন দেখতে পাবে ওরা তখন ধরে নেবে কীর্তিটা কার।'

'সে কি, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে এসেছেন?' মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না', 'মেসোমশাই' জবাব দিলেন নিষ্প্রভ কণ্ঠে। গলায় তাঁর অসহিষ্ণুতার ঝাঁঝ।—'টাকাটা নিয়ে স্ত্রীলোকটাকে এক ঘা মেরে বসেছিলাম। ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এলে ও তখন সব বলে দিতো। তা হোলেই আমার সর্বনাশ! আগুনটা তাই লাগিয়ে দিতে হোল।'

'কিন্তু ও যে পুড়ে যাবে।' দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফোঁপিয়ে উঠলেন ম্যাগী মাসী।

'এ ছাড়া উপায় কি?' 'মেসোমশাই' শুধালেন। 'এ করতেই হোত!

অমন করে আমি ছেড়ে আসতে পারি না। সবাই তা হোলে বুঝে নিতো, এখন কেউ তা জানতে পারবে না একবারও।'

ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। হচ্ছে কি এসব? শ্বেতাঙ্গরা কি আমাদের সকলের পিছু নিয়েছে? মা কি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন?

'মা গো!' আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। ছুটে ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে।

'মেসোমশাই' উঠে দাঁড়ালেন তড়াক করে। হাতের মুঠির মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটি তাক করে বাগিয়ে ধরলেন আমার দিকে। ফ্যালফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে। মনে হোতে লাগল, এই মুহূর্তেই বুঝি আমার অসাড় নিস্পন্দ দেহটা লুটিয়ে পড়বে ধুলিতে।

'রিচার্ড্!' মা চাপা তীব্র গলায় ডেকে উঠলেন।

'চলে যাচ্ছো বুঝি তোমরা?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

মা আমার কাছে ছুটে এলেন। হাতের তালু দিয়ে মুখখানা আমার চেপে ধরলেন।

'আমাদের সবাইকে তুই চাস নাকি মেরে ফেলতে?' মা আমায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

আমি চুপ করে রইলাম।

'যা, শুয়ে পড়গে!'

'না, তা হ'লে তুমি চলে যাবে?'

'না, আমি যাচ্ছি না।'

'ওই তো তোমার ট্রাঙ্ক দেখছি! তোমরা সবাই চলে যাচ্ছো আমায় ফেলে।' আমি আবার কেঁদে উঠলাম।

'গোলমাল করিস নে, চুপ কর!' মা এবার ধমকিয়ে উঠলেন। 'এখন যা, শুয়ে পড়গে বিছানায়।'

মা আমায় বিছানায় আবার শুয়িয়ে রাখলেন। আমি কিন্তু জেগে রইলাম। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম : ফিস্-ফিস্ করে সবাই কথা কইছে ওঘরে, হাঁটছে, খ্যাঁচ করে ঘরের দরজাটা বুঝি এবার খুলে গেল অন্ধকারে। ম্যাগী মাসী বুঝি কাঁদছেন ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে। বাড়ির বাইরে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি বুঝি এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। মেঝের উপর দিয়ে কোন ভারী ট্রাঙ্ক টেনে আনার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজও এসে পৌঁছল কানে। ম্যাগী মাসী এবার আমাদের ঘরে এলেন। নিঃশব্দে কাঁদলে { কছুক্ষণ। তারপর আমায় চুমু খেয়ে বিদায় চেয়ে নিলেন ফিস্‌ফিস্ করে। ভাই তখনও ঘুমুচ্ছিল। মাসীমা ওকেও চুমু খেলেন। তিনি তারপর বেরিয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

পরদিন সকালবেলা মা আমায় রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। গত রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কোন কথা না বলতে বারবার সাবধান করে দিলেন। বললেন, শ্বেতাঙ্গ লোকেরা শুনতে পেলে আমার আর রক্ষে থাকবে না। আমায় তখুনি মেরে ফেলবে।

'কি শুনলে মা?' জিগগেস না করে আমি পারলাম না।

'না, ও সব কথা আর ভাবতে নেই,' মা জবাব দিলেন।—'কাল রাত্রির কথা সব ভুলে যা।'

'কিন্তু 'মেসোমশাই' কি করেছেন মা?'

'না, আমি বলতে পারব না।'

'উনি ঠিক কাউকে খুন করেছেন।' আন্দাজে আমি বলে উঠলাম সাহস করে।

'এ কথা কেউ শুনলে পর তোমার আর রক্ষে থাকবে না কিন্তু!' মা আবার সাবধান করে দিলেন।

বেশ, তাই হবে। ও কথা আমি আর কখনও বলব না। দিন কয়েক পরে একদিন লম্বামত এক শ্বেতাঙ্গ এলো আমাদের বাড়িতে। বুকের উপর তার বসান আছে জ্বলজ্বলে একটি তারা আর কোমরের কাছে এক রিভলবার। অনেকক্ষণ ধরে মার সঙ্গে ও কি যেন বলাবলি করলে। মার এ কথাটাই কেবল শুনতে পেলাম :

'কি বলছেন আপনি ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ তো, যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, একবার তল্লাসি করেই দেখুন না বাড়িটা।'

শ্বেতাঙ্গটি আমার আর ভাইয়ের দিকে একবার তাকালে চোখ তুলে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে না আমাদের। কি করেছেন 'মেসোমশাই' মাসের পর মাস ধরে আমি তাই অবাক হয়ে ভাবতাম। কিন্তু জীবনে ব্যাপারটা আমার আর জানা হয়ে উঠল না।

ম্যাগী মাসী চলে যাবার পর থেকে মা একা একা আমাদের খাওয়া-পরা সবকিছু জুটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। ফলে অনেক দিন আমার উপোস করে থাকতে হোতো। প্রায় সারা দিন মাথাটা ধরে থাকত আমার। ক্ষুধার চোটে একদিন বিকাল বেলা এত মরিয়া হয়ে উঠলাম যে বেটসীটাকে বিক্রি করে এসে কিছু খাবার কিনে আনব বলে ঠিক করলাম। কুকুরটাকে বগলদাবা করে জীবনে এই প্রথম আমি একা একা পাড়ার শ্বেতাঙ্গ এক ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলো সব শ্বেতাঙ্গদের! রাস্তাগুলোও তেমনি চওড়া আর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বেল্‌ টিপে টিপে প্রত্যেক বাড়ির দরজায় আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ তো মুখের উপরই আমার দরজাটা বন্ধ করে দিল ধড়াম কোরে। কেউ কেউ বা বলল, সামনের দরজায় না গিয়ে পিছনের খিড়কির দরজায় যেতে। আত্মমর্যাদায় আমার

কেমন যেন ঘা লাগল। যেতে পারলাম না। অবশেষে এক বাড়িতে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে হেসে এগিয়ে এল দরজার কাছে। শুধালে :

'কি চাই তোমার ?'

'কুকুর চাই নাকি ? ভারি সুন্দর কুকুর !'

'কই দেখি ?'

মেয়েটি কুকুরটাকে কোলে নিলে। আদর করলে। চুমু খেলে।

'কি নাম এর ?'

'বেটসী !'

'বাঃ রে, তো বেশ কুকুরটি ! দাম নেবে কত ?'

'এক ডলার।'

'আচ্ছা দাঁড়াও,' মেয়েটি জবাব দিলে, '—দেখি এক ডলার হবে কি না।'

বেটসীকে কোলে নিয়ে মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। গাড়ি-বারান্দায় বসে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শ্বেতাঙ্গ পাড়ার চারদিকে কেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর চুপচাপ প্রশান্ত নীরবতা ! দেখে আমি কেমন অবাক হয়ে গেলাম। সব কিছুই এখানে সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থিত ! তবু আমি কিন্তু রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলাম। এক মুহূর্তও এখানে আর থাকতে ইচ্ছে হোল না। আমার সহসা মনে পড়ল বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে রাত্রিবেলা যারা নিগ্রোদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, এসব বাড়ি বুঝি তাদেরই। কথাটা মনে পড়তেই ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। বদ কোন কালা আদমী ভেবে আমায় মেরে ফেলবে না তো এখানে কেউ ? অতক্ষণ করছে কি মেয়েটি ? কালা আদমীদের এক ছোকরা ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করে গেছে বলে পাড়ার সবাইকে ও বলে বেড়াচ্ছে না তো ?

কে জানে, হয়ত লোক জোড়ো করছে তাই। এক মুহূর্ত কাল আমার আর এখানে বসে থাকা উচিত না। বেটসীর কথা ভুলে যাওয়াই ভালো, বাপু! উৎকণ্ঠা আমার বেড়ে চল্‌ল উত্তরোত্তর। ক্ষুধার কথা একরূপ ভুলেই গেলাম। পরিচিত কালা আদমীদের নিরাপদ পক্ষপুটে ছুটে পালিয়ে যেতে আমার ইচ্ছে হোল।

হুট্ করে দরজাটা এবার খুলে গেল। মৃদু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল মেয়েটি। দুহাতে তখনও বেটসীকে সে চেপে ধরেছে তার বুকের ওপর। চোখ তুলে তবুও আমি তাকাতে পারলাম না। জমাট বাঁধা ভয় ল্যাপটে রয়েছে যেন আমার দুচোখে।

'কুকুরটাকে আমার বেশ ভালো লেগে গেছে,' বল্লে মেয়েটি। 'এটা আমি কিনছি। পুরো এক ডলার কিন্তু হোল না। এই নাও তোমার সাতান্নব্বুই সেণ্ট।'

কুকুরটাকে আমি যে শ্বেতাঙ্গদের কাছে বিক্রী করতে চাই না, আমায় তা বুঝি আর মুখ খুলে বলতে হোল না।

'না', আমি আমতা আমতা বলে উঠলাম।—'আমার কিন্তু পুরো এক ডলার চাই।'

'কিন্তু এখন তো পুরো এক ডলার ঘরে নেই।'

'তা হোলে কুকুরটা আমি বিক্রী করতে পারব না।'

'রাত্রিবেলা মা বাড়ি ফিরলে বাকি তিন সেণ্ট তোমায় তখন আমি দিয়ে দেবো।'

'না'। কঠিন মেঝের উপর স্থির দৃষ্টি হেনে আমি উত্তর দিলাম।

'কিন্তু এক ডলার এর দাম বললে না তুমি?'

'হ্যাঁ, এক ডলারই বলেছিলাম!' বেটসীকে তখনও তেমনি বুকে জড়িয়ে ধরে এক মুঠি খুচরো সেণ্ট এগিয়ে দিল মেয়েটি। বললে:

'এই যে তোমার সাতানব্বুই সেণ্ট !'

'না', প্রবল মাথা নেড়ে আমি বলে উঠলাম।—'এক ডলারই আমার কিন্তু চাই।'

'বাকি তিন সেণ্ট পরে দেবো'খন !'

'কিন্তু মা যে আমায় বলে দিয়েছেন এক ডলারের কমে বিক্রী না করতে।' অনুপস্থিত মায়ের স্কন্ধে আমার নাছোড়বন্দা স্বভাবের সবটা দোষ চাপিয়ে দিলাম।

'এক ডলারই তো তোমার হোলো। রাত্রিবেলা বাকি তিন সেণ্ট নিয়ে যেয়ো।'

'না !'

'তাহোলে কুকুরটা এখন থাক, রাত্রিবেলাই এস।'

'না।'

'পুরো এক ডলার নিয়ে তুমি থামাকা করবে কি ?'

'আমি খাবার কিনবো।'

'বেশ তো, সাতানব্বুই সেণ্ট দিয়ে তুমি তো এক কাড়ি খাবার কিনতে পারো।'

'না-না। আমার কুকুর আমায় দিয়ে দেন।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। মুখ তার লাল হয়ে উঠল।

'এই নে তোর কুকুর।' বেটসীকে ও একরূপ ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে।—'যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে ! তোর মত অমনটি নাছোড়-বান্দা বাতুল কালা আদমী জীবনে আমি কখনো আর দেখিনি।'

বেটসীকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি বাড়ি ঢুকে পড়লাম। বেটসীকে বিক্রি করতে হয়নি বলে আমার খুব আনন্দ হোল। কিন্তু পরমুহূর্তেই

শুরু হোল আবার ক্ষিধের যন্ত্রণা। পয়সাটা নিলেই পারতাম। না, এখন আর তা হয় না। বেটসীকে কোলে করে আমি বসে রইলাম। রাত্রিবেলা মা যখন বাড়ি ফিরলেন, ঘটনাটা সব তাঁকে বললাম। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

'পয়সাটা নিলি না!'

'না মা।'

'কেনো রে?'

'কেনো জানি না।' অস্বচ্ছন্দতার ঝাঁঝ গলায়।

'সাতানব্বুই সেণ্ট যে পুরো একটা ডলারের প্রায় সমান, তা বুঝি জানিস নে?' মা প্রশ্ন করলেন।

'জানি মা।' হাতের করে গুণতে গুণতে আমি জবাব দিলাম—'এই তো আটানব্বুই, নিরানব্বুই, এক শ'। বেটসীকে ওদের কাছে বিক্রি করতে আমার ইচ্ছে হোল না মা।'

'কেনো রে?'

'ওরা যে শ্বেতাঙ্গ।'

'আচ্ছা বোকা তো তুই!'

কয়লা বোঝাই একটা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মারা গেল বেটসী সপ্তা খানেক পরে। গলা ছড়িয়ে আমি তখন কান্না জুড়ে দিলাম। তারপর বাড়ির পিছনের উঠানে কবর দিয়ে এলাম ওটাকে। কবরটার মাথার দিকটায় একটা চোঙা পুঁতে দিলাম। তাই দেখে মা টিপ্পনী কেটে বললেন :

'অমন ডলারটা পায়ে ঠেলে এলি। বসে বসে এবার কুকুর মড়াই খাবি নাকি?'

আমি কোন জবাব দিলাম না।

দিবারাত্রি কি ঘরে কি বাইরে, কি ভিজা কি ধূলিধূসরিত রাজপথে সর্বত্র যাদুকরের মায়াকাটির কুহক-মন্ত্র যেন অনুচ্চারিত হতে লাগল আমার চারিদিকে!

কোন ঘোড়ার লেজের এক গাছা কেশ আমি যদি ছিঁড়ে নিতে পারি—আর সেটাকে যদি আমার এক হাঁড়ি প্রস্রাবের মধ্যে ডুবিয়ে মুখ এঁটে রাখতে পারি, তা হোলে রাতারাতি বুঝি ওই লোম গাছাটা সাপে হয়ে যাবে পরিণত!

কালো পরিচ্ছদ-পরা ক্যাথলিক কোন ধর্মযাযিকা কি মঠাধ্যক্ষার পাশ কেটে যাবার সময় আমি যদি হেসে ফেলি আর উনি যদি দেখে ফেলেন আমার দাত দুপাটি, তা হোলে বুঝি মৃত্যু আমার নির্ঘাৎ!

কোথাও ঠ্যাস-লাগান কোন মই-এর নীচ দিয়ে আমি যদি হেঁটে যাই, তাহোলে দিনটা আমার নিশ্চয় মন্দই যাবে।

নিজের কুনুই-এ আমি যদি একবার চুমু খাই, তা হোলে আমি বুঝি ঠিক তখনই মেয়ে বনে যাব!

ডান কানটা আমার যদি চুলকাতে থাকে, তা হোলে বুঝতে হবে কেউ আমার খুব সুখ্যাতি করছে!

কোন কুঁজোর কুঁজটা একবারটি যদি হাত দিয়ে ছুঁতে পারি অসুখ-বিসুখ আমার আর হবে না বুঝি কোন কালে!

লোহার রেললাইনের উপর একটা স্ট্যাপটি পিন আমি যদি রেখে আসি আর একখানা রেলগাড়ি যদি চলে যায় তার উপর দিয়ে, স্ট্যাপটি-পিনটি তাহোলে বুঝি নতুন আনকোরা একজোড়া চকচকে কাঁচি হয়ে যাবে।

আশপাশে কেউ নেই, তবু যদি কারো গলার আওয়াজ শোনা যায় তাহোলে ঠিক বুঝে নিতে হবে ঈশ্বর কি শয়তান কথা কইতে চাইছেন আমার সঙ্গে!

যখনই প্রস্রাব করি না কেন তার উপর থুথু ছিটিয়ে দেয়া উচিত সৌভাগ্যের জন্য !

নাক চুলকোতে থাকলে ধরে নিতে হবে কেউ বুঝি আসছেন আমাদের বাড়িতে !

কোন খোঁড়াকে উপহাস করলে ঈশ্বর বুঝি আমাকেও খোঁড়া বানিয়ে দেবেন !

মিছিমিছি শুধু ভগবানের নামে কিরা কাটলে, গলা টিপে তিনি বুঝি আমায় মেরে ফেলবেন !

রোদ আর বৃষ্টি যখন লুকোচুরি খেলতে থাকে একসাথে তখনই ধরে নিতে হবে শয়তান ঠ্যাঙাচ্ছে তার গিন্নীকে ধরে !

কোন বিশেষ রাত্রিতে আকাশের মিটমিটে তারাগুলো যখন অধিকতর প্রদীপ্ত হয়ে উঠে তখন বুঝি স্বর্গের দেবদূতেরা বিহ্বল হয়ে যায় আনন্দের বন্যায় ; স্বর্গের প্রাঙ্গণে শুরু করে দেয় বুঝি লাফালাফি—দাপাদাপি ! আকাশের সেই তারাগুলো বুঝি স্বর্গের গায়ের অসংখ্য বাতায়ন। দেবদূতেরা হুটোপুটি করে নেচে বেড়াবার সময় দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে বাতায়নের ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ দিয়ে।

আমি যদি কোন আয়না ভেঙে ফেলি, সাত বছর আমার তা হোলে যাবে অমঙ্গলে।

মায়ের কথামত কাজ-কর্ম যদি করি, আমি শিগগির বড় আর ধনী হয়ে উঠব !

কখন যদি শর্দি হয় আর ছেঁড়া, ময়লা একটা মোজা গলায় বেঁধে আমি যদি ঘুমোই, পরদিন সকালবেলাই শর্দিটা আমার ঠিক সেরে যাবে !

কবচের মধ্যে পুরে এক টুকরো হিঙ্‌ গাছের শিকড় আমি যদি

গলায় ঝুলিয়ে রাখি, তাহলে অসুখ-বিসুখ আমার আর কখনও হবে না!

ঈষ্টারের কোন এক রবিবার সকালবেলা আমি যদি একটুকরো কালি-মাখা আয়না নিয়ে সূর্যের দিকে তাকাই, তাহোলে ঠিক দেখতে পাবো উষসী কোন দেবতার উদ্দেশে সূর্যদেব যেন উদাত্ত কণ্ঠে বন্দনা-গান গাইছেন!

মৃত্যুশয্যায় কেউ যদি কোন কথা স্বীকার করে গিয়ে থাকে, সত্য বলেই তাকে কিন্তু মেনে নিতে হবে। কেননা, মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ কি আর মিথ্যা বলতে পারে?

বপনের পূর্বে বীজধানের উপর যদি তুমি একবার থুথু ছিটিয়ে দিতে পার, দেখবে ফসল কেমন বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—কেমন সোনা ফলে যায় মাঠে!

খানিকটা নুন যদি ছিটকে পড়ে যায় হাত থেকে—আর সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি বাঁ ঘাড়টায় চিমটি কেটে না বসি, দুর্ভোগের কবল থেকে আমার বুঝি রক্ষে মিলবে না!

ঝড়ের সময় আমি যদি একখানা আয়না ঢেকে রাখতে পারি, তাহলে বাজ পড়বে না আমার মাথায় আর!

মেঝের উপর-পড়ে-থাকা কোন ঝাড়ুগাছাকে আমি যদি ডিঙিয়ে যাই, আমায় কি দুর্দৈবেই না পড়তে হবে!

ঘুমের ঘোরে আমি যদি কোথাও বেরিয়ে পড়ি, তাহোলে বুঝতে হবে ভগবানই মহৎ কোন কর্ম আমায় দিয়ে সমাধান করিয়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন!

অসাধ্য বলে কোন জিনিসই নেই সংসারে। সব কিছুই সম্ভব, হয়ত-হতেও-পারে এবং চেষ্টা করলে হয়ও। আমি চাই, প্রত্যেকটা জিনিসই

সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠুক! কেননা, বাইরের এই জড়জগতে তেমন বেশী-কিছু করবার মত আমার কোন শক্তি নেই। সেই ক্ষমতাও নেই। তাই সে অভাব আমি পূরণ করে নি অন্তরে অন্তরে। কেন না আমি জানি, আমার পারিপার্শ্বিক জীবনের আবহাওয়ার প্রতি অণু পরমাণু কি উলঙ্গ, কি উদাস, কি নিস্পৃহ আর নিরানন্দময়! সম্ভাবনার অসীম অবদানে তাকে ভরিয়ে তুলি আমি তাই কানায় কানায়। প্রায়শ্চিত্ত করে নিই আমার ক্ষুধিত, তৃষিত অন্তরের ব্যাকুলতার অস্পষ্ট মায়া-মুকুরে!

শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিজাতীয় এক আতঙ্ক আমার প্রতিটি অনুভূতি আর কল্পনায় এবার থেকে কায়েমীভাবে বাসা বেঁধে রইল। মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছিল। সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে জাতি-বৈষম্য তাই আবার মাথা গজিয়ে উঠল। তেমন কোন ব্যাপক সংঘর্ষের সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় তখনও ঘটেনি। ঘটলে বুঝি আমি অমন করে অভিভূত হয়ে পড়তাম না। যুদ্ধটা আগাগোড়া আমার কাছে কেমন যেন অস্পষ্ট অবাস্তব ঝাপসাই রয়ে গেল। কিন্তু শাদা আর কালা আদমীদের জাতিমূলক সংঘর্ষের প্রতিটি আকার-ইঙ্গিতে, খবরাখবরে, কথা-বার্তায়, গুজব আর খোস-গল্পে আমি সাড়া দিতাম মহা আগ্রহ সহকারে। কিই বা আমার তখন বয়েস? কিই বা অমন ব্যক্তিত্ব? তবু শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে আমার অন্তরে যে ঘৃণা আর বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল কেউ তাকে রোধ করতে পারল না। কোথায় কোন শ্বেতাঙ্গিনী কোন নিগ্রো স্ত্রীলোককে চড়-চাপড় মারল, কোথায় কোন্ শ্বেতাঙ্গ কোন নিগ্রোকে মেরে খুন করে ফেলল—এসব যখন প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তা শুনতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। আমি তখন শিউরে উঠতাম। ভয়ার্ত-বিহ্বল হয়ে পড়তাম। শুধাতাম নিজেকে নিজে হাজার হাজার প্রশ্ন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা এমন একটা ঘটনার কথা শুনলাম যার পর থেকে রাত্রিতে ঘুম গেল আমার উবে। ব্যাপারটা এক নিগ্রো স্ত্রীলোককে নিয়ে। স্ত্রীলোকটির স্বামীটাকে নাকি একদল শ্বেতাঙ্গ তাড়িয়ে নিয়ে এসে খুন করে। প্রকাশ, স্ত্রীলোকটি নাকি স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য হয়ে উঠে বদ্ধপরিকর। একটা ছররা-বন্দুককে একখানা কাপড়ে মুড়ে নিয়ে ও নাকি তখন এগিয়ে যায় শ্বেতাঙ্গদের কাছে। স্বামীর শবটা নিয়ে গিয়ে কবর দেয়ার জন্যে সে নাকি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। স্বামীর মৃতদেহের পাশে যাবার অনুমতি সে পেল অবশেষে। সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগল নীরবে। স্ত্রীলোকটি তখন করলে কি, শবের পাশে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করবার ভাণ করে চাদরখানা থেকে বন্দুকটা নিল বার করে। তারপর চক্ষের নিমিষে ব্যাপারটা সবিশেষ টের পাবার পূর্বেই শ্বেতাঙ্গদের চারজনকে একেবারে ঘায়েল করে ফেলল দু'হাঁটুর ফাঁক দিয়ে গুলি ছুঁড়ে।

ঘটনাটা কতখানি সত্যি জানি না অবশ্য। আবেগের মাথায় তবু তাকে সত্য বলেই আমি মেনে নিয়েছিলাম। কেন না এর মধ্যেই আমি ভাবতে শিখে ফেলেছি : আশপাশে আমার এমন সব লোক কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় যাদের নিকট আমি নিতান্ত তুচ্ছ, অসহায়। ইচ্ছে করলেই ওরা বুঝি টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারে আমায়। দল বেঁধে যদি শ্বেতাঙ্গরা কোনদিন আমার পিছু নেয়, আমিও তা হোলে সে স্ত্রী-লোকটির অনুকরণ করব বলে সংকল্প করলাম মনে মনে। আমিও অমন কোরে লুকিয়ে রাখব কোন অস্ত্র। আপন কোন দয়িতের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায় অত্যাচারে খুব অভিভূত হয়ে পড়েছি বলে ভাণ করে থাকব আমিও। তারপর ওরা যখন ভাববে ওদের নির্মম নিষ্ঠুর নৃশংসতাকে আমি মেনে নিয়েছি জীবনের অমোঘ বিধান বলে, আমি তখন আমার

প্রচ্ছন্ন বন্দুকটা বাগিয়ে নিয়ে যত-অধিক-সংখ্যক-সম্ভব শ্বেতাঙ্গ নিধন করে নিজে তারপর প্রাণ দেব। আত্মরক্ষামূলক অসংলগ্ন এ সকল চিন্তা এতদিন বুঝি ঘুমিয়ে ছিল আমার বুকে। আজ তারা যেন ভাষা পেল—দেখা দিল সশরীরী মূর্তি ধরে। নিগ্রো স্ত্রীলোকটির সেই প্রতারণার কাহিনী প্রবুদ্ধ করে তুলল আমায়।

স্বতস্ফূর্ত এই উদ্ভট কল্প-শিশুগুলো অবশ্য মনে মনেই আমার ঘুমিয়ে থাকত। বাস্তব কোন রূপ ওরা কোনদিন পায় নি। পাছে আমার স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবে পরিণত হয়ে পড়ে এই ভয়ে আমি সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম। কেন না, এক দঙ্গ শ্বেতাঙ্গ আজ যদি আমায় তাড়া করে আসে তা হোলে তাদের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশু কোন উপায়ই আমার ছিল না জানা। অভেদ্য এক নৈতিক প্রাচীর যেন আমার সেই উদ্ভট চিন্তাগুলি। তাদেরই পক্ষছায়ায় আমি আমার উদ্দাম আবেগের পরিপূর্ণতা রেখেছিলাম অক্ষুন্ন—ভয় আর আতংকের মুখে অবলম্বন খুঁজে ছিলাম খুঁড়িয়ে চলা আমার ব্যক্তিত্বের ধারা উজ্জীবিত করে রাখবার। ওরা হোল যেন তারই প্রতীক!

শ্বেতাঙ্গদের প্রতি আমার এই মনোভাবকে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। এ বুঝি আমার আবেগময় জীবন ধারারই অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ। কৃষ্টি বলো, সংস্কৃতি বলো—আমার জীবনেরই এক ধর্ম! আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরায়—চিন্তা আর অনুভূতির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিজাতীয় এই ক্রোধ উপ্ত হয়ে রইল গভীর হয়ে। আমার দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শিক আবহাওয়ার কথা বুঝি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। শ্বেতাঙ্গদের যে সকল খবর আমার কানে এসে পৌঁছত তার সঙ্গে সমান তাল রেখে তাদের প্রতি আমার প্রতিকূল মনোভাব বেড়ে উঠত, কমে যেত আপনা থেকে। শ্বেতাঙ্গদের নাম

শুনলেই আমি সহসা আতংকিত হয়ে উঠতাম। সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে যেতাম। মনে হোত যেন অশরীরী কোন প্রতিকূল শক্তি কোথা থেকে অলক্ষ্যে এসে টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে আমার বারে বারে। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে আমার জীবনে কোন গাল-মন্দ কোনদিন শুনতে হয়নি। তবুও ওদের কথা মনে হলেই আমার তখন মনে হোত, হাজার হাজার 'লিন্‌চিং'-এর ঝড় যেন বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে!

ইস্কুলে গিয়ে আমি যখন আবার ভর্তি হলাম, নিয়মিত পড়া-শুনা আবার যখন আরম্ভ করলাম, তার পূর্বে দীর্ঘ অনির্দিষ্ট কাল আমার কেটে গেছে পশ্চিম হেলেনায়। সৌভাগ্যক্রমে একটা চাকরী মা তখন পেয়ে গেলেন শ্বেতাঙ্গ এক ডাক্তারের আফিসে। পাঁচ ডলার করে সপ্তা পিছু মাইনে, যা কখন ভাবাই যায় নি। চাকরীটা পেয়ে মা বলে উঠলেন: 'খোকারা আবার ইস্কুলে যাবে গো এবার থেকে।' আমিও নেচে উঠলাম খুশীতে। আমি ছিলাম ভয়ানক লাজুক ছেলে। হাঁপিয়ে পড়তাম ভিড়ের মধ্যে। প্রথম দিন নতুন ইস্কুলে গিয়ে তাই হাসির খোরাক যুগিয়ে বসলাম সকলের। বোর্ডে গিয়ে নাম-ধাম আমায় লিখে আসতে বলা হয়েছিল। আমার নাম-ধাম সবই আমি ঠিকঠাক জানতাম। বানান করে লিখতেও পারতাম। কিন্তু ক্লাশের এক গাদা ছেলে-মেয়ের উৎসুক চাহনির নীচে আমার সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল। বোর্ডে গিয়ে এক পোংক্তিও আমি লিখতে পারলাম না।

'নামটা তোমার লেখ তো দেখি', শিক্ষয়িত্রী আমায় বললেন।

শাদা চক্ দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে আমি লিখতে গেলাম। কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করে উঠতে পারলাম না। প্রথম অক্ষরটাও না। কেমন

ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল মনটা। চাপা হাসির রোল উঠল বুঝি পিছন থেকে। আমি কাঠ হয়ে গেলাম।

'আমাদের কথা সব ভুলে যাও! নিজের নাম আর ঠিকানাটা আগে লিখে ফেলো,' শিক্ষয়িত্রীর মিষ্টি গলা আবার শোনা গেল।

লিখবার জন্য মনটা আমার চন্‌চন করে উঠল। কিন্তু হাতখানা কিছুতেই নাড়তে পারলাম না। দাঁত বার করে ছেলে-মেয়েরা আবার বুঝি হেসে উঠল। চোখ-মুখ আমার উঠল আরক্ত হয়ে।

'নাম কি জান না?' শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করলেন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম তাঁর দিকে। কিন্তু কোন জবাব দিতে পারলাম না মুখ ফুটে। চেয়ার ছেড়ে উনি তখন এগিয়ে এলেন আমার কাছে। ভরসা দেবার জন্য একটুখানি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে। হাতখানি রাখলেন আমার কাঁধের উপর আলগোচে।

'নাম কি তোমার?'

'রিচার্ড।' ফিসফিস করে আমি জবাব দিলাম।

'রিচার্ড কি?'

'রিচার্ড রাইট।'

'কেমন বানান করো দেখি!'

লজ্জার বাঁধ দু'হাতে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। ক্ষিপ্র এক নিশ্বাসে আমি আমার গোটা নামটা বলে ফেললাম বানান করে।

'বা রে, আস্তে আস্তে বলো যাতে আমি বুঝতে পারি?'

আমি তাই করলাম।

'আচ্ছা, এবার লিখতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হোলে লেখো তো দেখি।'

ব্ল্যাক্‌বোর্ডের দিকে আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম লিখবার জন্য। কিন্তু ভিতরটা আমার কেমন যেন ফাঁকা, শূন্য, রিক্ত হয়ে উঠল। বোধশক্তিটা আমার ফিরে পেতে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণান্ত। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলাম না। পিছনে ছেলে-মেয়েদের কথা মনে হতেই আমার সব কিছু আবার ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। আমি যে কিছু পেরে উঠছি না, নিজেই আমি তা টের পেলাম। দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম। উত্তপ্ত কপোলটা কখন ঢলে পড়ল ঠাণ্ডা ব্ল্যাক-বোর্ডের উপর। গোটা ক্লাশ আবার খিলখিল করে ফেটে পড়ল দীর্ঘ প্রলম্বিত হাসিতে। ঠাণ্ডা শিথিল হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ।

'হ্যাঁ হয়েছে, যাও জায়গায় গিয়ে বসো গে।' শিক্ষয়িত্রী বলে উঠলেন।

নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে নিজেকে নিজে আমি তখন ধিক্কার দিতে লাগলাম। শুধাতে লাগলাম, ভিড়ের মধ্যে কিছু একটা করতে গেলে কেন সব সময় অমন বোকাটা বনে যাই? ক্লাশের আর পাঁচটা ছাত্রের মত আমিও তো লিখতে জানি। ওদের চাইতে ভালো যে পড়তে পারব তাতে কোন সন্দেহই নেই। যেটুকু জানি তা অনর্গল বলে যেতে পারি। মনের কথা গুছিয়ে পারি বেশ বলতেও। তাই যদি হয়, তবে অপরিচিত কাউকে দেখলে অমন ঘাবড়ে যাই কেন? ঘাড় গুঁজে পাথরের মত হয়ে বসে রইলাম। কান দুটো যেন জ্বলতে লাগল। শুনতে লাগলাম, আশপাশের ছেলেরা কানাঘুষো করছে আমাকে নিয়ে। নিজের উপর নিজে আমি তখন রেগে উঠলাম। ওদের উপরও। আবেগের প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগল আমার বুকে মধ্যে তোলপাড় করে।

ক্লাশে একদিন বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ চারদিক থেকে বেজে উঠল বাঁশী আর ঘণ্টা ঢং ঢং করে। মুখর কোলাহল চারদিকের সবকিছু

ছাপিয়ে বেড়ে চলল ক্রমশ। মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল ক্লাশের মধ্যে। ছেলেমেয়েরা সব ভিড় করে ছুটল জানলার কাছে। শিক্ষয়িত্রী নিজেও ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন: 'তোমাদের ছুটি হয়ে গেছে! বই পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি যাও সবাই।'

'কেনো?'

'কি হয়েছে?'

'শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ', তিনি জবাব দিলেন।

আর সব ছেলে-মেয়েদের পিছু পিছু আমি রাস্তা ধরে চললাম। আশে পাশে দু ধারেই দেখলাম শাদা আর কালা আদমীরা সবাই হাসছে, গান গাইছে, হাঁকাহাঁকি করছে। শ্বেতাঙ্গদের ভিড় ঠেলে মহা ভয়ে ভয়ে আমি এগিয়ে চললাম রাস্তা দিয়ে। আমাদের পাড়ায় পৌঁছে যখন কালা আদমীদের মুখেও হাসির রেখা দেখতে পেলাম, আমার ভয় তখন অনেকটা কেটে গেল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। যুদ্ধ কি, এবং যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়—বুঝবার আমি তা চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে কি যেন লক্ষ্য করছে আকাশের গায়ে। মুখ তুলে আমিও তাকালাম। দেখলাম, ছোট একটা পাখীর মতো কি যেন একটা সাঁতার কেটে যাচ্ছে আকাশের বুক চিরে।

'ওই দ্যাখ!'

'এরোপ্ল্যান!'

ইতিপূর্বে আমি কখনও এরোপ্ল্যান দেখিনি। বললাম:

'দূর, ওটা তো একটা পাখী।'

চারদিকের জনতা হেসে উঠল ফিক্ করে।

'না খোকা, ও হোলো এরোপ্ল্যান।' এক ভদ্রলোক জানালেন।

'ওটা একটা পাখী,' আমি জবাব দিলাম, 'তাইতো দেখছি।'

'মানুষ উড়ছে আকাশে তুমি তাই দেখছো, খোকা।' লোকটি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঠিক পাখীর মত এখনও মনে হতে লাগল আমার এরোপ্ল্যানটাকে। মানুষও উড়তে পারে পাখীর মতো কথাটা মা আমায় বুঝিয়ে দিলেন রাত্রিতে বাড়ি ফিরে।

বড়দিন এসে পড়ল। একটা নেবু মাত্র উপহার জুটল আমার বরাতে। মুখ ভার করে আমি তাই বসে রইলাম। পাড়ার আর সব ছেলে মেয়েরা কেউ বা তখন শিঙে বাজাচ্ছে ফুঁ দিয়ে, কেউ বা তখন ছুঁড়ে মারছে পটকা। ওদের সঙ্গে খেলতে গেলাম না কিছুতেই আমি বাইরে। সারাদিন নেবুটা হাতে হাতে করে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর যখন রাত্রি হোল শোবার ঠিক আগে নেবুটা আমি খেয়ে নিলাম। কোঁয়ার মাথার দিকটা দাঁত দিয়ে কেটে নিলাম তারপর রসটা চুসে নিতে লাগলাম গেলে গেলে। অবশেষে ছাড়ান খোসাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মুখে ফেলে চিবোতে লাগলাম আমি আস্তে আস্তে।

তিন

বয়সে আর মাথায় অনেকখানি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ছেলেদের দলে আমি এবার গিয়ে নাম লিখালাম। অবশ্য দক্ষিণাটাও আমায় নেহাৎ কম দিতে হোল না। জাতিমূলক ভাবাবেগে জারিত হয়ে উঠলাম আমিও। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি আমার মনোভাব, ওদের বিরুদ্ধে কতখানি ঘৃণা আর বিদ্বেষ পোষণ করা যায় এবং জাত নিয়ে কতখানি লাফালাফি আর দাপাদাপি করতে পারি আমিও—তারই কষ্টিপাথরে রাখীবন্ধন হোল আমাদের এই সৌভ্রাত্রের। আগে থেকে আমরা কিছুই ভেবে-চিন্তে নিতাম না। ঝোঁকের মাথায় সবই করে বসতাম। চৌরাস্তার মোড়ে সকলে জড়ো হয়ে কথায় কথায় বলে ফেলতাম আপনা থেকে। মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করা এখন আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। তাই ওদের কোন পাত্তাই দিতাম না আমাদের কথাবার্তায়। যেন জীবনের দূর কোন উপান্তে ফেলে এসেছি ওদের অপরিচিত এক দ্বীপে। আমরা যে ব্যাটা ছেলে এবং আমাদেরও যে নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে তার সন্ধান যেন পেয়ে গেলাম কি করে। নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সচরাচর আমরা সবাই জোট পাকিয়ে চলাফেরা

করতাম। ভাঙা কাঁসার মত আওয়াজ করে কথাবার্তা বলতাম বুক চিতিয়ে। 'নিগার' বা কালা আদমী শব্দটা প্রায়ই লেগে থাকত মুখে। প্রচুর খিস্তি-খেউড়ও করে বেড়াতাম বয়ঃপ্রাপ্তীর খতিয়ান হিসেবে। বাপ-মায়ের আদেশ ও অনুজ্ঞার প্রতি তাচ্ছল্য আর অবজ্ঞার করতাম ভাণ। নিজেদের মর্জি-মাফিক খেয়াল-খুশীতে আমরা সবাই চলা-ফেরা করে থাকি, এটা অপরকে সমঝিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকতাম সব সময়। আমরা যে কতখানি পরের উপর নির্ভরশীল তা গোপন করবার প্রাণান্ত চেষ্টা করতাম।

বিকালবেলা ইস্কুল যখন ছুটি হোত, রাস্তা দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমি তখন বাড়ী ফিরতাম। কোন খালি টিন রাস্তায় পড়ে থাকলে লাথি মেরে অকারণ গড়িয়ে দিতাম ওটাকে। কাঠের বেড়াটার উপর ঠক্‌ঠক শব্দ করতাম কাঠি দিয়ে। কিংবা শিস কাটতে কাটতে হয়ত দলের অপর ছেলেদের সঙ্গে মিশে যেতাম। রাস্তার মোড়ে কিংবা কোন মাঠে অথবা কারো কোন বাড়ীর রোয়াকে বসে বসে ওরা তখন জটলা পাকাত।

'হে-ই!' ভীরু ক্ষীণ কণ্ঠ।

'এখনো খাচ্ছিস কি রে।' কথা পাড়বার অনিচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা বুঝি।

'সত্যি ভাই, খাওয়াটা আজ প্রচুর হয়েছে!' ভিড়ের মধ্যে ঢিল ছোঁড়ো।

'বাঁধাকফি আর আলু দিয়ে আমিও যা খেয়েছি!' আত্মপ্রত্যয়।

'ঘোল আর কালো-জাম এত্ত খাওয়া হোল আজ বাড়ীতে—।' নিষ্প্রাণ নিস্পৃহ কণ্ঠ।

'দূর দূর! আমি আর তোর পাশ ঘেঁস্‌ছিনে, নিগার!' সদম্ভ ঘোষণা।

'কেনো রে?' কপট অজ্ঞতা।

'দেখিস বাতকম্ম করে ও এক্ষুনি যা করে তুলবে চারদিক!' সরব অভিযোগ।

হাসির প্রচণ্ড রোল উঠল ভিড়ের মধ্যে।

'নিগার, আচ্ছা তুই ছোটলোক তো!' কোন নীতিবাগিশ বলে উঠল বুঝি তামাসা করে।

'ছোটলোক কিনা তখন দেখে লিস্! ও নিগারটা এবার থেকে যা বোমা ফাটাবে রে মিনিটে মিনিটে!'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ! কালোজামটা যখন ঘোলের মধ্যে গিয়ে পড়বে, দেখে লিস তখন। রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে যাবে রে তোর পেটের মধ্যে। ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে এই অতখানি। ভট্‌ভট্‌ করে বায়ু বেরুবে!' ক্লাইমেক্স-এ চাপল কথটা।

দীর্ঘ প্রলম্বিত হাসির মুখর রোল উঠল আবার।

'আর শ্বেতাঙ্গরা তোকে ধরে তখন পাঠিয়ে দেবে চিড়িয়াখানায়। রেখে দেবে আর বারের যুদ্ধের জন্য!' নতুন খাদ নিল আলোচনাটা।

'তারপর লড়াই যেই শুরু হবে, ওরা তখন খেতে দেবে তোকে ঘোল আর কালোজাম। তা খেয়ে লিয়ে শালা যত খুশী তুই বাতকম্ম করনা,' সমর্থন পেয়ে বেড়ে চলল আলোচনার ধারা।

'নতুন একটা বিষাক্ত গ্যাস বার করে লড়াইটা তুই জিতেও নিতে পারিস।' জোর গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

হাসির কলরোল মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

'বিষাক্ত গ্যাসটা একবারটি পেলে মন্দ হোত না রে!' শ্বেতাঙ্গদের কথা এসে পড়ল বুঝি কথা প্রসঙ্গে।

'ঠিক বলেছিস ভাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটা একবারটি শুরু হয়ে

যাক না এখানটায়, তখন দেখে লিস সবকটা শালা শ্বেতাঙ্গ বাচ্চাকে মেরে ভূত বানিয়ে দেবো বিষাক্ত গ্যাসটা ছুঁড়ে!' তিক্ত অহঙ্কার।

খিল খিল করে সবাই হেসে উঠল খুশীতে। তারপরে আবার চুপচাপ। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল কিছু শুনবার প্রতীক্ষায়।

'তা হোলে দেখে লিস্ শালারা আমাদের কি ভয়টাই না করে!' পুরোন প্রসঙ্গের খেই ধরে চলল বিজ্ঞ মন্তব্য।

'হ্যাঁ; শালারা তোকে চালান দিয়ে দিলে লড়াই-এ, গা চাঁট্তে লেলিয়ে দিলে তোকে জার্মানদের বিরুদ্ধে—শেখালে কি করে লড়াই করতে হয়। যুদ্ধ জিতে এখন ফিরেছিস কিনা, শালাদের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে থাকতে হবে সব সময়—সাবাড় করে দিতে চাইছে তোকে জানে একদম।' অর্দ্ধেকটা-বড়াই-করা আর অর্দ্ধেকটা-অনুযোগের সুর গলায়।

'আমার মা সেদিন কি বলছিল জানিস? শ্বেতাঙ্গিণী যে বুড়ী মাগীটার বাড়ীতে মা কাজ করে, একদিন নাকি ও মাগীটা চড় মারতে উঠলে মাকে। মা তখন বললে: মিৰ্ গ্রীন, আমার গায়ে তুমি যদি হাত তুলতে আস, তাহোলে আমিও ঠিক দেখে নেবো। তোমায় খুন করে তবে প্রায়শ্চিত্ত করব নরককুণ্ডে গিয়ে।'

'দূর, আমি হলে তো ওকে মেরেই ফেলতাম ওকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।' ক্রুদ্ধ আস্ফালন।

চুপচাপ নিস্তব্ধ কিছুক্ষণ।

'জানিস ভাই, শাদা আদমীগুলো সত্যি কি ছোটলোক?' অভিযোগ শোনা গেল।

'তাই তো রে তোর দলে দলে কালা আদমীরা চলে যাচ্ছে দক্ষিণের এই মুল্লুক ছেড়ে।' খবর যোগাল কে যেন!

'তাই তো ভাই, শালারা দুচক্ষে দেখতে পায় না আমাদের চলে যাওয়াটা।' ব্যক্তিগত আর জাতিমূলক রঙ চড়ানো গর্বিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ রে, যদ্দিন না তোর মরণ না হচ্ছে, তদ্দিন তোকে এখানটায় বেঁধে রাখতে চায় শালারা।'

'ও শালা শাদা কুত্তির বাচ্চাদের কেউ আমার পিছু নিলে, মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দেবো আমি শালাদের।' কপট বিদ্রোহ।

'দুর, তাতে কিছু হবে না। শালারা তোকে নির্ঘাৎ ধরে ফেলবে।' কপট বিদ্রোহের সুর বাতিল হয়ে গেল।

'হে-হে-হে...শালারা তোকে নির্ঘাৎ ধরে ফেলবে রে!'

শ্বেতাঙ্গদের সুষ্ঠু সামরিক নৈপুণ্যের প্রশস্তি।

'হ্যাঁ, ও বেটারা যা খুশী তাই করতে পারে দিন আর রাত্রির। কিন্তু কালা আদমীরা কিছু একটা করতে যাক্ না, যে ডালকুত্তাটা মায়ের পেট থেকে এখনো মাটীতে পড়েনি তাকে শুদ্ধ লেলিয়ে দেবে শালারা তোমার পেছনে।'

'কি রে, ভাবছিস নাকি শালারা কোন কালে বদলাবে বলে?' আশায় ভীরু জিজ্ঞাসা।

'দুর, কক্ষনো না। শালারা জন্ম থেকেই অমনটা।'

'দেখে নিস্ ভাই, আমি একটু বড়ো হয়ে উঠি না উত্তর মুল্লুকে ঠিক চলে যাবো।'

'উত্তরে এসবের কোন বালাই নেই কিন্তু।' পালান সমর্থিত হোল।

'ওখানে শুনছিলাম, একবার এক শ্বেতাঙ্গ লোক নাকি এক কালা আদমীকে মেরে বসেছিল খামকা। কালা আদমীটা তখন পালটে এমন মারটা মারলে যে, লোকটা মরেই গেল। কেউ কিছু ওর করলে না!'

'দাঁতের বদলে দাঁত তোলার চলন হোল ওখানে।' ন্যায়বিচারে আস্থাবান করে তুলবার অনুনয়।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দ নীরবতা।

'হ্যাঁ রে, উত্তর মুল্লুকের ঘরবাড়ি সব যতখানি উঁচু বলে বেড়ায় ব্যাটারা, তুই তা বিশ্বেস করিস নাকি ?'

'ওরা তো বলে, নিউ ইয়র্ক শহরে একখানা বাড়ি নাকি চল্লিশ তলা সমান উঁচু !' অবিশ্বাস্য উক্তি।

'বলিস কি রে ভাই, শুনে তো পিলেই আমার চমকে উঠছে।' ধামা-চাপা পড়া তখনকার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা ছাড়তে বুঝি প্রস্তুতি।

'হ্যাঁ রে, শাঁ শাঁ করে যখন ঝড় বইতে থাকে, ওসব বাড়িগুলো নাকি তখন দুলতে থাকে এদিক-ওদিক।' অলৌকিক ঘটনা কিছু যেন বলা হোল।

'না রে, নিগার !' বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে নামাঙ্কুর হোল কথাটা।

'হ্যাঁ রে, সবাই বলে ওরা !'

'ওদের কথা তুই বিশ্বেস করিস নাকি ?'

'দুর, তা করবো কেনো ? বাতাসে যদি সত্যি সত্যি একখানা বাড়ি এদিক-ওদিক দুলতে থাকে, সেটা তাহোলে পড়ে যাবে না ভেঙে ? ওসব কথা শুনে বোকা বলিসনে লোকের কাছে।'

আবার চুপচাপ নীরবতা। এক টুকুরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কে যেন ছুঁড়ে মারলে মাঠের মাঝখান দিয়ে।

'আচ্ছা বল তো দেখি, শ্বেতাঙ্গগুলো অমন ছোটলোকটা হয় কি করে ?' পুরোন প্রসঙ্গের জের টেনে চলল আবার।

'শালাদের দেখলেই অমনি মুখে থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে।' শ্বেতাঙ্গ-দের প্রতি অবজ্ঞায় উছলে পড়ল।

'শালারা খুব নোংরা না?' তাচ্ছল্য আর অবজ্ঞার উচ্ছাস বেড়ে উঠল আরও।

'হ্যাঁ রে, তুই গা চেটে এসেছিস নাকি শ্বেতাঙ্গদের?'

'শালারা তো বলে আমাদের গায়েই যত সব দুর্গন্ধ। কিন্তু মা কি বলে জানিস? শ্বেতাঙ্গদের গায়ে নাকি মরা মানুষের গন্ধ!' মনে মনে কামনা করা হোল শত্রুর মৃত্যু।

'ঘামলে পর একটু-আধটু যা গন্ধ বেরোয় কালা আদমীদের গা থেকে। শ্বেতাঙ্গদের গায়ে কিন্তু গন্ধ লেগেই থাকে সব সময়।' যেন কোন একটা পশু—দেখলেই অমনি সাবাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়—এমনই ভাব।

শৈশবের উচ্ছল উদ্দাম আবেগ মুখর জীবনের বিভিন্ন কূল ছাপিয়ে বয়ে চলে দিক-বিদিক লক্ষ্যহীন। অর্থ, ভগবান, জাত, বর্ণ-সমস্যা নর-নারীর যৌন ব্যাপার; যুদ্ধ, বিমান, যন্ত্র, রেলগাড়ি; সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ খেলাধুলো—সব কিছু নিয়েই কথাবার্তার খেই আমাদের এগিয়ে চলত, গড়িয়ে চলত, ফুলে উঠত, ফ্যাসে যেত, মোড় নিত অন্যদিকে। এক নিগ্রো পরিবার থেকে এভাবে অপর পরিবারে সঞ্চারিত হয়ে পড়ত সাংস্কৃতিক ধারা; ব্যাপক হয়ে পড়ত একদল থেকে অপর দলে। এমনি করেই আমাদের হাব ভাব আর ভাবধারা ভাষা পেত, রূপায়িত হোত, সংশোধিত হয়ে উঠত। আমরা তাদের গড়ে নিতাম, বর্জন করতাম, সংযোজিত করতাম, গ্রহণ করতাম। তারপর রাত্রির কালো যবনিকা নেমে আসত ধীরে ধীরে। বাদুরেরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উড়ে বেড়াত সাঁতার কেটে। ঘাসের নীচ থেকে ডেকে উঠত ঝিঁঝিঁ পোকারা। গলা ফুলিয়ে বেঙ্ ডেকে উঠত ঐক্য তানে। মিটমিটে তারা দেখা দিত আকাশের গায়ে। শিশির পড়ে পড়ে সিক্ত হয়ে উঠত মাটী। বাড়ির কেরোসিনের পিদ্দিমের মত দূরের

পার্কের ধূসর আলোগুলো জ্বলে ওঠে মিটমিট করে। মাঠের ওপার থেকে অথবা রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে পরিশেষে দূরাগত অস্পষ্ট একটানা চীৎকার :

'ও-রে-ে-ে-ে-ে, ডে-ে-ে-ে-ে ভি-ই-ই-ই—!'

ফিক্ করে হেসে ফেলে ছেলের দল। কিন্তু সাড়া দেয় না কেউ।

'শুয়োরদের ডাকছে রে !'

'শুয়োর ছানা সব এবার বাড়ি যাবি নে ?'

হাসির রোল উঠে আবার। দল থেকে একটি ছোকরা এবার কেটে পড়ে ধীরে ধীরে।

'ও—রে-ে-ে-ে, ডে-ে-ে-ে—ভি-ই-ই-ই—!'

মা-র ডাকে এবারও সাড়া দেয় না ছোকরাটী। সাড়া দিলে বুঝি অধীনতা প্রকাশ হয়ে পড়ে সকলের সামনে।

ধীর মন্থর গতিতে পা ফেলে বাড়ি ফেরে ছোকরাদের দল। হাসির চাপা গুঞ্জন ওঠে ভিড়ের মধ্য থেকে। ছাড়া ছাড়া কথা-বার্তাও ভেসে আসে। বাড়ি ফিরে সবাইকে একে একে পিছনের উঠানের কল থেকে নিয়ে আসতে হয় জল। ছুটতে হয় দোকানে। কিনে আনতে হয় শাক-সব্জি। কালকের জন্য খাবার-দাবার। চিরাতে হয় কাঠ।

রবিবারের দিন কাপড়-চোপড় সব আমাদের পরিষ্কার কাচা কাটা থাকলে আমাকে আর আমার ভাইকে মা নিয়ে যেতেন রবিবারের উপাসনা মন্দিরে। যেতে আমরাও কোন আপত্তি করতাম না। কেন না, গীর্জায় গিয়ে ভগবান কি তাঁর অপার মহিমার কাহিনী শ্রবণের চাইতে ওখানে আমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ আর সমানে তাদের সঙ্গে বসে গল্প করাটাই ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষণ। বাইবেলের অনেক গল্পও ছিল বেশ মজার মজার। আমরা কিন্তু আমাদের

জীবনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতাম তাদের। সম্পূর্ণ বিকৃত করে তুলতাম মূল তাৎপর্য থেকে একেবারে। ভালো ভালো উপাসনা-সংগীতের বেলায়ও আমরা তাই করতাম। যাজক ঠাকুর যখন সুর করে গেয়ে উঠতেন :

আহা, আহা, মরি মরি, কিবা কান্তি,
কিবা রূপ, কণ্ঠ সুমধুর !

পরস্পর পরস্পরের দিকে চোখ টিপে এক নিশ্বাসে আমরা তখন আউড়ে যেতাম বিড় বিড় করে :

ডাল কুকুরে তাড়া করে দিদিমারে
স্থাথ্‌রে চেয়ে বহু দূর ॥

শ্বেতাঙ্গ ছোকরাদের ভয় করে চলার মত অত ছোটটি আমরা আর নই তখন। আবহমান কাল থেকে শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের মধ্যে জাতি-বৈষম্যের যে চিরানুচরিত স্রোত বয়ে চলেছে প্রতি ধমনীতে ধমনীতে, মিশে আছে যা তাদের রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুতে, ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা তাদের অস্থি-মজ্জায় আর প্রবৃত্তির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে—এবার থেকে উভয়েই আমরা অবতীর্ণ হয়ে পড়লাম সেই ভূমিকায়।

পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে ভীতিপূর্ণ যে সব কাহিনী শুনতাম, তাতেই আমরা মেতে যেতাম। উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তাম রীতিমত প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিদ্বেষে।

কারখানার সেই ঘেরা বাড়িটাই ছিল আমাদের মধ্যখানের স্থানীয় জাতিমূলক সীমানা। শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা এলে আমরা ওদের ঢিল ছুঁড়ে মারতাম। ওদের পাড়ায় আমরা গেলে ওরাও আমাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে ঢিল—আমরা সবাই জানতাম।

আমাদের এসব মারামারি প্রায়ই সাংঘাতিক ও মারাত্মক বাস্তব রূপ

নিত। ইঁট পাথর, চাক চাক জ্বলন্ত কয়লা, লাঠি, লোহার টুকরো, ভাঙা শিশি-বোতল—হাতের কাছে যা পেতাম তাই আমরা ছুঁড়ে মারতাম। তবু আমাদের তৃপ্তি হোত না। আরও সাংঘাতিক রকমের আয়ুধের জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠতাম। মারামারি করতে গিয়ে আহত হলেও মুখ বুঁজে থাকতাম আমরা সবাই। কাঁদতাম না। একটুও মুখ ভার করতাম না।

চোটটা সত্যি সত্যি খুব সাংঘাতিক রকমের না হলে বাপ মায়ের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতাম। নইলে মারামারি করেছি বলে ওঁদের কাছ থেকেই আবার মার খেতে হোত। শ্বেতাঙ্গ একদল ছোকরার সঙ্গে এমনি এক মারামারিতে একবার একটা ভাঙা বোতল এসে লাগল আমার কানের ঠিক নীচখানটায়। আঘাতটা অনেকখানি গভীরই বুঝি হয়েছিল। বিস্তর রক্ত ঝরতে লাগল ওখান থেকে। একটুকরো নেকড়া কাটা ঘাটার উপর চেপে ধরে রক্ত নিবারণ করতে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু রক্তের স্রোত বন্ধ হোল না কিছুতেই। কাজ থেকে মা যখন বাড়ি ফিরলেন, তাঁকে অবশেষে বলতেই হোল ব্যাপারটা। মা আমাকে তৎক্ষণাৎ এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। কাটা ঘা-টা তিনি সেলাই করে দিলেন। ডাক্তারখানা থেকে যখন বাড়ি ফিরলাম, মা তখন আমায় মেরে শাস্তি দিলেন খুব করে। বললেন, শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের সঙ্গে আমি যেন আর কখনও মারামারি না করি। ওরা তা হোলে আমায় মেরে খুন করে ফেলবে। সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে এসে আবার ঝগড়া-ঝাঁটির এই ঝামেলা বইবার মত সময় তাঁর নেই—ইত্যাদি। মার কথায় আমি বিশেষ গা করলাম না। কেন না, রাস্তায় আমাদের দলের চাল-চলনের সঙ্গে খাপ খায়না এসব। আর কখনও মারামারি করব না বলে মার

কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হল। কিন্তু আমি জানতাম, এভাবে প্রতিজ্ঞা করলে দলে আমার প্রতিপত্তি সব যাবে নষ্ট হয়ে। একঘরে হয়ে থাকতে হবে আমাকে। বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে দলের মূল প্রাণতন্ত্রী থেকে।

মা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাজ কর্ম তিনি আর করে উঠতে পারতেন না। আমি তাই পাড়ায় ঠিকা এক কাজ নিলাম। কাজটি হোল কারখানার শ্রমিকদের জন্য বাড়ী থেকে দুপুর বেলা খাবার আনা। এজন্য সপ্তা-পিছু ২৫ সেণ্ট করে আমি পেতাম। ওদের খাবার দাবারের পর পাতে কিছু উৎচ্ছৃষ্ট পড়ে থাকলে আমি তা কুড়িয়ে নিতাম। এর কিছু দিন পরে ছোট এক কফি-খানায় আর একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কফিখানার প্রকাণ্ড উনানটার জন্য আমায় কাঠ জোগাতে হোত। পাশের রেল ইস্টিশানটায় গাড়ি এসে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করত। যাত্রীদের জন্য আমায় তখন খাবারও নিয়ে যেতে হোত ট্রে-তে করে সাজিয়ে। এর জন্য সপ্তাপিছু মাইনে পেতাম এক ডলার করে। কিন্তু আমি নেহাৎ ছোটই ছিলাম। ও কাজ করার মত আমার তখনও বয়স হয়নি। একদিন সকাল বেলা ট্রে-তে করে খাবার সাজিয়ে গাড়ির ভেতর উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে। ট্রে থেকে খাবার সব ছিটকে পড়ল মাটীতে। বাড়ি ভাড়া আর যুগিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছিল না। ও ঘর ছেড়ে তাই আমাদের অগত্যা উঠে আসতে হোল খাড়া খাড়া কাঠের এক বাড়িতে। শহরের এই দিকটায় জল উঠে থাকে বানের সময়। কাঠের নড়বড়ে লম্বা সিঁড়িটা বেয়ে আমি আর আমার ছোট ভাই মজা পেতাম খুব।

বাড়ি ভাড়ার সমস্যা দেখা দিল এখানেও। আমরা তাই শহরের

মাঝামাঝি আর এক জায়গায় উঠে এলাম। সেখানকার এক ধোলাই-ঘর এ দোকানে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। হোটেলে হোটেলে গিয়ে আমায় দিয়ে আসতে হোত কাপড় চোপড়। ঘর দোরও ঝাঁট দিতে হোত। নিজেদের যৌন-জীবন নিয়ে জোর গলায় যে সব কথা বার্তা নিগ্রোরা বলে বেড়াত, সে সব আমি শুনতে পেতাম।

ও বাড়ি থেকেও তল্পি তল্পা গুটাতে হোল আমাদের। শহরের বাইরে রেল লাইনের ধারে খোলা এক বস্তিতে আমরা এবার উঠে এলাম। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা ইস্কুলে যাবার আগে একটা থলে নিয়ে উনানের জন্য আমি কয়লা কুড়িয়ে আনতাম কালো কালো প্রকাণ্ড ইঞ্জিনগুলোর নীচ থেকে।

মার শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। দিদিমাদের বাড়ির কথা তিনি এখন প্রায় বলতে লাগলেন। ভালোয় ভালোয় আমরা যাতে বড়ো-সড়ো হয়ে উঠি, জীবদ্দশায় তা দেখে যাবার দিদিমার নাকি বড়ো ইচ্ছা। ইতিমধ্যেই কখন থেকে মার কথা-বার্তায় কেমন এক অস্পষ্ট জড়তার ভাব এসে পড়েছিল। তিনি একটানা কথা বলে যেতে পারতেন না। বারবার তাঁকে থোতলাতে হোত। এ যে তাঁর ভবিষ্যৎ অসুখেরই অমোঘ ইঙ্গিত আমি তখনও টের পাই নি। আগের চাইতে মার উপর আমি আরও সচেতন হয়ে উঠলাম। মাকে ছাড়া এক মুহূর্ত যে আমাদের চলবে না এ সত্য আমি বুঝে নিলাম হাড়ে হাড়ে। ক্রমশ আমার যেন কেমন আশংকা হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে মার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু চোখ তুলে উনি আমার দিকে তাকালেই আমি নিতাম চোখ ফিরিয়ে। কয়েকদিন পর পর মা যখন ঘনঘন অসুখে পড়তে লাগলেন, আমার তখন সত্যিকারের ভয় দেখা দিল। দিনও আর চলছিল না। ক্ষুধা আর

আর তৃষ্ণায় দিন গুণতে লাগলাম আমি আর আমার ছোট ভাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে।

একদিন সকাল বেলা সহসা এক চিৎকার শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল।

'রির্চাড্! রির্চাড্!'

বিছানা থেকে আমি নেমে পড়লাম তড়াক করে। ভাই ছুটে এল ঘরের মধ্যে।

'রির্চাড্, একবারটি এসে দেখে যাও মাকে। মা যেন কেমন করছেন।' ও বলল এক নিঃশ্বাসে।

আমি অমনি ছুটে গেলাম মার ঘরে। দেখলাম, বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন বাইরে বেরোবার পোষাক পরে। চোখছুটি তাঁর খোলা। মুখখানি আছে হাঁ হয়ে। তিনি চুপ-চাপ নিঃশব্দে পড়ে আছেন বিছানায়।

'মা!' আমি তাঁকে ডাকলাম।

মা কোন সাড়া দিলেন না। মুখও ফিরালেন না। নাড়া দিয়ে একবার দেখবার জন্য আমি এক পা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু পর মুহূর্তে আবার ফিরে এলাম। ভয় হতে লাগল: কি জানি, মা বুঝি আর বেঁচে নেই!

'মা!' আবার আমি ডাকলাম। মা যে সাড়া দিতে পারচ্ছেন না, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

অবশেষে সাহস করে আমি এগিয়ে এলাম। নাড়া দিলাম মাকে। তিনি একটু নড়ে উঠলেন। গোঁঙিয়ে উঠলেন একবার। ভাই আর আমি তুজনে মিলে বারবার তাঁকে ডাকতে লাগলাম। মা কিন্তু একবারও সাড়া দিলেন না। য়্যাঁ, মা কি মারা গেছেন? কথাটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম পরস্পর। কি যে করব ভেবে পেলাম না।

'তুই দাঁড়া, আমি আর কাউকে ডেকে নিয়ে আসি,' আমি বললাম।

বারান্দায় ছুটে গিয়ে এক প্রতিবেশিনীকে ডাকতেই কালো লম্বা একটি মাহিলা বেরিয়ে এলেন দোরগোড়ায়।

'মাকে একবারটি এসে দেখে যান না? আমরা কত করে ডাকছি, মা তবু জাগছে না। সাড়াও দিচ্ছে না। কেমন যেন করছে মা।' আমি তাঁকে সব জানালাম।

আমার পিছু পিছু তিনি এলেন আমাদের বাড়িতে।

'মিসেস্ রাইট্!' তিনি এসে মাকে ডাকলেন নাম ধরে।

মা তবু অসাড় নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। কিছুই যেন দেখতে পারছেন না। মহিলাটী মার এবার নাড়ি টিপে দেখলেন।

'না, মারা যান নি,' তিনি এবার বলে উঠলেন। 'তবে হ্যাঁ, বড়ো অসুস্থ। দাঁড়াও, পাড়ার আরও জনা কয়েককে আমি ডেকে নিয়ে আসি।'

পাড়ার আরও পাঁচ-ছয়জন স্ত্রীলোক ছুটে এলেন। আমরা দুভাই যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, ওঁরা তখন সবাই মার কাপড়-চোপড় সব ছাড়িয়ে তাঁকে শোয়ায়ে রাখলেন বিছানায়। ঘরের মধ্যে আসতে এবার ওঁরা বললেন আমাদের। আমরা যেতেই একজন বলে উঠলেন:

'আকস্মিক আক্রমণ বলেই তো মনে হচ্ছে আমার।'

'হ্যাঁ, পক্ষাঘাতের মতনই ঠিক অনেকটা।' একজনা সায় দিলেন:

'আহা, অল্প বয়স—!' অপর আর একজনা বলে উঠলেন দুঃখ করে।

পাড়ার মেয়েরা মাকে নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি আর আমার ভাই আমরা দুজন দেয়ালে ঠ্যাস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আকস্মিক আক্রমণ? পক্ষাঘাত? কি আবার ও সব? মা কি সত্যি সত্যি মারাই যাবেন?—বার বার আমি শুধোতে লাগলাম নিজেকে। ঘরে টাকা কড়ি কিছু আছে কিনা, প্রতিবেশিনীদের কে যেন একজন

আমায় প্রশ্ন করলেন। টাকা-কড়ি কিছু আছে কিনা আমি জানতাম না। তোরঙ্গটা খুঁজে দু-একটা ডলার ওঁরা নিলেন বার করে। একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হোল। ডাক্তার এলেন। হ্যাঁ, তিনিও বললেন, মা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। অবস্থা তাঁর এখন বিশেষ সুবিধের নয়। দেখা-শুনা করবার জন্য একজন কাউকে প্রয়োজন তাঁর দিবারাত্র। ওষুধও তাঁকে খেতে হবে। এঁর স্বামী কোথায়?—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। সব ঘটনা আমি তাঁকে জানালাম। তিনি মাথা নাড়লেন।

'সব রকমের সেবা-শুশ্রূষাই ওঁর এখন দরকার,' ডাক্তারবাবু বলে চললেন। 'বাম অঙ্গটা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে। কথা কইতে পারবে না। ওঁকে খাইয়ে দিতে হবে।'

সেদিন একটু পরেই বাক্স-পেঁটারা সব ঘেঁটে দিদিমার ঠিকানাটা আমি বার করলাম। দিদিমাকে লিখে দিলাম, তিনি যেন একবারটি এখানে আসেন দয়া করে। পাড়ার মেয়েরা সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন মাকে দিবারাত্র। আমাদের নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনতেন। কাপড়-চোপড় সব দিতেন কেচে-কেটে। স্তব্ধ অভিভূত চেতনার মধ্য দিয়ে কেটে যেতে লাগল দিনগুলো আমার। ভোজবাজির মত কি যে সব হয়ে গেল কিছুই ভেবে পেলাম না। আচ্ছা, দিদিমা যদি এখন না আসেন? কথাটা আমি ভাবতেই পারলাম না। না, দিদিমাকে ঠিক আসতে হবে। এখানকার দুস্তর অসহ্য নিসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠলাম রীতিমত। আবেগভরে হঠাৎ যেন ছিটকে পড়লাম নিজ মানসিক সত্তায়। আশ-পাশের যে পৃথিবীটার সঙ্গে আমি এতদিন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম অনেকাংশে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে যেন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল আমার কাছ থেকে। শত্রু হয়ে উঠল আমারই। ভয়ে দিশাহারা

হয়ে আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। দীর্ঘ অনেক দিন—হয়ত তাঁর অবশিষ্ট সারাটা জীবনই মাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। তবু তিনি যে একেবারে প্রাণে মারা যাননি তাতেই আমার আনন্দ হোল। অমন কি ই বা আমার বয়েস—ছেলেমানুষ এখনও। কিন্তু আমাকে আর ছেলেমানুষের মত হয়ে থাকলে চলবে না। কথাটা ভাবতেই আমার দুঃখও হোল। খেলা-ধুলোর কথা আমি একেবারে ভুলে গেলাম। চিবুকে হাত রেখে ভাবতে বসলাম, দিদিমা সত্যি সত্যি আসবেন তো? সাহায্য করবেন কি আমাদের? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোন লাভ নেই! শুধু শুধু হয়রান করে তুলে অকারণ। আমি ওসব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম।

পাড়া-পড়শীরা এসে আমায় যখন খেয়ে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন আমি তখন যেতে চাইতাম না। পরের বাড়ি গিয়ে ঘন ঘন খেয়ে আসতে আমার সত্যি ভারী লজ্জা করত। বহু পীড়াপীড়ির পর অগত্যা যখন পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হোত, একটুখানি খেয়েই আমি তখন উঠে পড়তাম। ভাবতাম তা হোলেই বুঝি পরের বাড়ি এসে খেয়ে যাবার লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কিছুটা। আমি কিছুই খাইনি বলে অপর ছেলেরা যখন আসত খাবার যাচতে, আমি তখন খুব ব্যথা পেতাম। কিছু না খেলেও মিথ্যা করে বানিয়ে বলতাম, আমি খেয়ে এসেছি। দিদিমা এসে না পৌঁছা পর্যন্ত দিনগুলো আমার মহা অস্বস্তিতেই কাটল এভাবে। তিনি আসার পর তাঁর হাতে সব কিছু আমি সঁপে দিলাম। নিষ্কৃতির হাঁপ ছেড়ে বুঝি এবার বাঁচলাম। যাই হোক না, একলা একলা আমি এতদিন তো চালিয়ে এসেছি সব কিছু।

মাকে নিয়ে দিদিমার ছেলেমেয়ে মোট নয়জন। ওঁরা সবাই ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে। তাঁর নির্দেশ মত আমি তাঁর অপর আট ছেলে-

মেয়েকে চিঠি লিখে দিলাম অর্থ সাহায্য চেয়ে। আরও লিখলাম—'ইলা ও তার ছোট ছোট দুই ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে।' পত্রপাঠ টাকা এসে পৌঁছাল।

দিন কয়েক ধরে আবার চলল বাঁধা-ছাঁদার উদ্যোগ। মাকে ট্রেনে উঠান হোল স্ট্রেচারে করে। উপরের বিছানায় মা শুয়ে রইলেন। জ্যাক্‌সনের দিকে যাত্রা করলাম আমরা নীরবে। ডেট্রইট্ থেকে ম্যাগী মাসী ছুটে এসেছিলেন মাকে সেবা শুশ্রূষা করতে। দিদিমাদের প্রকাণ্ড বাড়িটা চুপচাপ—নীরব নিস্তব্ধ। চাপা ফিস্‌ফিস করে আমরা সবাই কথা-বার্তা বলতাম। পা টিপে টিপে এমন করে হাঁটতাম যাতে টুঁ শব্দটি না হয়। ঘর থেকে ওষুধের বোঁটকা গন্ধ বেরুত। নিয়মিত যাওয়া-আসা করতেন ডাক্তার কোবিরেজ। দিন রাত্রি সব সময় মার কাতর গোঙানি ভেসে আসত। সব সময় আশংকা হোত, তিনি বুঝি আর বাঁচবেন না।

ক্লিও মাসী এসেছিলেন চিকাগো থেকে। মিসিসিপির গ্রীনউড্ থেকে এলেন ক্লার্ক্ মামাবাবু; মিসিসিপির কার্টাস্ থেকে এ্যাডওয়ার্ড মামা। আলাবামা-র মোবাইল থেকে এলেন চার্লস্ মামু। আলাবামা-র হান্টস্‌ভিল-এর এক আশ্রম থেকে ছুটে এলেন অডি মাসী। টমাস মামাও এলেন মিসিসিপির হ্যাজেলহার্স্ট থেকে। বাড়িখানা গম্‌গম করতে লাগল সব সময়। চাপা ফিসফাস এক কণ্ঠস্বর প্রায় আমার কাছে ভেসে আসত: 'ওর ছেলে-পিলেদের এবার কি দশা হবে, শুনি?' হোলই বা এঁরা সকলে আমার হিতৈষী পরমাত্মীয়। তবু অপর লোককে আমার ভবিষ্যৎ পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মামা আর মাসীমাদের অনেককে ইতিপূর্বে আমি কখন দেখিওনি। তাই ওঁদের সামনে আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল আগেকার মত। একদিন এ্যাডওয়ার্ড্ মামা আমাকে তাঁর কাছে

ডেকে পাঠালেন। হাড়-বহুল আমার সর্বাঙ্গে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ভাই বোনদের লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠলেন আপন মনে :

'ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করাই ওর একান্ত দরকার দেখছি।'

আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, সারাটি জীবনভোর যেন নামহীন, গোত্রহীন একটানা বহু অন্যায় করে এসেছি—সেই অপরাধের যেন আর ক্ষমা নেই!

"হ্যাঁ, পেট ভরে খেলে-দেলে ও আবার চ্যাঙা হয়ে উঠবে', দিদিমা জবাব দিলেন।

বাড়ির আলাপ-আলোচনায় ঠিক হোল, ভাই আর আমাকে এবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হবে। কেননা, মামা কি মাসীমা যিনিই আমাদের ভার নিন না কেন, আমরা দুজনের ভরণ পোষণের ভার একা একা একজনকে বইতে হলে, তাঁকে সত্যি ভারাক্রান্ত করা হয়। কোথায় যেতে হবে আমায়? আমার ভার কে নেবেন, কে জানে? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম ক্রমশ। মামা কি মাসীমা কেউ আমার কাছে এলে, তাঁদের দিকে আমি তাকাতেই পারতাম না। ওঁদের সামনে আমার এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে ওঁরা কেউ মনে করেন যে আমায় নিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। সব সময় একথা আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতাম।

রাত্রিতে চোখ দুটি বুজলেই রাজ্যের যত সব আজগুবী স্বপ্ন পেয়ে বসত আমাকে। মাঝে মাঝে আমি বিকট চিৎকার করে উঠতাম ভয়ে। বুড়োরা সবাই ছুটে আসতেন। ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তখন তাকিয়ে থাকতাম ওঁদের দিকে। নিশি পাওয়া এক একটি মূর্তি বলে মনে হোত ওঁদের। তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। একদিন রাত্রিবেলা আমার যখন হঠাৎ তন্দ্রার ঘোর ভেঙে গেল দেখলাম, আমি তখন

দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির পিছন দিককার উঠানে। দিনের মত তখন চারদিকে ফরসা ধবধবে জ্যোৎস্না। থমথমে জমাট নীরবতা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমায়। হঠাৎ চমক ভাঙতেই খেয়াল হোল, আমার একখানা হাত কে যেন এসে চেপে ধরলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, মামা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পিছনে। শান্ত, মৃদুগলায় তিনি প্রশ্ন করলেন :

'কি হয়েছে, খোকা ?'

ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি কি বলছেন, বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সব কিছু যেন আমার গুলিয়ে যেতে লাগল কুয়াসার ঘন-ঘোর আস্তরণে।

'রিচার্ড, কি করছিস এখানে ?'

মুখ দিয়ে আমার কোন শব্দই বেরুলো না। মনে হোল, এ ঘোর আমার বুঝি আর কখনও কাটবে না। মামাবাবু আমায় একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলেন। আমি আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। চেয়ে দেখলাম, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে উঠানটা ছেয়ে গেছে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায় ?' চমক ভাঙতেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

'তোকে নিশিতে পেয়েছে।' মামা জবাব দিলেন।

এর পর থেকে দিদিমা আমায় পেট ভরে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করলেন। বিকেল বেলা গা ধুয়ে দিতেন। ফলে আমি সেরে উঠলাম একটু একটু করে। তবু দিবারাত্রি সব সময় কেমন এক অস্বচ্ছন্দ উদ্বিগ্নতার মধ্যে জীবন আমার কাটতে লাগল। মনে মনে তাই ঠিক করলাম, একটু বড় হলেই নিজের দু'পায়ের উপরে আমি যখন দাঁড়াতে শিখব তখন দিদি-মাদের এই বাড়ি থেকে ঠিক চলে যাব। দিদিমারা যে সহৃদয় ছিলেন না আমার উপর, গাল-মন্দ করতেন হামিশা—তা নয়। আমরা দুভাইকে ভরণ পোষণ করবার মত তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। মাও দিনদিন আরও

রুগ্ন হয়ে পড়ছিলেন। বাক্‌শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিলেন। কঠিন পাষাণের মত কেবল চেয়ে থাকতেন চোখ দু'টি পাকিয়ে। তাঁর দিকে তাকাতে আমার খুব কষ্ট হোত। তাঁর ঘরে যাওয়া আমি তাই একরূপ ছেড়েই দিলাম। বাইরের ঘরে বসে মাসী আর মামারা সল্লাপরামর্শ কর-ছিলেন একদিন বিকালবেলা। আমরা দুভাই-এর তখন ডাক পড়ল।

'রিচার্ড', এক মামা বলে উঠলেন। 'তুমি তো জানো তোমার মার খুব অসুখ।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তোমরা দুভাইয়ের সব ভার বইবার মত সঙ্গতি দিদিমার নেই তাও তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ?' তিনি বলে চললেন।

'আজ্ঞে, হাঁ।' শেষ মন্তব্য তাঁর শুনবার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'ম্যাগী মাসী তোমার ভাইকে ডেট্রইট-এ নিয়ে যাচ্ছেন। ওকে সেখানকার ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে।'

চুপ করে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমায় কে নেবেন কে জানে? ম্যাগী মাসীর সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু এ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার সাজে না।

'এখন কথা হচ্ছে, তুমি যেতে চাও কোথায়?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

প্রশ্নের আকস্মিকতায় কেমন যেন একটু ভাবচকিয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় আমার যেতে হবে তার অমোঘ নির্দেশ শুনবার জন্যই তো আমি কান পেতে ছিলাম। কিন্তু যাওয়া না যাওয়ার দায়িত্বের সব ভার আমার উপরই ছেড়ে দেওয়া হোল কেন? কিন্তু আমায় যে কেউ নিয়ে যেতে চাইছেন আমি তো একবার ভাবতেও পারলাম না।

'গেলে হয় কোথাও।' আমি জবাব দিলাম।

'আমরা যে কেউ তোমাকে নিয়ে যেতে পারি সঙ্গে করে', তিনি জানিয়ে দিলেন।

জ্যাক্সনের খুব কাছাকাছি কে থাকেন আমি চট করে তা একবার হিসেব করে নিলাম। মাত্র মাইল কয়েক দূরে গ্রীনউডে থাকেন ক্লার্ক মামাবাবু। তাই জানালাম :

'ক্লার্ক মামাবাবু তো খুব কাছেই থাকেন, আমি তাঁর সঙ্গেই যাবো'।

'ঠিক তো ?'

'আজ্ঞে ; হাঁ।'

'ক্লার্ক মামা এগিয়ে এসে তাঁর হাতখানা রাখলেন আমার মাথার উপর।

'বেশ, তাই চল। যাবার সময় আমি তোমায় নিয়ে যাবো। গিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে ওখানকার। কালই কাপড় চোপড় সব কেনা-কাটা করে আসতে হবে।'

উদ্বেগের স্রোতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে এল সত্যি, কিন্তু জের তার কাটল না একেবারে। ভাইয়েরই জিত হোল। উত্তর মল্লুকে যাচ্ছে সে। আমিই যেতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু কথাটা পাড়াই হোল না।

রেলগাড়ীতে চড়ে আবার রওনা হলাম। কিন্তু দক্ষিণের ছোট এক অজ সহরেই থেকে যেতে হোল আমায়। গ্রীনউডের বাড়িখানা রাস্তার ধারে গাছ-পালার সুনিবিড় ছায়ায় অনেকটা দোতলা বাংলো ধরনের। সবশুদ্ধ চারখানা ঘর। টেবিলের উপর গরম খাবার সাজিয়ে রেখে জোডি মামী খেতে বসেছিলেন। তিনি দোআঁশলা মিউল্যাটো মেয়ে। দোহারা গড়ন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। কথাবার্তা কমই বলেন। সংযত গম্ভীর তাঁর হালচালে আমি ঘাবড়ে গেলাম রীতিমত। অজ্ঞাত,

অপরিচিত তাঁর স্বভাবের আমি কোন হদিশই পেলাম না। ভয় হোল, বাস্তার কোন 'বখাটে ছোকরা' বলে তিনি বোধ হয় আমায় ভেবেছেন। হয়ত মনে করেছেন, বাড়ির কোন শাসনই আমার জোটে নি কোন কালে। ভাবলাম, তিনি বুঝি আমায় মনে মনে তুচ্ছ অবজ্ঞা করছেন। অপাংক্তেয় করে রেখেছেন অনাদর উপেক্ষায়। মাসীমার সামনে আমি তাই আত্ম-সচেতন হয়ে উঠতাম বেশী মাত্রায়। নেহাৎ আনাড়ির মত কাজ কর্ম সব করে বসতাম। মামা ও মামী দুজনেও আমার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলতেন, যাতে মনে হয় আমি যেন সত্যি সত্যি মস্ত বড় হয়ে গেছি। কি যে তাঁরা চাইছেন আমার কাছ থেকে আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। সংসারে আমাদের দিন যখন আর চলছিল না এমন কি তখনও পর্যন্ত মার উপর আমার উগ্র আন্তরিকতা অটুট ছিল। কিন্তু এখানে তার কোন হদিশই পেলাম না। হয়ত এমনও হতে পারে আমি তা ভালো করে খুঁজে দেখি নি।

খাবার টেবিলে বসে ঠিক হোল পরদিন আমায় ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। মামা ও মামী দুজনকেই কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। আমার দুপুর বেলার খাবারটা উনানের উপর চাপা থাকবে বলে জানালেন।

'রির্চাড্, এখন থেকে এই তোমার নতুন ঘর-বাড়ি,' মামাবাবু বললেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ'।

'ইস্কুল থেকে ফিরে কিছুটা কাঠ আর কয়লা এনে রেখো চুল্লিটার জন্য বুঝলে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কাঠগুলো একটু চিরে নিয়ো। রান্না ঘরের উনানটাতেও একটু আগুন দিয়ে রেখো।'

'আজ্ঞে, দেবো।'

'কল থেকে এক বালটি জলও ধরে রেখো। সকাল বেলা তোমার মামীমাকে তো আবার রান্না চড়াতে হবে।'

'আজ্ঞে।'

'টুকি টাকি ঘরের এসব কাজ-কর্ম সেরে নিয়ে তুমি অবশ্যি তারপর পড়াশুনো করতে পারো।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

ইতিপূর্বে এমনি ধারা নির্দিষ্ট কোন কাজের দায়িত্ব আমায় চাপিয়ে দেয়া হয় নি কখনও। তাই কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে আমি শুতে গেলাম। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না এক ফোঁটাও। কেবল মনে হতে লাগল অন্ধকার : পথ ধরে অজানা অপরিচিত এক বাড়ীতে আমি যেন এসে পড়েছি। ওখানকার অজানা অপরিচিত লোকগুলো মিশমিশে কালো অন্ধকারে রাতে কি যেন কথা কইতে চায় ফিসফিস করে। কি যে হবে আমার কে জানে? কি করে যে দিন কাটবে বলাও যায় না। মামীমাটি কেমন একবার যদি জানতে পারতাম। কেমন ধারা আমায় চলা ফেরা করা উচিত, তা যদি একবার জেনে নিতাম?

আচ্ছা, মামাবাবু আমায় অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধূলো করতে কি দেবেন না? পরদিন সকাল বেলা আমার যখন ঘুম ভাঙল, ঘরের মধ্যে তখন রোদ এসে পড়ে চিকচিক করছে। আমি অনেকটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

'রিচার্ড্!' মামাবাবু আমায় ডাকছেন। আমি চট্পট মুখ হাত

ধুয়ে নিলাম। তারপর পোষাক পরে নিয়ে নিশব্দে টেবিলে এসে বসলাম।

'সুপ্রভাত, রিচার্ড্!' মামীমা বলে উঠলেন।

'ওঃ, সুপ্রভাত!' বিড় বিড় করে আমিও বললাম। 'সুপ্রভাত কথাটা আমারই আগে বলা উচিত ছিল।

'তুমি যে তল্লাট থেকে আসছ ওখানকার লোকেরা 'সুপ্রভাত' বলে না বুঝি?'

'আজ্ঞে, বলে।'

'আমি ভেবেছিলাম ওরা বুঝি বলেই না।' মামীমা টিপ্পনী কাটলেন।

মামা ও মামী দুজনেই আমায় অমন করে জীবনের ঘটনা সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে আমি ভয়ানক আত্ম-সচেতন হয়ে উঠলাম। ক্ষুধার কথা একরূপ ভুলেই গেলাম। খাওয়া দাওয়া সারার পর ক্লার্ক মামা আমায় নিয়ে গেলেন ইস্কুলে। পরিচয় করিয়ে দিলেন অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইস্কুলের দুপুর ছুটির আগেকার সময়টা আমার বেশ কেটে গেল ভালোয় ভালোয়। নতুন অপরিচিত পাঠ্য পুস্তকের দিকে তাকিয়ে বসে বসে আমি ক্লাশের পড়া শুনতে লাগলাম।

পাঠটা খুব সোজা বলেই মনে হোল। তৈয়েরী করে নিতে দেরী হোল না। তবু আশংকার জের কাটল না। ইস্কুলের আর সব ছেলেদের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলব কি করে কে জানে? নতুন নতুন ইস্কুলে ভর্তি হওয়া মানে নতুন করে এক একটা দিক আবিষ্কার করা জীবনের। ছেলেগুলো এখানকার একগুঁয়ে বদ মেজাজী নয় তো? মারামারিতে নিশ্চয় খুব পটু। আমি ঠিক ধরে নিলাম।

দুপুরে যখন টিফিনের ছুটি হোল ইস্কুল মাঠে আমি তখন এসে দাঁড়ালাম। এক পাল ছেলে এসে আমায় তখন ঘিরে ধরল। ওরা চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল আমার আপদ-মস্তক সর্বাঙ্গ। ফিস্ ফিস করে কি যেন তারপর বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। একটা দেয়ালে গিয়ে আমি ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। অস্বস্তির ভাবটা লুকোতে চেষ্টা করলাম।

'তুমি আসছ কোত্থেকে?' এগিয়ে এসে একটি ছোকরা প্রশ্ন করল ফস করে।

'জ্যাকসন থেকে।'

'আচ্ছা, জ্যাকসনের লোকগুলো সব অমন নোংরা কেন বল তো?'

ঝাঁঝাল গলায় ও প্রশ্ন করলে। হাসির উচ্চ রোল উঠল চারিদিকে।

'তুমিও বা অমন সাফসুফ কেতাদুরস্তটা কি,' পাল্টা জবাব দিলাম আমিও তৎক্ষণাৎ।

'ও—ও!'

'উঁ—উঁ!'

'ও বললে কি শুনলি তো?'

'নিজেকে খুব বুঝি চালাক-চতুর ঠাওড়িয়েছ না?' নাক সিটকে উঠল ছোকরাটা।

'ত্মাখ, গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসো না', আমি সাবধান করে দিলাম। 'মজা টের পাইয়ে দেবো আমি তাহোলে।'

'হয়েছে—হয়েছে, ঢাক পিটিয়ে অত বাহাদুরী করিস নে!'

'তুইও করিস নে?'

'জানিস তুই এসব বলছিস কাকে ?'

'তুইও জেনে রাখিস !'

'কি, বাপ তুলে কথা বলা ?' এক পা এগিয়ে এলো ছেলেটা।

'বলতে এলে অমনটা শুনতে হয় !'

এই আমার প্রথম শক্তি পরীক্ষা। এখানেই যদি আমার হার হয়, সারা স্কুল জীবনেই আমার তা হোলে হার হয়ে গেল। কারণ, জয়-পরাজয়ের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় পড়া শুনোয় নয়। তা হতে হয় অপরকে কে কেমন করে অভিভূত করতে পারে, পরস্পর মারামারি করার ইচ্ছাটার উপর কে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করতে পারে তার কষ্টিপাথরে।

'ভালো হবে না বলছি, ফিরিয়ে নে কথা সব !' মারমুখো হয়ে উঠল ছোকরাটা।

'তুইও অমন বলতে আসিস কেন ?'

মারামারির আঁচ পেয়ে ছেলের দল হৈ চৈ চীৎকার করে উঠল। ছেলেটি কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল একটু। মারামারি করে আমার সঙ্গে বিশেষ কোন লাভ হবে কিনা বুঝি তা দেখতে লাগল তলিয়ে।

'ছোঁড়াটা বলছে কি তোকে শুনলি তো ?' কে যেন খোঁচা দিলে ওকে।

খোঁচা খেয়ে ছোকরাটা এবার এগিয়ে এলো। রুখে দাঁড়ালাম আমিও। আমাদের মাঝখানে মাত্র ইঞ্চি চারেক তফাৎ।

'তোকে আমি খুব ভয় করি ভাবছিস নাকি ?'

'তাই তো দেখছি !'

পাছে মারামারির মজাটা ফসকে যায় এই আশঙ্কায় কেউ কেউ বুঝি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেছন থেকে কে যেন ঠেলে দিলে ওকে। আমার

উপর সে এসে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। জোরে ধাক্কা দিয়ে ওকে আমি দূরে সরিয়ে দিলাম।

'ধাক্কা দিলি কেনো রে?'

ছোকরাটি বলে উঠল।

• 'আমার পাশ ঘেঁসছিস কেনো তাহোলে?'

পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে সে আবার এসে পড়ল আমার উপর। তার মুখের উপর সিধে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলাম। ছেলের দল চীৎকার করে উঠল। চারদিক থেকে ওরা ঘিরে ধরল আমাদের। সমানে ঘুষি চালিয়ে যেতে আমি বাধা পেতে লাগলাম বারে বারে। মারা-মারি করতে করতে একজন একটু দুর্বল হয়ে পড়লেই উৎসুক ছেলের দল ধাক্কা দিয়ে তাকে আবার এগিয়ে দিতে লাগল। এক একটা ঘুসির সঙ্গে ওরা হাত তালি দিয়ে উঠতে লাগল চীৎকার করে। আজ জিততে না পারলে কিংবা মারামারির কায়দাটা আচ্ছা করে আজ যদি দেখিয়ে দিতে না পারি, তাহোলে প্রতিদিন নতুন এক একটা ছেলের সঙ্গে আমায় লড়াই করতে হবে, এটা আমি ভালো করেই জানতাম। তাই আমি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। আমার প্রত্যেকটা ঘুসির সঙ্গে কালচে ছাপ রেখে এটা আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে চাইলাম: আমি ভীতু নই। শুধু মার খাই না, মারতেও জানি। ঢং ঢং করে ইস্কুলের ঘণ্টা এবার বেজে উঠল। ওরা আমাদের দুজনকে টেনে ছাড়িয়ে দিল। মারামারিটা হোল সমান সমানই।

'আচ্ছা দাঁড়া, তোকে দেখে নেবো শালা।' ছোকরাটা চীৎকার করে উঠল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখে নিস!' আমিও জবাব দিলাম।

ক্লাশে ফিরে এলে কৌতূহলী ছেলের দল আমায় নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

কদর আমার বেড়ে গেল অনেকটা। ছুটির ঘণ্টা তারপর যখন বেজে উঠল, আমি আবার মারামারির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরাটার আর কোন পাত্তাই মিলল না।

ফিরবার সময় দেখলাম পথের উপর একটা সস্তা আংটি পড়ে আছে। তক্ষুনি ওটাকে আমি কুড়িয়ে নিলাম। লাল একটা পাথর বসান ছিল আংটিটার উপর। চারপাশের ছোট ছোট কাঁটাগুলো একটু ঢিলে করে পাথারটা আমি খুলে নিলাম। আংটিটার ধারাল কাঁটাগুলো এবার বেরিয়ে পড়ল দাঁত বার করে। আংটিটাকে আমি তখন একটা আঙুলে পরে নিলাম। মুঠিটা ভিড়লাম। হ্যাঁ, যে কোন শালাই এবার আসুক না কেনো দেখে নেবো। মিটিয়ে দেবো আচ্ছা করে বাছাধনের মারামারি করার স্বাদটা। প্রত্যেকটা ঘুসির সঙ্গে সঙ্গে বাছাধনের মুখের উপর লালচে ছাপ পারা যাবে রেখে যেতে।

কিন্তু আংটিটা আমার আর কোন কাজেই লাগল না। আমার নতুন অস্ত্রটা ইস্কুলে নিয়ে দেখাতেই তার কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ল ছেলেদের মধ্যে। প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ছোকরাটাকে ফের মারামারি করতে আমি আবার আহ্বান করলাম। কিন্তু কোন সাড়া দিল না সে। মারামারি করার আর কোন প্রয়োজনই হোল না। আসন আমার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বিনা দ্বন্দ্বে।

ইস্কুল মাঠে আমার এই জয় লাভের কিছুদিন পরেই নতুন আর এক বিপদ দেখা দিল। শোবার আগে এক দিন রাত্রিবেলা সামনের ঘরটায় বসে বসে আমি পড়ছিলাম এক মনে। ক্লার্ক মামা

হলেন ঠিকেদার এক ছুতোর মিস্ত্রী। টেবিলে বসে তিনি তখন এক বাড়ির নক্সা আঁকছিলেন। মামীমাও কি যেন রিফু করছিলেন। এমন সময় দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল সহসা। মামীমা উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী এসে ঢুকলেন ভেতরে। তিনি হলেন এ বাড়ির মালিক। আগে এ বাড়িতেই থাকতেন। নাম বার্ডেন। লম্বা চওড়া গড়ন। গায়ের রঙটা একটু কটা। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে কিছুটা। তাঁকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়া হোল। দাঁড়িয়ে উঠে আমি তাঁর করমর্দন করলাম।

'বেশ বাছা, বেশ!' মিঃ বার্ডেন বলে উঠলেন। 'আর একটি ছেলেকে এ বাড়িতে দেখে সত্যি সত্যি খুব আনন্দ হোল।'

'আরও একটি ছেলে আছে নাকি এখানে?' আগ্রহে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার ছেলে থাকত এখানে', মাথা নেড়ে মিঃ বার্ডেন সায় দিলেন।—'কিন্তু সে তো আর নেই!'

'কত বয়েস তার?'

'তা প্রায় তোমার মতনই হবে।' ধীরে ধীরে জবাব দিলেন মিঃ বার্ডেন। তিনি বুঝি খুব মুসড়ে পড়লেন।

'ও এখন কোথায় গেছে?' বোকার মত আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে নেই—মারা গেছে।'

'আহা!'

আমি তাঁকে বুঝতে পারি নি। দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ

নীরবে আমরা বসে রইলাম।' মিঃ বার্ডেন এবার মুখ তুলেন। তাকালেন আমার দিকে পরম আগ্রহ সহকারে।

'ওঘরে তুমি শোও বুঝি?' আমার ঘরটা তিনি দেখিয়ে দিলেন হাত বাড়িয়ে।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'খোকাও ও ঘরটায় শুত।'

'ও ঘরটায়?' নিশ্চিত করে জেনে নেবার জন্য প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, ঠিক ওখানটায়।'

'ও বিছানাটায়?'

'হ্যাঁ, ওটাই ছিলো ওর বিছানা। এখানে তুমি যখন আসছ শুনলাম ও বিছানাটা তোমার জন্য তোমার মামাকে দিয়ে দিলাম।' তিনি সব বুঝিয়ে বললেন।

মাথা নেড়ে মামাবাবু মিঃ বার্ডেনের কথার সায় দিলেন।

কিন্তু এর মধ্যেই বুঝি দেরী হয়ে গেল অনেক! একদল ভূত-প্রেত দৈত্য দানব কিলবিল করে ইতিমধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিলে আমার মানসপটে। ভূত-প্রেতে বাস্তবিক আমি কখনও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু ভগবান বলে যে কেউ আছেন একথা শিখে আসছিলাম ছোট বেলা থেকেই। ভগবানের অস্তিত্বে এতদিন আমায় অনেকটা সায় দিয়ে আসতে হয়েছে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ভগবান যদি থাকেন তবে ভূত-প্রেতও নিশ্চয় আছে। ছেলেটা যে ঘরে মারা গেছে সে ঘরে আমায় ঘুমুতে হবে শুনে মনটা আমার তৎক্ষণাৎ কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠল অসীম ঘৃণায়। মরা ছেলেটা যে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমি তা জানতাম ভালো করে। তবু অশরীরী তার আত্মা জীবন্ত সজীব হয়ে উঠল যেন

আমার কাছে। কিছুতেই আমি তাকে মুছে ফেলতে পারলাম না মন থেকে। মিঃ বার্ডেন চলে গেলেন। ক্লার্ক মামার কাছে আমি এগিয়ে গেলাম ভীরু পা ফেলে। বললাম ঃ

'ওখানটায় শুতে আমার ভয় করছে।'

'কোনো, ছেলেটা ও ঘরে মারা গেছে শুনে ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে ?'

'তা ঠিক, তবু ভয় করছে।'

'একদিন আমাদের সবাইকেও মরতে হবে। ভয় পাবার কি আছে ?'

মুখে আমার কোন উত্তর যোগাল না।

'ধরো, তুমি মরে গেলে তোমায় দেখে লোকে ভয় পাক তুমি কি তাই চাও ?'

এবারও আমি নিরুত্তর রইলাম।

'যত সব কাজে কথা', ক্লার্ক মামা বলে চললেন।

'কিন্তু আমার ভয় করছে।'

'ও সব ভয় তোমার কাটিয়ে উঠতে হবে।'

'আর কোথাও ঘুমোনো যায় না ?'

'আর কোথাও তুমি ঘুমোতে পারো অমন জায়গাও বা কোথায় ?'

'এখানকার ওই সোফাটায় ঘুমাই না কেনো ?'

'এখানকার ওই সোফাটায় আমি ঘুমোতে 'পারি কি' ?' মামীমা ঠাট্টার সুরে টিপ্পনী কেটে আমার সংশোধন করলেন।

'এখানকার ওই সোফাটায় ঘুমোতে আমি পারি কি ?' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি মামীমার কথার।

'না।' মামীমাই জবাব দিলেন।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি কোন রকমে ঢুকে পড়লাম। এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলাম বিছানার খোঁজে। আমার কেবল মনে হতে লাগল, বিছানাটা ছুঁলেই মৃত ছেলেটা বুঝি হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে আমার সামনে। কাঁপতে লাগলাম আমি ভয়ে। অবশেষে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানার উপর এক সময়। নাকে মুখে টেনে দিলাম চাদরখানা। কিছুতেই কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না রাত্রিতে। পরদিন চোখদুটি জবাফুলের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল। জ্বালা করতে লাগল।

'ঘুমটা ভাল হয়নি বুঝি?' ক্লার্ক মামা প্রশ্ন করলেন।

'আমি ও ঘরটায় ঘুমোতে পারি না।'

'ছেলেটা মারা যাবার খবরটা শুনবার পূর্বে ও ঘরে তুমি তো দিব্যি ঘুমোতে।' মামীমা প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে, ঘুমোতাম।'

'এখন তা হোলে দোষ করল কি?'

'না, একটু ভয় করছে।'

'ন্যাকা ছেলেমানুষী সাজা ছেড়ে দাও গে!' তিনি জানিয়ে দিলেন।

পরের দিন রাত্রি বেলাও আগেকার মত কাটল। ভয়ে এককোঁটাও আমি ঘুমোতে পারলাম না। মামা ও মামীমা ঘুমিয়ে পড়লে বিছানা ছেড়ে আমি উঠে পড়লাম। পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম কঠিন সোফাটার উপর গায়ে কিছু না দিয়ে। পরদিন সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম মামাবাবু আমায় জাগিয়ে দিচ্ছেন ঝাঁকুনি দিয়ে।

'কেনো এ সব তুমি করছ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'ও ঘরে শুতে আমার ভয় করছে।'

'আজ গিয়ে ও ঘরে তুমি শোবে,' তিনি বললেন, 'ও সব তোমায় কাটিয়ে উঠতে হবে।'

মৃত ছেলেটার ঘরে আরও একটা সশংক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হোল। ওই ঘরটা বুঝি আমার নয়। ভয়ে আমার গলাটা গেল শুকিয়ে। কপালে দেখা দিল ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বাড়ির কোথাও টুঁ শব্দটি হলে হৃদযন্ত্রটি যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। পরদিন ইস্কুলে আমার ভারী বিশ্রি কাটতে লাগল। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। বিলম্বিত আরও একটা বিনিদ্র রাত্রি কাটল জেগে জেগে। পরদিন ইস্কুলেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। শিক্ষয়িত্রীর নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারলাম না। সাতদিন নিদ্রাহীন যাপন করে আমার প্রায় স্মৃতিভ্রম হবার উপক্রম হোল।

রবিবার আবার ফিরে এল। গীর্জায় যাবার সময় আমি বেঁকে বসলাম। মামা মামী দুজনেই তো রীতিমতো অবাক। বাড়িতে থেকে আমি যে একটু ঘুমোতে চাই—এ যে তারই কাতর নীরব মিনতি—গীর্জায় যেতে আমার অনিচ্ছার এ নিগূঢ় উদ্দেশ্য তাঁরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। বাড়িতে ওরা আমায় একাই রেখে গেলেন। বাইরের সিঁড়ির উপর সারাটা দিন আমি কাটিয়ে দিলাম বসে বসে। রান্নাঘরে গিয়ে একবার খেয়ে আসতেও আমায় সাহস হোল না। যখন খুব তেষ্টা পেল, বাড়ির পাশ ঘুরে পিছনের উঠানে গিয়ে জল খেয়ে এলাম কল থেকে। তবুও ঘরের মধ্যে ঢুকতে আমার সাহস হোল না। একান্ত মরিয়া হয়ে কথাটা আমি আবার পাড়লাম শোবার সময় রাত্রিতে।

'বাইরের ঘরের সোফাটায় আমায় ঘুমোতে দেন না দয়া করে,' আমি অনুনয় করলাম।

'ভয়টা তোমাকে তো কাটিয়ে উঠতে হবে?' মামাবাবু জবাব দিলেন।

মনে মনে স্থির করলাম মামাকে গিয়ে এবার বলব তিনি যেন আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেন। জানি, আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য খরচ করতে হয়েছে তাঁকে অনেক। জামা কাপড় বই পত্র আমার সব কিনে দিতে হয়েছে তাঁকে। তিনি হয়ত ভাবেন আমায় খুব সাহায্য করছেন। তবু তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললাম:

'মামাবাবু, আমায় জ্যাকসনে পাঠিয়ে দিন না?'

ছোট্ট একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বুঝি কাজ করছিলেন। সিধে হয়ে এবার আমার দিকে তাকালেন মুখ তুলে।

'তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আঁজ্ঞে, না।' সত্য কথাটা বলে ফেললাম। আস্ত ছাদটা এমাত্র বুঝি ভেঙে পড়বে আমার মাথার উপর, আশংকা হতে লাগল প্রতি মুহূর্তে।

'তুমি কি সত্যি সত্যি চলে যেতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানকার চাইতে ওখানে গিয়ে খুব সুখে থাকবে ভেবেছ বুঝি?' তিনি বলে চললেন। 'তোমার খাওয়া পরার অতো টাকা আসবে কোথেকে খেয়াল আছে?'

'মার কাছে গিয়ে থাকবো, আমি কেবল তাই বলছি।'

'সত্যি ও ঘরটার জন্য বলছ না তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি যাতে সুখে শান্তিতে থাকো সে চেষ্টা আমরা করেছি। তা যখন হোল না—' ক্লার্ক মামা ছোট্ট একটা নিঃশ্বস চাপলেন। 'তুমি যদি চলে যেতে চাও বেশ, যেয়ো।'

'কখন ?' আগ্রহে ফেটে পড়ে আমি প্রশ্ন করে বসলাম।

'ইস্কুল ছুটি হলেই যেয়ো।'

'না, আমি এখনই যেতে চাই!'

'ইস্কুলের গোটা বছরটা তোমার তা'হলে মাটী হবে।'

'তা হোক্।'

'ভবিষ্যতে তুমি একদিন অনুতাপ করবে এর জন্য। পুরো একটা বছরও তো তোমার কাটল না ইস্কুলে।'

'আমি এখন বাড়ি যেতে চাই।'

'যাবার কথা তুমি কি ভাবছ অনেকদিন থেকেই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহোলে আজ রাত্রিতেই মাকে আমি লিখে পাঠাচ্ছি।' অবাক-বিস্ময়ে চোখ দুটি তাঁর চক্‌চক্ করে উঠল।

দিদিমার কাছ থেকে আজকে চিঠির কোন জবাব এলো কিনা প্রত্যেকদিন আমি জিজ্ঞেস করতে লাগলাম ক্লার্ক মামাকে। এবং প্রত্যেকদিনই নিরাশ হতে হোত। রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে কাটিয়ে মাথাটা আমার গরম হয়ে উঠল। যত সব বাজে আজগুবী স্বপ্ন দেখতে লাগলাম দিনের বেলা। পড়া-শোনারও ক্ষতি হতে লাগল ভয়ানক। ক্লাশে ইদানিং বেশ ভালই করছিলাম। এখন অনেকটা ঢিলে মারলাম। পাশ করাও অবশেষে দায় হয়ে উঠল। খিট্‌খিটে হয়ে গেলাম। বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম প্রতি মুহূর্তে।

উপাসনা সেরে একদিন সন্ধ্যেবেলা জল ধরতে গিয়েছিলাম কলসী নিয়ে পিছনের কলতলায়। ঘুমে চোখ দুটি বুঁজে আসছিল। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। পায়ের নীচে আমার দুলে উঠছে যেন সব কিছু। কলসীর মুখটা নলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে জলটা আমি

ছেড়ে দিলাম। কলসীর মুখটা কি করে বুঝি সরে গিয়েছিল। ফলে জুতো মোজা প্যাণ্ট আমার ভিজে একাকার হয়ে গেল।

'ধুৎত্তেরি, শালা বাঞ্চোদ কুত্তি কা বাচ্ছী কলসী কোথাকার!' ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় মুখ থেকে আমার কখন অশ্রাব্য গালি খসে পড়ল অলক্ষ্যে।

'রিচার্ড্!' অন্ধকার পিছন থেকে মামীমার স্তব্ধ স্তম্ভিত গলা ভেসে এলো।

মুখ ফিরালাম। মামীমা দাঁড়িয়ে আছেন পেছনের সিঁড়ির উপর। নেমে এলেন তিনি উঠানে। প্রশ্ন করলেন :

'কি বললে?'

'কিচ্ছু না।' মাটীর দিকে চোখ রেখে অনুতপ্তকণ্ঠে জবাব দিলাম।

'ফের বলো তো শুনি কি বললে?' মামীমা জিদ করতে লাগলেন।

নীচু হয়ে কলসীটা আমি তুলে নিলাম। কোন জবাব দিলাম না। কলসীটা কেড়ে নিলেন মামীমা আমার হাত থেকে।

'কি বলছিলে?' আবার তিনি প্রশ্ন করলেন।

ঘাড় গুঁজে আমি তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে কিনারা করতে পারলাম না, তিনি কি সত্যসত্য আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? না, অশ্রাব্য সে গালিটা আমাকে আবার পুনরাবৃত্তি করতে বলছেন বাস্তবিকই।

'তোমার মামাবাবু এলে আজ আমি সব বলবো।'

মামীমার উপর মনটা আমার বিষিয়ে উঠল হাড়ে হাড়ে। মনে হোল, মাথা হেঁট করে মাটীর দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থই তো হোল ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। মাথা পেতে নেয়া সব অপরাধ। কিন্তু মামীমা বুঝি ক্ষমা করলেন না। বললাম :

'যান, বলুন গে!'

কলসীটা তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। জল ভর্তি করে বাড়ির দিকে আমি রওনা হলাম। পিছু পিছু তিনিও আসতে লাগলেন।

'রিচার্ড, তুই অমন—অমন বদ্ ছেলে আমি তো আগে জানতাম না!'

'জানতেন না তো ভারী বয়ে গেল!' আমি ওঁকে এড়িয়ে গেলাম।

বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমি তো কখনও ভাবি নি যে গালটা তিনি শুনতে পাবেন। আর যখন শুনলেনই বা, আমি তো ঘাট মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দিলেন না। ক্ষমা করলেন না। কিছুতেই যখন মন তাঁর পাওয়া গেল না, ব্যাপারটা তা হোলে গড়িয়েই যাক্ ভালো করে। না হয় বাড়িই চলে যাবো। কিন্তু বাড়িই বা আমার কোথায়? হ্যাঁ, পালিয়ে গেলে কেমন হয় এখন থেকে?

ক্লার্ক মামা ফিরলেন। একটু পরেই বাইরের ঘরে আমার ডাক পড়ল।

'জোডি বলছিল তুমি নাকি বিশ্রী গালাগালি করছিলে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তুমি তা হোলে স্বীকার করছো?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কেনো করছিলে গালাগালি?'

'জানি নে।'

'বেত্তিয়ে আজ আমি তোমায় শাস্তি দেবো। জামা খুলে ফেলো।'

পিঠের জামাটা নিঃশব্দে আমি খুলে ফেললাম। শপাশপ

কয়েক ঘা তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন চামড়ার এক কোমর-বন্ধ দিয়ে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। একটুও কাঁদলাম না।

'ফের অমন আর গালাগালি করবে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি বাড়ি চলে যাব।' আমি তার উত্তর দিলাম।

'জামা পরে নাও।'

আমি নিঃশব্দে তাঁর আদেশ পালন করলাম।

'আমি বাড়ি যাব।'

'এটাই তোমার বাড়ি।'

'আমি জ্যাকসনে যেতে চাই।'

'জ্যাকসনে তোমার কোন বাড়িঘর নেই।'

'আমি মার কাছে যাবো ভাবছি।'

'বেশ,' তিনি হাল ছাড়লেন অবশেষে। 'আগামী শনিবার আমি তোমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেবো।' বিফল চোখ তুলে তিনি তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'জোডি যা বলছিল ও সব গাল-মন্দ তুমি শিখলে কোথায়?'

তাঁর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কোন জবাব দিতে পারলাম না। দ্রুত সঞ্চারণমান চলচ্চিত্রের ছবির মত আমার মনের পর্দায় নোংরা এক সার বস্তির খোলাঘর হঠাৎ ভেসে উঠল। সে সব খোলাঘরে একদা আমাদের থাকতে হয়েছে মাথা গুঁজে। তখনকার দিনের সঙ্গে আজ মামাবাবুর সামনে বাইরের-দালান-কোঠায়-দাঁড়িয়ে-থাকা-আমার কতখানিই না তফাৎ। কত অপরিচিত—যেন চেনাই যায় না! লেখাপড়ার হাতে খড়ির পূর্বে আমি যে গালাগালি করতে শিখেছিলাম, সেকথা আজ আমি তাঁকে

কি করে বোঝাব? কি করে বোঝাব ছ' বছর বয়সেই মগুপ আর মাতাল হয়ে উঠতে হয়েছিল আমাকে?

পরের শনিবার তিনি যখন আমায় রেলগাড়িতে উঠিয়ে দিতে এলেন নিজেকে আমার তখন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। মুখ তুলে আমি তাঁর দিকে তাকাতেই পারলাম না। আমার টিকিটখানা আমাকে দিতেই তাড়াতাড়ি আমি গাড়ির মধ্যে উঠে পড়লাম। গাড়িটা যখন ছাড়ল, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিদায় নমস্কারটা কোনরকমে সেরে নিলাম। মামার মুখখানা যখন আর দেখা গেল না, শিথিল হয়ে আমার মাথাটা তখন ঝুলে পড়ল বুকের উপর। চোখ দুটি এল ঝাপসা হয়ে। চোখ বুজে আমি হেলান দিয়ে রইলাম পেছনে। সারাটা পথ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার কেটে গেল।

মাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হোল। এখনও তিনি শয্যাশায়ী। তবে অনেকটা সুস্থই বলা যায়। আর একটা অপারেশনের কথা ডাক্তারেরা বলছেন। তাতে নাকি সেরে উঠবার আশা আছে।

আমি কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আবার একটা অপারেশন কেনো? মিছে মিছি শুধু আশায় আশায় থাকা। আমি নিজেও তো কত স্বপ্নের রঙিন জাল বুনে থাকি। কোন লাভ নেই তাতে। মা এখন যেমন আছেন তেমনটি থাকুন এ আমি আশা করি। অবশ্য এর পিছনে প্রবল ছিল আমার ভয় আর আশংকাই। এ সব কিন্তু কাউকেও আমি বলতাম নি। কেন না, এর মধ্যেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, আমি যা ভাবি তা এখান-

কার আর সব লোকের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা হয়তো তাকে উড়িয়েই দেবে বাজে কথা ভেবে।

আমায় আর পুনরায় ইস্কুলে ভর্তি হতে হোল না। তার পরিবর্তে পিছনের উঠানে একা একা আমি খেলে বেড়াতে লাগলাম। রবারের একটা বল নিয়ে ছুঁড়ে মারতাম বাড়ির পাঁচিলে। বলটা আবার ফিরে আসত। পুরোন একখানা ছুরি নিয়ে হিজ-বিজি নানান ছবি আঁকতাম ভিজা মাটীর উপর। কিংবা বাড়িতে যে কোন বই পাই না কোনো সেটা অমনি পড়ে ফেলতাম। আর নিজের বোঝা নিজে বইবার মত এখনও যথেষ্ট বয়েস হয় নি বলে মনে মনে খুব ব্যথা পেতাম।

অপারেশনের জন্য মাকে ক্লার্ক্স্ডেল-এ নিয়ে যাবার জন্য কাটারস্ থেকে এলেন এ্যড্ওয়ার্ড্ মামা। যাবার সময় আমাকে শুদ্ধু নিয়ে যাবার জন্য আমি বায়না ধরে বসলাম শেষ মুহূর্তে। তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় পরে নিয়ে আমিও এসে পৌছলাম ইষ্টিশানে। সারাটা পথ চুপচাপ বসে বসে আমি কাটিয়ে দিলাম। মার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার সাহস হোল না। এবার বাড়ি ফিরলে হয় না? কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার ইচ্ছে হোত, এঁদের সঙ্গে এগিয়ে যাই। ক্লার্ক্স্ডেলে পৌছে একখানা ট্যাক্সী ভাড়া করা গেল। আমরা চললাম ডাক্তারের ক্লিনিকের দিকে। হৃষ্ট বেশ হাসি খুশিই দেখাচ্ছিল মাকে। কিন্তু আমি জানতাম, তাঁর এই ভাড়া-করা হাসি-খুশির আড়ালে সংশয় দানা বেঁধে উঠেছে ঠিক আমার মতই। ডাক্তারের বসবার ঘরে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। মা বুঝি আর কখনও সেরে উঠবেন না। এ ধারণা আবার মনে তখন কেটে বসল। শাদা কোট পরে ডাক্তার সাহেব

বেরিয়ে এলেন এক সময়। তিনি এসে করমর্দন করলেন আমার। তারপর মাকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। একজন নার্স আর একখানা ঘরের তদারকে বেরিয়ে গেলেন এ্যাড্ওয়ার্ড মামাও। আমি ভয়ানক দমে গেলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম একা বসে বসে। ঘণ্টা কয়েক পরে ডাক্তার সাহেব বেরিয়ে এলেন।

'মা কেমন আছেন?'

'চমৎকার!'

'সেরে উঠবেন না?'

'দিন কয়েক পরে তা বলা যাবে।'

'আমি গিয়ে একবার দেখে আসব?'

'না, এখন না।'

একখানা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি নিয়ে এ্যাড্ওয়ার্ড্ মামা ফিরে এলেন একটু পরে। একখানা স্ট্রেচারও সঙ্গে করে আনল দুজন লোক। ডাক্তারের ক্লিনিকে ঢুকে ওরা এবার নিয়ে এল মাকে। মা পড়ে আছেন চোখ বুঁজে। শাদা আবরণে সর্বাঙ্গ তাঁর ঢাকা। স্ট্রেচারের কাছে ছুটে গিয়ে মাকে ছুঁয়ে আসতে আমার খুব ইচ্ছে হোল। কিন্তু এক পাও পারলাম না নড়তে।

'মাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে কেনো ওদিকে?' এ্যাড্ওয়ার্ড মামাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হাসপাতালে কালা আদমীদের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই।' এ্যাড্ওয়ার্ড্ মামা জবাব দিলেন। 'এমনি ভাবেই আমাদের থাকতে হয়!'

স্ট্রেচারে করে লোক দুজন মাকে নামিয়ে দিলে সিঁড়ির নিচে। এ্যাম্বুলেন্স-এর মধ্যে মাকে নিয়ে ওরা তুললে। গাড়িখানা তারপর

ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখছিলাম। অনুভব করলাম, মা যেন আজ বিদায় নিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে চিরতরে!

একখানা বোর্ডিং বাড়িতে গিয়ে উঠলাম আমি আর এ্যাড্ওয়ার্ড মামা। প্রত্যেক দিন সকালে তিনি বেরিয়ে যেতেন মাকে দেখতে। আর প্রত্যেক দিনই ফিরে আসতেন মুখ চুণ করে। তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন। মাকে আবার বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে অবশেষে আমায় একদিন জানালেন।

'মামা, সত্যি সত্যি কি মার আর বাঁচবার কোন আশা নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ও খুব অসুস্থ।' তিনি উত্তর দিলেন।

ক্লার্ক্স্ডেল থেকে আমরা আবার রওনা হলাম। স্ট্রেচারে করে মা এক মালগাড়িতে এলেন শুয়ে শুয়ে। এ্যাড্ওয়ার্ড্ মামাই তাঁকে দেখাশুনা করছিলেন গাড়িতে। বাড়ি এসে দিন কয়েক মা যন্ত্রণায় ভয়ানক ছট্-ফট করে কাটালেন। ফ্যাল-ফ্যাল—কেমন শূন্য তাঁর চাউনি। ডাক্তারের পর ডাক্তার এসে দেখে গেলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। দিদিমা রীতিমত ক্ষেপে উঠলেন। এ্যাড্ওয়ার্ড্ মামা নিজ বাড়িতে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এলেন। নতুন নতুন ডাক্তার ডাকা হোল। ওঁরা বললেন, রক্তের একটা ডেলা মার মগজে জমাট বেঁধে উঠেছে। তাই নতুন করে আর একটা আক্রমণ দেখা দিয়েছে।

একদিন রাত্রিবেলা মা আমাকে তাঁর বিছানার কাছে ডাকলেন। বললেন, এত যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। মরে যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে।' মার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে আমি তাঁকে

চুপ করতে অনুনয় করলাম। কেমন যেন ভয়ও পেয়ে গেলাম। কিছুতেই আর মার উপর রাগ করতে পারলাম না। আমি তাঁর টুকিটাকি পরিচর্যা করে চললাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল মা যে খুব কষ্ট পাচ্ছেন! পুরো দশ বছর ধরে তাঁকে পড়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়। একটু একটু করে তিনি তারপর সেরে উঠেছিলেন। তবে একেবারে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নি কোনদিন। হঠাৎ মাঝে মাঝে আবার আক্রমণ সুরু হোত। মার অসুখের চিকিৎসাতেই পরিবারের সব সঞ্চয় ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ কোন আয়ও ছিল না সংসারে। একেবারে সারবেও না, কমবেও না—মার অসুখটা ক্রমশ স্বীকৃত একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল পরিবারের মধ্যে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন ধরে দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা আর একান্ত অসহায়তার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় জর্জড়িত মার হতাশ রোগ-পাণ্ডুর দিনগুলি কোন রকমে কাটতে লাগল। তিনি কেবল অস্থির ছট্ফট করতেন এপাশ-ওপাশ। আশায় আশায় থাকতেন সেরে উঠবেন বলে। প্রত্যহ অনিশ্চয়তা, ভয় আর আতংক ছাপিয়ে উঠত চারিদিক। অসহ্য কষ্ট আর অশেষ যন্ত্রণার সীমা ছিল না। বিশেষ এক প্রতীক হিসেবেই যেন মার অসুখটা কেটে বসল আমার মনে। তিনি আমার উজ্জ্বল আবেগময় সত্তাকে অনুরণিত করে তুললেন। চলতে চলতে ভবিষ্যতে যে সব নরনারীর সন্ধান পেয়েছিলাম, তিনি তাঁদের রাঙিয়ে তুলেছিলেন। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের মোড়টাই দিলেন আগাগোড়া ফিরিয়ে। নির্ণয় করে দিলেন অবস্থা-পরিবেশে আমার ভাবী জীবনের ধারা। মার চিররুগ্ন রোগ শয্যার পাশে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমার জীবনের বিষন্ন নিরানন্দময় দিকটাই ফুটে উঠেছিল চিরদিনের জন্য। সে আমাকে আত্মসচেতন করে তুললে।

এমন করে দূরে সরিয়ে রাখলে যে, বিপুল অনাবিল আনন্দেও আমি একটু হাসতে পারতাম না প্রাণ খুলে। কেমন এক বাঁকা চোখে দেখতে শিখলাম সারাটা দুনিয়াকে। সশংক হয়ে থাকতাম সব সময়। অদৃশ্য কেউ এসে যেন টুঁটিটা টিপে ধরবে আমার! আমি তাই পালিয়ে বেড়াতাম ভয়ে ভয়ে। সতর্ক হয়ে থাকতাম সদাসর্বদা।

আমার বয়স তখন সবে মাত্র বারো। পুরো একটা বছরও ইস্কুলে কাটে নি। এর মধ্যেই কিন্তু জীবনের এমন অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করে ফেললাম যা কেউ কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে না। খণ্ডন করতে পারবে না হাজার বাস্তব যুক্তি তর্কের সাহায্যে। কোন শিক্ষা-দীক্ষাই বিচ্যুত করতে পারবে না যা এক চুলও। দুঃখ দিয়েই যাদের জীবন গড়া তারাই বুঝি কেবল বেঁচে থাকার সম্যক অর্থ করতে পারে উপলব্ধি। এ বিশ্বাসটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে রইল। মাত্র বারো বৎসর বয়সেই জীবনের গুরুদায়িত্ব ভার নীরবে বহন করবার পাঠ আমায় নিতে হোল। জীবিকা উপার্জনের সন্ধানে বেরুতে হোল আমাকে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আমি কিন্তু সন্দিহান হয়ে উঠলাম। মাথা পেতে সব কিছু মেনে দিলেও তাকে আমি তলিয়ে দেখতাম ভালো করে। আমার এই স্বভাবের জন্যই বুঝি পরের দুঃখে আমি হয়ে পড়তাম অভিভূত। আকৃষ্ট হতাম আমার মত দুঃখী যারা তাদের দুঃখে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সব ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যেতাম নীরবে। এর জন্যই বুঝি আমি একাধারে কোমল আর কঠিন, উগ্র আর শান্ত হয়ে উঠেছিলাম অসম্ভব রকম।

জীবনের কোন ব্যাপারেই আমি তাই কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করতাম না। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকতে চাইতাম। এ জন্যই বুঝি মানব চরিত্রের দ্বারোৎঘাটনে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল আমায় মানুষের প্রেম আর ভালোবাসা—সন্ধান দিয়েছিল শিল্প আর কাল্পনিক উপাখ্যানের বাস্তবধর্মী প্রাকৃতিক জগতের—হাত ধরে টেনে নিয়েছিল সে সমগ্র মানব আত্মার নিয়ামক রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে। নির্দেশ দিয়েছিল বুঝি বিদ্রোহীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল আমায় এমন সব অনর্থক সমস্যার সমাধানে যারা আমার অন্তরে অন্তরেই কেবল ঘুমিয়ে রইল বেদনা আর বিস্ময়ের মোহপাশে। মানুষের সে অনুভূতির সন্ধান কটা লোকই বা আর রাখে বাইর বিশ্বের?

চার

দিদিমা হলেন যীশুখ্রীস্টের পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসী 'এ্যাড্‌ভেন্টিস্ট চার্চে'র গোঁড়া শিষ্য। তাঁর উপাস্যদেবতার আরাধনা করতে আমিও তাই বাধ্য হলাম। আমার ভরণ পোষণ করার এটা বুঝি মাশুল। দিদিমাদের সংঘের প্রাচীনেরা বাইবেলের এমন ধারা অলৌকিক ব্যাখ্যা করতেন যেন অনন্ত অগ্নির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য কুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে তাব প্রতি পৃষ্ঠায়; যেন অসীম সমুদ্রগুলি শুকিয়ে অর্ন্তধ্যান হয়ে যাচ্ছে কোথাও; উপত্যকার পর উপত্যকা যেন চিক্ চিক করছে পাণ্ডুর শুষ্ক কঙ্কালের; সূর্য যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল; চাঁদে যেন বান ডাকল রক্তের; আকাশের তারা-গুলো যেন একে একে খসে পড়ছে পৃথিবীর বুকে; কাঠের ছরিটা বুঝি সর্পে রূপান্তরিত হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে; অশরীরী কণ্ঠস্বর কার যেন শোনা গেল মেঘের অন্তরালে; মানুষ যেন হেঁটে চলল জলের উপর দিয়ে; মৃতরা উঠল জীয়ন্ত হয়ে কবর থেকে; অন্ধরা আবার ফিরে পেল দৃষ্টি; হন হন করে বুঝি খঞ্জরা চলল হেঁটে!...প্রাণময় ভাষায় এ সকল অলৌকিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে

আমি অনেকটা অভিভূত হয়ে পড়তাম। আবেগের মাথায় মেনে নিতাম সবই সত্য বলে। কিন্তু গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলেই এ ঘোর কেটে যেত। বাইরের কড়কড়ে রোদে এসে—রাস্তার সচঞ্চল জনতার মধ্যে মিশে গেলে তখন মনে হোত সব কিছুই বুঝি বাজে, ভুয়ো! যেন কিছুই ঘটে নি।

আমায় আবার পেয়ে বসল ক্ষুধায়। সে তার তীক্ষ্ণ, ধারাল নখর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে তুলল আমায়। অশান্ত বিহ্বল করে তুলল। মেজাজটা খিট খিটে হয়ে উঠল। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফস করে যেন বেরিয়ে পড়তে লাগল আমার মুখ দিয়ে। ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। আমি যে সব খাবারের কথা ভাবতাম ভ্যানিলা ওয়াফারস্-এর কাছে বুঝি আর কোনটাই দাঁড়াতে পারে না। এক আধটা পয়সা যখনই পেতাম তা নিয়ে আমি অমনি ছুটতাম মোড়ের মুদির দোকানটায়। এক বাক্স ভ্যানিলা ওয়াফারস্ রুটি কিনে নিতাম পয়সাটা দিয়ে। আস্তে আস্তে পা ফেলে তারপর বাড়ি ফিরতাম। কেন না, পথে সবটা শেষ করে না নিলে বাড়ি ফিরলে কি জানি হয়তো অপর কাউকেও বখরা দিতে হবে তার থেকে। পথে সবটা খেয়ে নিয়ে সদর দরজার সিঁড়ির উপর বসে বসে আমি তখন ভাবতাম, আর এক বাক্স বিস্কুট যদি পেতাম! আমি তখন এত উৎগ্রীব হয়ে উঠতাম যে খাবার কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে আমায় রীতিমত বেগ পেতে হোত। তৃষ্ণা পাক আর নাই পাক, জল খাবারের অভিনব এক কৌশলও আমি কিন্তু আবিষ্কার করে নিয়েছিলাম। কলের মুখে মুখ লাগিয়ে কলটা আমি খুলে দিতাম পুরো মাত্রায়। কল কল করে জল গিয়ে পড়ত আমার পেটের মধ্যে। টিমটিমে হয়ে উঠত পেটটা।

অনেক সময় ব্যথাও করত কনকন করে। অত্যন্ত কিছু ক্ষণের জন্য হলেও তো পেটটা ভরল।

শুয়োরের কি গরু-বাছুরের মাংস দিদিমাদের বাড়িতে কোনদিনই আসত না। মাংসই হোত কালেভদ্রে। আমরা প্রায় মাছই খেতাম। তাও আবার অসম্ভব রকমের কাঁটা-ওয়ালা মাছগুলো। রুটির মশলাও কোনদিন ব্যবহৃত হোত না। তাতে নাকি রাসায়নিক পদার্থ থাকে মিশান। শরীরের ক্ষতি করে ভয়ানক। চর্বি দিয়ে রুটি তৈয়েরী করার পর যে তলানি পড়ে থাকত তাই মিশিয়ে আমি ছাতুর মণ্ড খেতাম সকাল বেলা। ওটা খেলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার বিশ্রী চোঁয়া ঢেকুর উঠত। হজমের জন্য প্রায় আমাদের খেতে হোত বাই-কার্বনেড্ সোডা। বিকেল চারটের সময় আমি চর্বি মেশান এক প্লেট শাক-সব্জি গিলে নিতাম। কোন কোন রবিবার হয়ত এক ডাইম দিয়ে খানিকটা গোমাংস কিনে আনা হোত। মাংসটা প্রায় হোত বাসি আর পচা। অখাদ্য। চীনা বাদাম ভাজাই ছিল দিদিমার প্রিয় খাবার। মাংসের মত করে তিনি ওই খাবারটা তৈয়েরী করতেন। কিন্তু মাংসের স্বাদ ছিল না।

পরিবারে আমার অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হয়ে উঠল। আমি তখনও পরনির্ভরশীল মাত্র। রবাহূত। এ পরিবারের ধমনীর সঙ্গে একই রক্ত-ধারা বয়ে চলেছে আমার। আমি কিন্তু এঁদের মত আত্মার মুক্তিতে সম-বিশ্বাসী নই। আমার কপালে বুঝি অনন্ত নরক ভোগের বিধানই লেখা আছে! ভগবানের ন্যায় বিচারের উপর অটুট আস্থা রেখে দিদিমা একদিন কথাটা পাড়লেন। মুখ ফুটে জানিয়ে দিলেন, একজন কেবল পাপাত্মার জন্য পরিবারের সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে অমন করে। পড়তে হয়েছে ভগবানের কোপদৃষ্টিতে। তিনি একথাও বারবার জানিয়ে

দিলেন, আমি নাস্তিক বলেই মাকে দীর্ঘ এতদিন ধরে রোগে কষ্ট পেতে হচ্ছে। এই ধরণের ভীতি প্রদর্শনে আমি অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তাঁদের পরমার্থিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা আমার মনে কোন দাগই কাটত না।

দিদিমা তবু কিন্তু হাল ছাড়লেন না। আমায় দলে টানবার জন্য সাঙাৎও তাঁর একজন জুটে গেল। তিনি হলেন অডি মাসী। দিদিমার সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা।

অডি মাসী আলাবামার হাণ্টস্‌ভিলের 'এ্যাড্‌ভেনটিস্ট'দের আশ্রমের পাঠ সমাপ্ত করে ফিরেছেন সবে মাত্র। বাড়ি এসে তিনি ওজর তুললেন, আমায় যদি তাঁদের ভরণ-ভোষণ করতে হয়, এ বাড়ির রীতি-নীতি চাল-চলন আমাকেও তাহোলে মেনে চলতে হবে। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন, আর কোন সাধারণ ইস্কুলে না পাঠিয়ে মঠের পাঠশালা খুললে আমার যেন নাম লিখিয়ে দেওয়া হয় সেখানে। আমি মহা ফাঁপড়ে পড়লাম। এ প্রস্তাবে রাজী না হলে আমায় শুধু মহা বিধর্মীই হতে হবে না, নির্মম অকৃতজ্ঞও। তবু আমি আপত্তি ও প্রতিবাদের ঝড় না তুলে ছাড়লাম না। কিন্তু যখন মাও দিদিমাদের হয়ে সায় দিলেন, আমাকে তখন সব বিধান মেনে নিতে হোল।

মঠের পাঠশালা খুলল। আমায় দেওয়া হোল ভর্তি করিয়ে। মনটা আমার খিঁচিয়ে উঠল। পাঁচ থেকে উনিশ পর্যন্ত নানান বয়সের সব শুদ্ধ মাত্র বিশটি ছাত্র। অ-আ থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররাও রয়েছে তার মধ্যে। মাত্র একখানা ঘর। সবাই গিসগিস করছে তার মধ্যে। অডি মাসীই হলেন এখানকার শিক্ষয়িত্রী। প্রথম দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার তিক্ত ও উৎকট এক বিরোধ দিল দেখা। অডি মাসী পড়াচ্ছেন এই প্রথম। সশংক ও আত্মসচেতন ছিলেন তিনি ভয়ানক। অবশ্য এর

কারণও ছিল। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমি এমন একজন রয়েছি যে হোল তাঁর পরম আত্মীয়। একই রক্তের সম্বন্ধ এর সঙ্গে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে না তাঁর ধর্মে কি কর্মে। তাই আমি যে একজন মহাপাপী, আমাকে যে তিনি সমর্থন করেন না এবং কোন প্রকার সহানুভূতির পাত্রও যে আমি নই—এ কথটা বুঝি তিনি তাঁর প্রত্যেকটা ছাত্র-ছাত্রীকে সমঝিয়ে দিতে হয়ে উঠলেন বদ্ধপরিকর।

এক দল ভেড়ার মত এখানকার সব ছাত্ররাই যেন বশ্য আর নিরীহ ধরণের। পাঠশালায় অপর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার, নিজেকে জোর করে জাহির করবার যে উদ্দাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়, যার ফলে চাক্ষুস পরিচয় ঘটে বাস্তব পৃথিবীর, তার যেন একান্ত অভাব এদের মধ্যে।

এখানকার ছেলে-মেয়েরা সবাই নির্জীব, নিষ্পাপ। কথা বলে যেন যন্ত্রচালিতের মত। আশা নেই ভরসা নেই। রাগ অভিমান কিছুই নেই। হাসির লেশটুকু নেই মুখে। কেমন যেন হতাশ, নিস্পৃহ। ব্যক্তিত্বের জৌলুস থেকে বঞ্চিত। সে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাদের দেখতে গেলাম, তাদের কাছে তা একেবারে নতুন—ধারণারই অতীত। এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ওরা বুঝি জারিত হয়ে উঠেছে একান্তভাবে। নিজেদের আবেষ্টনির গণ্ডি ছাড়া আর যেন কিছুই ভাবতে পারে না। কল্পনা করতে পারে না। আমি কিন্তু এসেছি সম্পূর্ণ এক নতুন জগত থেকে। ছোট বেলা আমার কেটেছে মদের দোকানের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে। কেটেছে কারখানা ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে। রেল লাইনের পাশ থেকে আমায় নিতে হয়েছে পোড়া কয়লা কুড়িয়ে। রাস্তার ভবঘুরে ছেলেদের সঙ্গে কেটেছে আমার বহুদিন। কেটেছে অনাথ আশ্রমে আর মিসিসিপি নদীর বাঁকে। এক

শহর থেকে আর এক শহরে, এক বাড়ি থেকে অপর বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আমাকে হয়েছে কাটাতে। সমান তালে মিশে যেতে হয়েছে আমায় বড়োদের সঙ্গে। অশ্রাব্য গালাগালির অনেকটা হয়ত আমায় আজ ভুলে যেতে হয়েছে। কিন্তু সবটা এখনও ভুলিনি। অডি মাসী তাতেই নিশ্চয় তাজ্জব বনে যাবেন। দু কানে আঙুল দেবেন।

পাঠশালায় ভর্তি হবার প্রথম সপ্তাহটা প্রায় কেটে গেল। অডি মাসীর সঙ্গে আমার যে বিরূপ দ্বন্দ্ব এতদিন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল এবার বুঝি তা জ্বলে উঠল দপ করে। উপাসনা ঘরের মধ্যখানের শরু পথ ধরে একদিন বিকেল বেলা তিনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে। একটা রুল বাগিয়ে বলে উঠলেন :

'এ সব তুমি ভালো করেই জানো ?

'কি সব !' অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'মেঝের দিকে একবার চেয়েই দেখো ?'

আমি এবার তাকালাম মেঝের দিকে। দেখলাম টুকরো টুকরো এক রাশ আখরোটের দানা ছড়িয়া আছে আশে পাশে সর্বত্র। পরিষ্কার ধবধবে পাইন বোর্ডটায় গায়েও লেগে আছে কিছুটা। এসব কাণ্ডখানা কার আমার দেখেই মনে পড়ল অমনি। আমার পাশে যে ছেলেটা বসেছিল সেই খাচ্ছিল আখরোট। আমার পুরিয়াটা এখনও আস্ত রয়েছে পকেটে।

'আমি তো কিছু জানি নে।'

'ক্লাশে বসে বসে খেতে তুমি জানো ভালো করেই।'

'আমি তো খাই নি।'

'মিথ্যে কথা বলো না ! এটা কেবল পাঠশালা নয়, গীর্জার পীঠ-স্থানও।' ক্রোধ আর অবজ্ঞায় ফেটে পড়লেন অডি মাসী।

'এই দেখুন না অডি মাসী, আমার আখরোধ তো সবটা আমার পকেটেই আছে।'

'আমার নাম মিস্ উইলসন!' তিনি প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছাড়লেন।

নিশ্বব্দে মুখ তুলে আমি তাকালাম তাঁর দিকে। সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি এবার যেন আঁচ করলাম অনেকটা। ক্লাশে তাঁকে মিস্ উইলসন বলে ডাকতে তিনি আমায় বলেছিলেন বার বার। আমি তাঁকে প্রায় ওই নামেই ডাকতাম। কেন না, অডি মাসী বলে ডাকলে পাছে ছাত্রদের কাছে তাঁকে খাটো করা হয়, মনে মনে তাঁর এই ছিল আশঙ্কা। উনি যে আমার মাসীমা হন একথা কিন্তু প্রত্যেকটি ছাত্রই জানত আমার চাইতে ভালো করে। বললাম:

'দুঃখিত'। আমি বই নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসলাম।

'রিচার্ড্, উঠে দাঁড়াও!'

আমি কিন্তু তবুও বসে রইলাম। বইখানা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলাম। কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই। ছাত্ররা সব উৎকীর্ণ হয়ে রইল পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। আখরোট তো আমি খাই নি। অডি মাসী বলে ডেকেছি বলে মাপও চেয়ে নিয়েছি। তবু মিছিমিছি কেন শাস্তি নিতে যাব আমি মাথা পেতে? তাছাড়া আমার সামনে যে ছেলেটি বসেছিল দোষটা যখন তারই, আমি আশা করছিলাম, সে বুঝি মিথ্যে কোন ফন্দি বাতলাচ্ছে এতক্ষণ আমাকে বাঁচাবার জন্য।

'দাঁড়াতে বলছি না?' অডি মাসী আবার চীৎকার করে উঠলেন।

বই-এর উপর চোখ রেখে আমি তবু বসে রইলাম ঘাড় গুঁজে। আমার জামার কলারটা ধরে সহসা তিনি একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

আসন থেকে ফেলে দিলেন ধাক্কা দিয়ে। হুমড়ি খেয়ে আমি পড়ে গেলাম মেঝের উপর।

'কই, শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমাকেই বলছি উঠে দাঁড়াতে।' উচ্চ কণ্ঠে আবার হেঁকে উঠলেন অডি মাসী।

আমি এবার সিধে মুখ তুলে তাকালাম। ঘৃণায় কুঁচকে উঠল আমার চোখ মুখ।

'অমন করে তাকাস নে ডেপোঁ ছোঁড়া কোথাকার!'

'আখরোট আমি ফেলেছি নাকি মেঝেতে!'

'কে ফেলেছে?'

রাস্তায় আমাদের দলীয় বিধি-নিষেধ সব মনে পড়ল। পাঠ-শালার কোন সহপাঠীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে পারি না কিছুতেই। সামনের বেঞ্চির ওই ছেলেটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আশা করছিলাম, মিথ্যে ফন্দি ফিকির কিছু একটা ঠাউরে ও হয়ত এগিয়ে আসবে আমায় বাঁচাতে। ইতিপূর্বে আমাকেও দলের ঐক্য বজায় রাখতে কতদিন মিছি মিছি শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে অপরের জন্য। এখানকার ছেলেদের নিকটও ঠিক তেমনি আশা করছিলাম। কিন্তু পীঠস্থানের এই আশ্রম বালকটির মুখ দিয়ে সামান্য একটা রাও বেরুল না।

'আমি জানি নে।'

'যাও ওদিকে!'

দরজার দিকে যেতে আমায় আদেশ করলেন অডি মাসী। আমি তাঁর ডেস্ক-এর দিকে এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে পা ফেলে। ভেবে-ছিলাম, তিনি বুঝি আমার কিছুটা উপদেশ শুনিয়ে দেবেন মিষ্টি কথায়। কিন্তু ঘরের কোণ থেকে সরু লিকলিকে এক গাছা বেত নিয়ে তাঁকে

এগিয়ে আসতে দেখে বুকটা আমার কেঁপে উঠল ভয়ে। মেজাজ গেল বিগড়ে। চীৎকার করে বলে উঠলাম :

'আমি তো ফেলিনি!'

শপাং করে তিনি আমায় এক ঘা বসিয়ে দিলেন। পাশ কেটে আমি পালিয়ে গেলাম।

'এই, দাঁড়াও বলছি চুপ করে।' চোখ মুখ দিয়ে তাঁর যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে আগুন। থর থর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

অডি মাসীর চাইতে আমার পিছনে বসে থাকা আশ্রম বালকটির ব্যবহারটায় মুসড়ে পড়লাম আমি অধিকতর। চুপ করে দাঁড়ালাম।

'হাত বাড়িয়ে দাও ইদিকে!' ডান হাতখানা আমি বাড়িয়ে দিলাম সিধে। হাত আর খালি পায়ের উপর সমানে তিনি পিটিয়ে চললেন শপা শপ্ করে। হাতখানা আমার টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। পা ফুলে গিয়ে হোল কালচে রোঁয়া রোঁয়া। দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। মুখ দিয়ে একবার টুঁ শব্দটিও করলাম না। অডি মাসী ক্ষান্ত হবার পরও হাতখানা আমি আগের মত বাড়িয়ে ধরলাম। সমঝিয়ে দিতে চাইলাম, তাঁর অমন শাস্তিটাতেও আমি ঘাবড়ে যাইনি একটুও। দাগ কাটে নি একটুও আমার মনে। মুখের দিকে তাঁর আমি তাকিয়ে রইলাম স্থির, অপলক দৃষ্টিতে।

'হাত নামিয়ে নাও।' অডি মাসী আদেশ দিলেন। বললেন, 'বস গে যাও নিজের জায়গায়।'

আমি এবার হাতখানা নামিয়ে নিলাম। তারপর ফিরে দাঁড়ালাম। হাতটা আমার জ্বলছে তখনও। যেন কাঠ হয়ে গেছে শরীরটা। রাগে গজ গজ করতে করতে আমি নিজ জায়গার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'না, সাজা তোমার এখনো হয়নি দেখছি,' তিনি বলে উঠলেন পিছন থেকে।

এটা তাঁর বাড়াবাড়ি। চোখ-মুখ লাল করে আমিও এক সময় কখন রুখে দাঁড়ালাম,।

'না, এখনো তোমার সাজা হয় নি!' আমি তাঁকে ভেঙিয়ে উঠলাম।—'কেনো কী করেছি আমি আপনার?'

'বোস চুপ করে!' মাসীও হেঁকে উঠলেন।

বসে পড়লাম। না, আর নয়। মার আর খাবো না কিছুতেই। এর চাইতেও নৃশংসভাবে আমি যে কখনও মার খাইনি, এমন নয়। আমি কিন্তু তখন সব সময় ভাবতাম, কোন অন্যায় আমি নিশ্চয় করেছি। শাস্তিটা তাই ঠিকই হয়েছে আমার—উপযুক্ত হয়েছে সাজাটা। কিন্তু এই প্রথম নিজেকে আমি বড়োদের সমান বলে মনে করতে শিখলাম। প্রথম উপলব্ধি করলাম : অন্যায়ভাবে আজ বিনা অপরাধে আমায় শাস্তি পেতে হ'ল। ইস্কুলে আমার আখরোট খাওয়া নিয়ে অডি মাসীর অত মাথা ব্যথা কেনো, আমি এবার অনেকটা আঁচ করলাম। এখানে আমার উপস্থিতিতে তাঁর অবস্থা কি হয়ে উঠেছে বিপন্ন? এই ভেবেই কি তিনি আমায় অমন করে শাস্তি দিলেন? তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ছাপ রেখে যাক ব্যাপারটা, এই কি তিনি চান? সারাটা বিকেল বেলা আমি কাটালাম এসব ভেবে ভেবে। এখান থেকে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় আরও নানান মতলব ঠাওরাতে লাগলাম।

অডি মাসীর পূর্বেই আমি বাড়ি এসে পৌঁছেছিলাম। বাড়িতে পা দিয়েই তিনি আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম, নতুন এক গাছা বেত নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমার সর্ব শরীর যেন জ্বলে উঠল।

'আমায় আবার মারবে নাকি ?'

'ভদ্রভাবে কি করে কথা বার্তা বলতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

আমি এবার রুখে দাঁড়ালাম মারমুখো হয়ে। আমার শৈশবের অসহায় দুর্বলতা, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ভেসে ভেসে বেড়ানোর অনিশ্চয়তা এবং হয়ত এমনও হতে পারে, যে অত্যাচার আর নির্যাতন আমি স্বচক্ষে দেখেছি ও সয়েছি, তারা যেন আজ পুঞ্জীভূত প্রতিবাদে কণ্ঠ ছাপিয়ে আমার গর্জে উঠল। খাবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে এক-খানা ছোরা বার করে নিলে কেমন হয় ? আত্মরক্ষা করা হবে তা হোলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমি পিছিয়ে এলাম। আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তো আর পর নন আমার। আমারই আপন মাসীমা। মার বোন। দিদিমার মেয়ে। তাঁরই নিজ রক্ত ধারা আমার ধমনীতে বয়ে চলেছে। তাঁর ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে আমারই প্রতিকৃতি অনেকটা। কথা-বার্তায় তাঁর মিশে আছে আমারই কথার অনুরণন। নৃশংস হতে পারি না আমি তাঁর কাছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর নিকট মারও খাবো কেনো মিছামিছি ? বলে উঠলাম :

'আপনি ঠিক পাগল হয়ে গেছেন তাই অমন করছেন !'

'কি, পাগল হয়েছি ?'

'পাগল না কি ?'

'মুখ সামলে কথা বলো !'

'হ্যাঁ, মুখ সামলে কথা বলবে ! মেঝেতে আখরোট ফেলেছি বলে আমায় মারছেন, কিন্তু আমি ফেলেছি নাকি ?'

'তবে কে ফেলেছে ?'

খেপেই গিয়েছিলাম। আশপাশেও কেউ নেই। দলীয় বাধ্য-বাধকতা

সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিলাম দূরে। অপরাধী সেই ছেলেটার নাম বলে ফেললাম এবার।

'আগে তবে বলিস নি কেনো ?' অডি মাসী প্রশ্ন করলেন।

'কারো নামে আমি লাগাতে চাই না।'

'তা হোলে তখন তুই মিথ্যে কথাই বলেছিস, কেমন ?'

আমি চুপ করে রইলাম। কি করে তাঁকে বোঝাব আমাদের দলীয় ঐক্যের বিধি-নিষেধের মূল্য কতখানি।

'হাত পেতে দে !'

'কেন, আমায় আবার মারবেন নাকি ? আমি তো ফেলি নি !'

'মিথ্যে কথা বলার এবার শাস্তি পেতে হবে !'

'না, মারবেন না বলছি ! মারলে কিন্তু আমিও দেখে নেবো।'

অডি মাসী এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই এক ঘা তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। আঘাতটা কোন রকমে এড়িয়ে গিয়ে পাশ কেটে আমি আশ্রয় নিলাম ঘরের এক কোণায়। অডি মাসী আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার উপর। শপাং করে আর এক ঘা বসিয়ে দিলেন মুখের উপর। আমি লাফিয়ে উঠলাম চীৎকার ছেড়ে। ড্রয়ারটার দিকে ছুটে গেলাম পাশ কেটে তাঁর। হেঁচকা এক টানে খুলে ফেললাম ড্রয়ারটা। সশব্দে ওটা ছিটকে পড়ল মেঝের উপর। একখানা ছোরা তুলে নিয়ে আমি বাগিয়ে ধরলাম অডি মাসীর দিকে। চীৎকার করে বলে উঠলাম :

'থামুন বলছি !'

'ছোরা রেখে দে !'

'আগে বেরিয়ে যান এখান থেকে, নইলে কেটে আপনাকে আমি আজ দুখান করব !'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কথা কাটাকাটি শুরু করলেন। সাহস করে একসময় তেড়ে এলেন আমার দিকে। ছোরাখানা আমিও বাগিয়ে ধরলাম তাঁর দিকে। অডি মাসী এসে আমার হাতখানা ধরলেন ঝাপটে। তাঁর কবল থেকে ছোরা খানা ছিনিয়ে নিতে আমি রীতিমত শুরু করে দিলাম ধস্তাধবস্তি। ডান পাটা তাঁর পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এক ধাক্কা দিলাম তাঁকে আচমকা। পা ফসকে তিনি পড়ে গেলেন। আমি শুদ্ধ গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে। আমার চাইতে অডি মাসীর গায়ের জোর অনেক। ক্রমশ আমি কাবু হয়ে পড়তে লাগলাম। ছোরাখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তিনি তখনও উঠে পড়ে লাগলেন মরিয়া হয়ে। তাঁর চোখে দেখলাম, খুনে বন্য এক দৃষ্টি! ছোরাখানা একবার হাত করতে পারলেই তিনি বুঝি তা আমূল বিঁধিয়ে দেন আমার বুকে! হাতখানা তাঁর আমি কামড়ে দিলাম। পরস্পর পরস্পরকে লাথি মেরে, খামচি কেটে, আঘাত করে আমরা দুজন মারামারি করে চললাম সমানে মেঝের উপর গড়াতে গড়াতে। আমরা দুজনই যেন অজানা, অপরিচিত। পরস্পর পরস্পরের পরম শত্রু। প্রাণের দায়ে তাই বুঝি আজ লড়াই করে চলেছি মরিয়া হয়ে।

'আমায় ছেড়ে দিন', আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'রেখে দে ছোরাটা!'

'ছেড়ে দিন আমায় নইলে আজ মেরে ফেলব একেবারে।'

দিদিমা ছুটে এলেন। থ' বনে গেলেন আমাদের কাণ্ড দেখে।

'অডি, কি হচ্ছে এ সব?'

'ছোরা নিয়েছে দেখো না,' অডি মাসী হাঁপাতে লাগলেন। 'রেখে দিতে বলো ওটা।'

'রিচাড্ ছোরাটা দিয়ে দাও!' দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাও এসে পড়লেন দোরগোড়ায়। তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন :

'কি হচ্ছে রিচার্ড্, থাম!'

'না, থামব না! আমায় মারতে দেবো না ওঁকে!'

'অডি, ওকে ছেড়ে দে!' মা অনুনয় করলেন।

আমায় ছেড়ে অডি মাসী উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। ছোরা-খানার উপর চোখদুটি তাঁর পড়ে রইল তবুও। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন রান্নাঘর থেকে। যাবার সময় দরজাটা হাঁ করিয়ে খুলে গেলেন লাথি মেরে।

মা ছোরাখানা চাইলেন। বললেন : 'ওটা আমায় দে তো, রিচার্ড!'

'না মা, তাহোলে উনি আমায় মারবেন—মিছিমিছি শুধু মারছেন আমায়।' আমি জানিয়ে দিলাম, 'আমায় মারতে দেবো না ওঁকে। না, কিছুতেই না—যাই থাক কপালে!'

দিদিমা কেঁদে ফেললেন : 'রিচার্ড্, তুই অমনটা পাজি হয়ে গেছিস!'

ঘটনাটা আমি তাঁদের সবিস্তারে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম। কেউ কিন্তু শুনলেন না। ছোরাখানা নেবার জন্য এগিয়ে এলেন দিদিমা। ঘাই মেরে আমি পালিয়ে গেলাম পেছনের উঠানে। পেছনের সিঁড়ির উপর আমি বসে রইলাম একা একা। থর-থর করে কাঁপাতে লাগল আমার সর্বাঙ্গ। যেন ঝড় বয়ে চলেছে বুকের মধ্যে। কান্না এল বুক ভেঙে। দাদামশাইও নেমে এলেন উপর থেকে। অডি মাসী গিয়ে নিশ্চয় বলে এসেছেন তাঁকে সব ব্যাপারটা।

'ছোরাটা আমায় দাওতো দেখি, ভায়া!', দাদামশাই এসে বললেন।

'সে তো আমি কখন দিয়ে দিয়েছি।' ছোরাশুদ্ধ হাতখানা পেছনে লুকিয়ে আমি তাঁকে বললাম স্রেফ মিথ্যে কথা।

'কি হলো তোমার?'

'উনি আমায় থামাকা মারলেন কেনো?'

'ছোকরা, তুমি যে এখনও ছেলেমানুষ!' হেঁড়ে গলায় তিনি উত্তর দিলেন।

'তাই বলে মারবেন কেনো?'

'করেছিলে কি?'

'কিছুই না।'

'জলের মত মিথ্যে কথা বলতে তোমার মুখে একটুও দেখি আটকায় না'। দাদামশাই বলে চললেন। 'বাতটায় আমি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছি। নইলে কিন্তু এক হাত দেখে নিতাম। জামা ছাড়িয়ে নিয়ে লাল করে দিতাম তোমার পিঠটা। ওই টুকুন এক রত্তি ছেলে—দুধ গেলে এখনও নাক দিয়ে, সে কিনা তেড়ে আসে লোককে ছোরা নিয়ে!'

'উনি আমায় মারতে আসেন কেনো?'

'ভারী বদ হয়ে উঠেছ তো দেখছি।' দাদামশাই বলে চললেন। 'এবার থেকে সাবধানে চলা ফেরা করো হে ছোকরা, নইলে ফাঁসি-কাষ্ঠে গিয়েই তোমায় লটকাতে হবে একদিন।'

দাদামশাইকে অনেক দিন থেকে আমি আর ভয় করতাম না। রুগ্ন এক অথর্ব বৃদ্ধ। বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন খবরই তিনি রাখেন না। বাড়ির কাউকে ভয় দেখাতে হলে মেয়েরা তাঁকে নিয়ে আসত টানা হেঁচড়া করে। কিন্তু তিনি যে অসুস্থ, দুর্বল

সে খবর আমি রাখতাম। তাই আমি একটুও ভয় পেতাম না। তিনি তাঁর ঘরে দিনরাত বসে থাকতেন মশগুল হয়ে আর কেবল স্বপ্ন দেখতেন ফেলে-আসা-তাঁর-মধুছন্দা-যৌবনের-বিস্মৃত দিনগুলির। 'গৃহ যুদ্ধে'র আমলের ভরা বন্দুকটা এখনও রয়েছে ঘরের এক কোণায়। ইউনিয়ন আর্মির নীল রঙের সামরিক পোষাকটাও তুলে রাখা হয়েছে পরিপাটি করে গুছিয়ে।

পরাজয়টা অডি মাসীর বুকে বুঝি বিঁধেছিল গভীর হয়ে। তিনি আমায় এড়িয়ে চলতে লাগলেন ঘৃণা আর নীরব উপেক্ষায়। আমার উপরে কর্তৃত্ব করবার প্রচেষ্টায় তিনি যখন আমার সমপর্যায়ে নেমে এসেছেন টের পেলাম, ভক্তি শ্রদ্ধা সব তখন আমার উবে গেল তাঁর উপর থেকে। বছর কয়েক পরে তাঁর অবশ্য বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে—যদিও একই টেবিলে বসে আমরা খেতাম, একই ঘরে একই ছাঁদের নীচে আমরা দুজনে ঘুমাতাম, তবুও কথাবার্তা আমাদের প্রায় বন্ধই ছিল একরূপ। হলেনই বা তিনি গীর্জার সম্পাদিকা আর আশ্রম-মঠের অধ্যক্ষা। আর আমি হলাম ভয়-কাতুরে রোগা, পাঁশুটে একটা ছেলে মানুষ মাত্র।

গীর্জার বিদ্যাপীঠে আমি তবু রয়ে গেলাম আগেকার মত। অডি মাসী আমায় কোনদিন পড়া জিজ্ঞেস করতেন না। বোর্ডে যেতেও বলতেন না ভুলে। ফলে পড়াশুনায় আমি একরূপ দিয়ে বসলাম ইস্তফা। ছেলেদের সঙ্গে খেলেই কাটিয়ে দিতাম সব সময়টা। নৃশংস নিষ্ঠুর প্রকৃতির খেলাধুলাগুলিই কেবল ভালোবাসে এখানকার ছেলেরা। ব্যস্‌বল, মার্বল, বক্সিং, দৌড়াদৌড়ি খেলা তাদের কাছে নিষিদ্ধ। এ সব খেলাধুলা নাকি শয়তানের সহচর। খেললে পাপ হয় নাকি। তার পরিবর্তে ওরা খেলত 'পপিং-দি-হুইপ।'

ধাঁ করে সটকে বেরিয়ে যাওয়াই হোল এই খেলার মজাটি। তাতে কিন্তু বিপদও আছে। ছিটকে পড়ে প্রাণান্ত হবারও আছে সম্ভাবনা। ইস্কুল মাঠে আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে অডি মাসী অমনি 'পপিং-দি-হুইপ্' খেলতে আদেশ করতেন। এর পরিবর্তে তিনি যদি আমাদের কোন শোক-গাথা গাইতে বলতেন, তাহোলে বুঝি আমাদের দেহ আর আত্মার সংগতি হোত আরও অধিক মাত্রায়!

একদিন দুপুর বেলা 'পপিং-দি-হুইপ্' খেলতে আদেশ করলেন অডি মাসী। এর পূর্বে আমি কোনদিন 'পপিং-দি-হুইপ' খেলি নি। পরম উৎসাহে তাই খেলছিলাম। একে অপরের হাত ধরে দীর্ঘ হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম মুক্তো ছড়ার মত। আমি যে একেবারে শেষ প্রান্তে ছিলাম খেয়াল ছিল না। আগার ছেলেটা এঁকেবেঁকে হঠাৎ দুলকি চালে ছুটতে শুরু করে দিল। ক্রমশ বেড়ে চলল তার তোড়। পিছনের ছেলেদের মুক্তোছড়াটাও ছুটতে শুরু করে দিলে এঁকে বেঁকে, লাফিয়ে লাফিয়ে। ছিটকে বুঝি পড়ে যাবো এক্ষুনি। আমি ঠিক আমার আগেকার ছেলেটার হাতখানা আঁকড়ে ধরলাম প্রাণপণে। গতি বেড়ে চলল আরও। হাত দুটি আমার কনকন করে উঠল। মনে হোল এক্ষুনিই বুঝি খসে পড়ব। দমও আটকে এল সহসা। বোঁ বোঁ করে সামনে ঘুরে চলেছে মুক্তো ছড়াটা। আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না। শূন্যে চক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলাম এক খাদের মধ্যে গড়াতে গড়াতে। মাথায় চোট লাগল প্রচণ্ড। দরদর করে রক্ত ছুটল ক্ষত স্থান দিয়ে। কিন্তু দেখে আমায় ফিক্ করে হেসে ফেললেন অডি মাসী। গীর্জায় আমি তাঁকে এই প্রথম এবং শেষবারের মত হাসতে দেখলাম!

দিদিমার পূজা আহ্নিকের কড়া বিধি-নিষেধ কায়েমী ছিল বাড়িতে। উদয়াস্ত দু-বেলাই এবং সকাল আর রাত্রিতে খাবারের সময় পরিবারের কেউ পাঠ করে যেতেন বাইবেল। তারপর রীতি ছিল উপাসনা করার।

এছাড়াও রাত্রিতে ঘুমোবার পূর্বে আমি অন্তত একবার উপাসনা করি বলে তাঁদের ধারণা ছিল। সপ্তাহের মধ্যবর্তী দিনগুলিতে গীর্জায় গিয়ে হাজিরা দেয়াটা আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম যতখানি সম্ভব। ওজর তুলতাম আমায় লেখাপড়া করতে হবে। অবশ্য আমার কথা কেউ বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না। তবে এ নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ করতেও কেউ চাইতেন না। উপাসনাটা সত্যি সত্যি এক পীড়াদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল আমার কাছে। দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে অমন করে বারবার হাঁটু গেড়ে উপাসনা করতে হয় বলে হাঁটু দুটি আমার ফুলে উঠল ডোল হয়ে। তাই আমি এক নতুন ফন্দি বাতলে নিলাম অনেক চেষ্টা চরিত্তি করে। সুবিধে মত একটা কোণ বেছে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দুপায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করে এমন ভাবে ঝুঁকে থাকতাম, এক ভগবান ছাড়া, আমার মনে হয় কেউ বুঝি আর টেরই পেত না ঘুর্ণাক্ষরে! আর স্বয়ং ভগবানও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন কিনা আমার সন্দেহ ছিল।

প্রায় সারা রাত্রি ধরে অনেক দিন চলত পূজা-আর্চা হোম-উপাসনা। দিদিমা চাইতেন এ সবে আমিও এসে যোগ দিই। কেন না, তিনি হলেন তাঁদের গীর্জার প্রাচীনতম সভ্যা। তাঁর একমাত্র দৌহিত্র হয়ে এসব ব্যাপারে আমার অংশ গ্রহণ না করাটা কেমন যেন অশোভন দেখায়। তা ছাড়া তিনি ভাবতেন এসব ধর্মে কর্মে আমার একটু আধটু মতিগতি হোলে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের গোঁড়ামিতে আর

কারো কোন সন্দেহই থাকবে না। অপরকেও যে তিনি তাঁর স্বধর্মে দীক্ষিত করে তুলতে পারেন, তাও বুঝি হয়ে যায় প্রমাণ।

সারা রাত্রির সেই হোমের জন্য দিদিমা, অডি মাসী আর আমি তখন বেরিয়ে পড়তাম। মা আর দাদামশাই কেবল বাড়িতে থাকতেন। উদাত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে যতক্ষণ ধরে উপাসনা আর অর্চনা চলত, আমি ততক্ষণ এক বেঞ্চির উপর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতাম চুপটি করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসলীলার তত্ত্বকাহিনী ভেসে আসত কানে। আমি কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সাড়া দিতাম না। বড়ো হয়ে উঠে পালিয়ে গিয়ে এখান থেকে কখন নিষ্কৃতি পাব তাই ভাবতাম। কমগন্ধী উপাসনা সংগীত-গুলো যে ভালো লাগত না আমার এমন নয়। তবু দিদিমার মুখের দিকে চোরা চোখ তুলে আমি বারবার তাকাতাম আর ভাবতাম, এসব ঝামেলার পাঠ শেষ হলেই বাঁচা যায়। আমি তাহলে হাত-পা ছড়িয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই বেঞ্চিটার উপর। দশটা কি এগারোটার সময় খানকয়েক স্যানডুইস্ আমি চিবিয়ে নিতাম। দিদিমা তখন মাথা নেড়ে অনুমতি দিতেন আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে। কিন্তু ঘুম প্রায়ই ভেঙে যেত। উপাসনা সংগীতের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কয়েকটা কলি এসে তখন পৌঁছত আমার কানে। ঘুম পাড়িয়ে দিত আমায় আবার। দিদিমা এসে যখন আমায় জাগিয়ে দিতেন চেয়ে দেখতাম কাঁচের জানালা দিয়ে তখন সোনালি রোদ এসে গুঁড়িয়ে পড়েছে মেঝের উপর।

পরমার্থিক এসব অনেক ব্যাপারই ভাবপ্রবণ আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীর ভাবে। দিদিমাদের গীর্জার এই শিক্ষা দীক্ষাই আমার জীবনের নাটকীয় দৃষ্টিকোণকে বুঝি উজ্জীবিত করে তুলেছিল। ইহ-লৌকিক জগতের মোক্ষম একমাত্র চিন্তা নিয়ে দিনের পর দিন চব্বিশটা ঘণ্টা যাকে বিব্রত ও বিপন্ন থাকতে হয়, মানুষ মাত্রই যার নিকট ধীর

নিঃশব্দ মৃত্যুর পথযাত্রী মাত্র, জীবনকে সে ভালোবাসবে নিবিড় করে, সংবেদনশীল হয়ে উঠবে তার মন—তাতে আর আশ্চর্যের কি! প্রবুদ্ধ আবেগময় এই বিশ্বাসে আমি কিন্তু জারিত হয়ে উঠলাম না। জীবনের শুরু থেকেই যদি আমি এই আশ্রম পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে উঠতাম, তা হোলে হয়ত তাকে সহজভাবে মাথা পেতে নিতে আমার কোন বেগ পেতে হোত না। কিন্তু ভগবানের এই মহিমা কীর্তি আর বন্দনাগীতি আমার নিকট যখন এসে পৌছল তার বহু পূর্বেই জীবনের নানান বৈচিত্রময় ঘাত প্রতিঘাতে আমার শিশু হৃদয়ের কাঁচা মাটী পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। খাত বেছে নিয়েছে সে তখন নিজ ব্যক্তিত্বের। আমার মনে হোত, গীর্জার ধর্ম জীবন যা কিছু আমায় দেবার ছিলো, আমি যেন আগেই সবটা পেয়ে গেছি পুরোপুরি। বিশেষ কোন দাগ কাটল না সে আমার মনে।

ছাতুর মণ্ড আর শুয়োরের চর্বির ঝোল খেয়েই দিন দিন আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম দিব্যি। এরজন্য বুঝি দিদিমাদের গীর্জার অলৌকিক শক্তি-মহিমার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমার বয়স তখন বারো। বারো বছরের একটি ছেলের ভাগে যে পরিমাণ খাবার জুটত, সাধারণ আকারের একটা কুকুরও বুঝি তা খেয়ে টিঁকতে পারে না। আমার দেহের গ্রন্থিগুলো যেন হারিয়ে গেল রক্তের মধ্যে। বসন্ত কালে গাছ থেকে যেমন গাজলা বেরোয় বুঝি অনেকটা তার মত। তারই ফলে বুঝি মেয়ে আর স্ত্রীলোকের প্রতি ঔৎসুক্য আমার গেল বেড়ে। এখানকার প্রধানের স্ত্রী উপাসনার সময় গান করতেন। আমি কিন্তু তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। অবশ্য বারো বছরের এক বালক সুদূর অপ্রাপ্য কোন নারীকে যেমন কামনা করে এও তাই। উপাসনার সময় মুগ্ধ অপলক

দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে থাকতাম তাঁর দিকে। ভাবতাম, ও মেয়েটির সঙ্গে আমার যদি বিয়ে হোত। আমি তাঁকে কামনা করতাম একান্ত নিবিড় ভাবে। গীর্জায় উপাসনা করতে এসে নারী দেহের প্রতি আমার এই প্রথম লালসার জন্য আমার মনে একটুও অনুতাপ কি অনুশোচনা জাগে নি। উপাসনা সংগীতের সকরুণ নিসঙ্গতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কামনার উত্তুঙ্গ অঙ্কুর আমার অপরাধী মনকে রাখত অভিভূত করে। রুদ্ধ করে রাখত বুঝি অনুশোচনার দ্বার।

এখানকার সুমধুর বন্দনা সংগীতই বুঝি আমায় কামাতুর করে তুলেছিল এমন করে। কিংবা হয়ত আমার মাথার আজগুবি কল্পনাগুলি মর্শী ঐ উপাসনা সংগীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উৎবুদ্ধ করে তুলেছিল আমায় ভালবাসতে। আমার হৃদয়ের নিবিড় কন্দরে পাপের যে কেউটে সাপটি এতদিন ঘুমিয়ে ছিল কুণ্ডলী পাকিয়ে, আজ যেন কার নির্মম কেশাঘাতে সহসা সে জেগে উঠল। তাকে বুঝি ক্ষুধিত, বুভুক্ষিত করে তুলল আমার উদ্ভট কল্পনা আর এখানকার উপাসনা সঙ্গিতগুলি। এখানকার এই আশ্রম-জীবনই নিশ্চয় আমার হৃদয়ের কামনাকে তুলেছিল কলুষিত করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি যখন প্রধানের স্ত্রীর দিকে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৃথা চেষ্টা করতাম, যখন চেষ্টা করতাম তাঁকে সম্মোহিত করবার, আমার মনের গোপন কথাটি তাঁকে জ্ঞাপন করবার জন্য যখন মরিয়া হয়ে উঠতাম, তখন আমার রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুতে লালসার আগুন জ্বলে উঠত দাউ দাউ করে। যেন কালো একটা বালখিল্য শয়তান: মাথায় তার এক জোড়া সিং; লম্বা কোঁকড়ানো ত্রু ফাঁকড়া একটা লেজ: উলঙ্গ আঁশ আঁশ শরীর; খুরওয়ালা পা, শরু শরু চটচটে আঙুল কটা; স্যাঁত্ স্যাতে লালসাময়

তার ঠোঁট ; কামাতুর চোখ দুটি দিয়ে প্রধানের স্ত্রীকে বুঝি গিলছে সে গোগ্রাসে !······

গীর্জার বিদ্যাপীঠে আমি আর পড়াশুনো করব না বলে অনেক দিন থেকে বলে আসছিলাম জোর গলায়। এখন পাকাপাকি ভাবে জানিয়ে দিলাম। তাই সাধারণ ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার পূর্বে, অর্থাৎ 'মূর্তিময়ী পাপে হাতেখড়ি দেওয়ার পূর্বে' দিদিমা শেষবারের মত একবার চেষ্টা করলেন। মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় আমায় দীক্ষিত করে তুলতে। ধর্মিষ্ঠ পুনরুজ্জীবন হোল আবার শুরু। অডি মাসীর বিরুদ্ধাচরণও আশ্চর্য জনক ভাবে হঠাৎ কমে গেল। কি জানি তিনি বুঝি ভাবলেন, ছোট খাট এসব মান-অভিমানের চাইতেও আমার হৃত হৃদয়ের মূল্য অনেক বেশী। আকার ইঙ্গিতে মাও আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন : 'রিচার্ড, কোন গীর্জায় গিয়ে এবার চিনে নে ভগবানকে !'

আগাগোড়া সমগ্র পরিবারটিই আমার উপর মহাসদাশয় হয়ে উঠল। দোষ করলেও কেউ কিছু বলতেন না। ক্ষমা করে যেতেন সবাই। আকস্মিক এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যটি আমি কিন্তু ধরে ফেললাম। ফলে তাঁদের কাছ থেকে আমি দূরে ছিটকে পড়লাম। সহপাঠীদের অনেকেই নিজ নিজ বাপ মায়ের নির্দেশে এতদিন আমায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। ওরা দেখি এখন গায়ে পড়ে হঠাৎ আলাপ করতে লাগল আমার সঙ্গে। কি কি বলতে তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে আমি কিন্তু ধরে ফেলতাম ধাঁ করে। একটি ছেলে থাকত বড় রাস্তাটার ওপাশে। একদিন বিকেল বেলা সে আলাপ করতে এলো আমার সঙ্গে। ওর আত্মসচেতন মন কিন্তু প্রতারিত করে বসল ওকে। ধর্মের মুখোসপরা আগাগোড়া ষড়যন্ত্রটাই ধরা পড়ল অবশেষে। দিদিমার শেখান বুলিগুলো ছেলেটা আউড়ে গেল যন্ত্রচালিতের মত। বলল :

'রিচার্ড, জানো, তোমার জন্য আমরা সবাই কত চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন?'

'চিন্তিত? আমার জন্য আবার চিন্তিত কারা?' কপট বিস্ময়ে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

'কেনো আমরা সবাই।' চোখ দুটি সে নামিয়ে নিলে।

'কেনো ভাই?'

'তোমার আর উদ্ধার নেই বলে।' সে জবাব দিল বিমর্ষ হয়ে।

'আমি তো দিব্যি খাসাই আছি।' আমি হেসে ফেললাম ফিক্ করে।

'হাসির কথা নয় রিচার্ড্! ব্যাপারটা কিন্তু গুরুতর।'

'বলছি তো, আমি খাসাই আছি!'

'আমি তোমার পরম বন্ধু হতে চাই বলেই এসব বলছি, রিচার্ড্।'

'আমার তো মনে হয় আমরা দুজনে অনেক দিন থেকেই বন্ধু।'

'যীশুখ্রীস্টে খাঁটি ধর্মভ্রাতার কথা আমি বলছি।'

'পরস্পর পরস্পরকে তো আমরা অনেক দিন থেকেই জানি।' শ্লেষ মিশান কণ্ঠে আমি উত্তর দিলাম চাপা গলায়।

'কিন্তু যীশু খ্রীস্টে সমান বিশ্বাসী তো নই?'

'অত সব বুঝিনে ভাই। বন্ধুত্ব নিয়েই কথা আমার কাছে।'

'কিন্তু তুমি কি তোমার আত্মার সংগতি কামনা করো না?'

'ধন্ম-কম্মের কথা আমি ভাই তেমন বড় ভাবি নে।'

'ভগবানের কথা তুমি সত্যি সত্যি কখনো ভেবে দেখো না?'

'না ভাই, ওসব চিন্তা আমার মাথায় কখনও আসে না।'

'ও নিয়ে আর বিশেষ বাড়াবাড়ি করো না রিচার্ড।'

'বাড়াবাড়ি আবার কোথায় হোল?'

'ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করা চলে না!'

'ভগবানের কথা আমি কখনও ভাবি না, বলছি তো তোমাকে।'

'যীশুর আত্মবলিদানের কথা একবার স্মরণ করে দেখো রিচার্ড।' তোমাদের জন্যই তিনি ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন তিলে তিলে।'

'তিলে তিলে এমন ধারা কত লোকই তো মরছে।' ফস করে আমি বলে বসলাম।

'ঠিক তেমন করে নয় ভাই। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।'

'অত সব বুঝে-সুঝেও কাজ নেই আমার।'

'আহা, তোমার জন্য অনুকম্পা হচ্ছে রিচার্ড! তুমি যে দেখছি পৃথিবীর মোহ অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছ। গীর্জায় এসে ধর্ণা দাও ভাই! সন্ধান নাও পথের।'

'বেশ আছি বার বার বলছি তো তোমায়।'

'চল ঘরের মধ্যে যাই। প্রার্থনা করে নিই একবার তোমার জন্য।'

'দেখো, তোমার মনে আমি কোন আঘাত দিতে চাই না...'

'আঘাত দিতে তুমি পারবেও না। ভগবানের হয়েই আমি বলছি।'

'তোমার ভগবানের বিশ্বাসেও আমি কোন আঘাত দিতে চাই না।' মুখ দিয়ে কখন কথাটা খসে পড়ল সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে।

সে বুঝি আহত হোল ভয়ানক। চোখ দুটি একবার মুছে নিল।

আমারও খুব দুঃখ হোল।

'অমন কথা কখ্খনো আর মুখে এনো না। ভগবান তাহোলে তোমায় কোনদিন ক্ষমা করবেন না।' চাপা ফিসফিস করে বলল সে।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি বলা যাবে না ওকে কিছুতেই। ভগবানে আমি বিশ্বাস করি কি করি না, পাকাপাকি আমি তা কখনও ভেবে দেখি নি। তিনি আছেন কি নেই এই নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামিয়েও মরি নি। মনে মনে আমি তর্ক করতাম এই বলে যে, সর্ব-শক্তিমান, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা ভগবান বলে সত্যি সত্যি যদি

কেউ থাকেন, ন্যায়ের চক্ষে যিনি দেখেন সবাইকে, আদি অন্ত যাঁর নখদর্পণে—সত্যি সত্যি ভগবান বলে এমন যদি কেউ থাকেন, তাহোলে নিশ্চয় তিনি জানেন যে আমি তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করি। ভগবান বলে সত্যি কেউ থাকলে আমার এই নির্বোধ আচরণে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতেন। আর ভগবান যদি নাই বা থাকেন তাহোলে ঘটা করে অত কাণ্ডকারখানা করবার কিই বা প্রয়োজন? আমি তো ভাবতে পারি না, বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অত শত কাজকর্ম ফেলে আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মত পর্যাপ্ত সময় আছে ভগবানের!

জীবনে আমায় নানান দুঃখ কষ্ট পেতে হয়েছে। সে স্মৃতি আমার বুকে আজও আছে অঙ্কিত হয়ে। এরপর একান্ত অসহায়ের মত অনন্ত নরককুণ্ডে আমি আবার তলিয়ে যাব বলে ভাবতেই পারি না কিছুতে।

গীর্জায় যাওয়া-আসা করতে বাধ্য হবার পূর্বে ভগবানের অস্তিত্বে আমার একরূপ মৌন সম্মতি ছিল। কিন্তু ভগবানের উদ্দেশে তাঁর প্রিয় ভক্তদের সেবা করার ধরন-ধারণ সব স্বচক্ষে দেখে সে ধারণা আমার গেল উল্টে। দানা বেঁধে উঠল সন্দেহ। প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে খাপ খাইয়ে আছে আমার এই বিশ্বাস। সঞ্চারিত হয়ে আছে আমার দেহের প্রতি চেতনাই। মিশে আছে মনের সঙ্গে আমার ওতপ্রোতভাবে। আমার এই বিশ্বাসকে কিছুতেই মন থেকে ছিনিয়ে নেয়া যাবে না। অদৃশ্য কালান্তক কোন শক্তি এলেও না। ছেলেটাকে বললাম:

'ও সব ব্যাপারে আমি অত ভয় পাই না।'

'ভগবানকে তুমি ভয় করো না?'

'না। ভয় করতে যাব কেনো? আমি তো আর ভগবানের কোন অনিষ্ট করতে যাইনি?'

'ভগবান কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে ছাড়েন না।' আমাকে ও সাবধান করে দিল।

'তাঁকে দয়ালু বলেই আমি তো জানতাম।'

'দয়া-দাক্ষিণ্য তোমার যদি থাকে তিনিও সদয় হবেন তোমার প্রতি।' উত্তর দিলে ছেলেটা। বলল: 'তিনি কিন্তু তোমার দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না যদি তুমি তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করো।'

কথায় কথায় একটা প্রকল্পিত উক্তি করে বসেছিলাম। এই উক্তির মধ্যেই ভগবান আর পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের প্রতি আমার মনোভাবের মোটামুটি একটা ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, আতংক আর একক নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে যে জীবনের সঙ্গে আমার হয়েছে চাক্ষুষ পরিচয়, যাকে আমি পথে ফেলে এসেছি এবং যাকে একান্তভাবে করেছি উপলব্ধি, আমার এ জ্ঞানের উৎস বুঝি তা থেকেই। বললাম: 'আমার এই জীবনটা বিসর্জন দিলে যদি পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট কিছুটা পরিমাণে উপশম হয়, আমি তাই করব। কিন্তু তা কিছুতেই বন্ধ হবে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না।'

সব শুনে গেল সে নীরবে। কোন জবাব দিল না। আমি আরও বলতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম বলা বৃথা। বয়সে আমার চাইতে অনেক বড় সে। কিন্তু জীবনের সে জানেও না কিছু। কোন দিন তলিয়েও দেখে নি সে নিজেকে বিশদভাবে। বাপ মায়ের আদর যত্নে বড়ো হয়ে উঠেছে সে। তাকে শিখিয়ে দিতে হয় সব সময়: কি করতে হবে, কি হবে না। যান্ত্রিক, সত্ত্বাহীন যেন সে! বললাম:

'মিছে রাগ করো না ভাই।'

সে কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল সে আমার কাছ থেকে। দুঃখ হোল।

ছেলেটার সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎ শেষ হতে না হতেই দিদিমার আক্রমণ আবার হোল শুরু। সে গিয়ে বুঝি দিদিমাকে আমার কেলে-ঙ্কারীর কথা সব বলে এসেছে। কেননা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে চললেন তিনি আমার সঙ্গে। বারবার করে আমায় সাবধান করে দিতে লাগলেন এই বলে যে, অনন্ত নরক-কুণ্ডে গিয়ে পুড়ে মরতে হবে আমাকে চিরকালের মত। পুনরুত্থানের মহাদিন যতই নিকটবর্তী হয়ে আসবে, শাস্তির বহর নাকি ততই যাবে বেড়ে। কোন একটা ছুতো করে যখনই রান্নাঘরে ঢুকে পড়তাম, দেখতাম একখানা চেয়ারের উপর মাথা রেখে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছেন দিদিমা। প্রার্থনা করছেন আমার হয়ে। আমি বিচলিত হয়ে পড়তাম। কবে এখান থেকে বিদায় নিতে পারব, তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ভগবানে দীক্ষা নেবার জন্য বারবার সবাই এমন করে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যে তাঁদের মনে আঘাত না দিয়ে উপেক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল আমার পক্ষে। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। ঘৃণার পাত্র না হয়েও কি করে তাঁদের এড়িয়ে যাওয়া যায় তার একটা উপায় বাতলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। না,হার মানছি না আমি কিছুতেই। না হয় বাড়িই ছাড়ব।

দিদিমার মনে আঘাত দিয়ে কি ভুলটাই না করে বসলাম। তাঁকে আহত কি অপমানিত করা আমার কিন্তু আদৌ ইচ্ছে ছিল না। আমার প্রতি দিদিমার হৃত মনোভাবের পুনরুদ্ধার করতেই গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু নিয়তির এমনই বুঝি নিষ্ঠুর পরিহাস, দিদিমার জীবনভর

ধর্ম সাধনার চরম পরাজয় আর লজ্জা অপমানের বোঝাই সে বয়ে আনল তার পরিবর্তে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা উপাসনার সময় ঘটল ঘটনাটি। জ্যাকবের দেবদূত-দর্শনের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন তখন প্রধান মশাই। বসে বসে আমি তাই শুনছিলাম। শুনবার জন্যই বোধ হয় প্রধানের স্ত্রীর উপর থেকে চোখ দুটি নামিয়ে নিয়েছিলাম। তবুও আমার মনের পর্দায় তাঁর মুখখানা ভেসে উঠছিল বারবার। হঠাৎ আমার মাথায় কি একটা যেন খেয়াল চাপল। দিদিমার কাছে গিয়ে হঠাৎ বলতে আমার ইচ্ছে হোল ঃ যদি কোন প্রমাণ পাই, এসব তা হোলে আমি বিশ্বেস করতে রাজি আছি। দিদিমাকে তাই বলতে যাচ্ছিলাম ঃ আমি যদি কোন দেবদূতের দর্শন পাই, তাহোলে ভগবান যে আছেন তাতে আমার আর কোন সন্দেহ থাকবে না। বিনা প্রতিবাদে তখন তাঁর আরাধনা করে যাবো। আমার মনের কথা দিদিমাও বুঝি নিশ্চয় বুঝেছিলেন। কেন না, দেবদূতের সাক্ষাৎ দর্শন যে কোনদিনই পাবো না আমিও তা জানতাম। তাই কথাটা পেড়েছিলাম জোর গলায়। আর দেবদূতের সাক্ষাৎ যদি কোন কালে পেতামও বা, তা হোলে আমি নিশ্চয় ডাক্তারের কাছেই ছুটতাম কাল বিলম্ব না করে। ওইটুকুন সাধারণ বোধ আমার তখনও ছিল। কথাটা আমার মাথায় তাই কিলবিল করে উঠল। আমার আত্মার সৎগতির জন্য দিদিমার মাথাব্যথার উপশম করতে হবে। হৃদয়টা আমার যে এখনো কালাপাহাড়ী গোছের হয়ে পড়েনি, জানিয়ে দিতে হবে তাঁকে। এবং তাঁর আকুল কাকুতি-মিনতি-ভরা কথা আমিও যে শুনি তাও দিতে হবে ভালো করে সমঝিয়ে। তাই কানের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললাম ঃ

'জানো দিদিমা, জ্যাকবের মত আমিও যদি একবার দর্শন পেতাম; তা হোলে আর অবিশ্বাস করতে পারতাম না।'

'জানো দিদিমা, জ্যাকরের মত আমিও যদি একবার ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেতাম, তাহোলে আর অবিশ্বাস করতে পারতাম না।'

দিদিমা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে অবাক-বিস্ময়ে। সহসা তাঁর খাঁজকাটা শুভ্র মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাসিতে। তিনি মাথা নাড়লেন। হাতখানা আমার চাপড়িয়ে দিলেন একবার। যাক, কিছুক্ষণ তো রেহাই পাওয়া যাবে? আমি ভাবলাম। উপাসনা করবার ফাঁকে ফাঁকে দিদিমা বার-কয়েক বুঝি তাকিয়ে নিলেন আমার দিকে। চাপা হাসি হাসলেন। না, আমার আত্মার সংগতির জন্য তিনি যে অত কাকুতি-মিনতি করছিলেন তা বুঝি বৃথাই হয় নি।...এদিকে আমি তখন ভাবছিলাম, আমার পরিকল্পনা দিদিমার মনে বুঝি রেখাপাত করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশুদ্ধ চিত্তে তাই পুনরায় বসে গেলাম প্রধানের স্ত্রীর আরাধনা করতে। কল্পনা করতে লাগলাম, মদির আবেশে ওঁকে একবার চুম্বন করলে কেমন হয়!

উপাসনা শেষ হতে না হতেই দিদিমা গীর্জার সামনের দিকে ছুটে গেলেন। রুদ্ধ আবেগে কি যেন তিনি বলতে লাগলেন প্রধানের নিকট। অবাক বিস্মিত চোখদুটি তুলে প্রধানও দেখি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে! য়্যাঁ, বুড়ী মাগীটা জানিয়ে এল নাকি সব প্রধানকে? রাগে আমি ফুলে উঠলাম মনে মনে।

প্রধান আমার কাছে দ্রুত এগিয়ে এলেন। আপনা থেকে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করলাম। অবাক বিস্মিত হয়ে বললেন:

'তোমার দিদিমার কাছ থেকে এই মাত্তর সব শুনছিলাম।'

রাগে আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

'দিদিমা যে আপনাকে তা বলে বসবেন আমি জানতাম না।'

আমি জানালাম।

'তোমার দিদিমা বলছিলেন, তোমার নাকি দেবদূতের দর্শন হয়েছে?' মুখ থেকে তাঁর কথাগুলো যেন ঝরে পড়ল আপনা হ'তে।

আমি তো অবাক! হাতখানা তাঁর আঁকড়ে ধরে আমি একরূপ খতিয়ে উঠলাম:

'না-না-না! তা নয় মশাই! দিদিমা আমায় ভুল বুঝেছেন। আমি তা বলি নি।'

সব কিছু এমনধারা তালগোল পাকিয়ে যাবে আমার বুঝি জানা ছিল না। প্রধান ত অবাক হয়ে গেলেন। বিস্ময়ে তিনি চোখ ঠারলেন। শুধালেন:

'তুমি ওঁকে কি বলছিলে?'

'আমি তো বলছিলাম, কোন দেবদূতের সাক্ষাৎ দর্শন পেলে তবে ওসব আমি বিশ্বেস করব।' বোকা বনে গিয়ে আমি জবাব দিলাম ঘাড় গুঁজে। দিদিমার উপর মনটা বিষিয়ে উঠল ঘৃণা আর করুণায়। প্রধানের মুখখানাও শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ব্যর্থ হতাশায় তিনি যেন ভেঙে পড়লেন খান খান হয়ে।

'তুমি...তুমি তাহোলে দেবদূতের দর্শন-লাভ করো নি?' তিনি শুধালেন।

আমি প্রবল মাথা নাড়লাম। পাছে আর যাতে কোন ভুল না হয় তাই সজোরে বলে উঠলাম:

'আজ্ঞে না!'

'তাই নাকি?' তিনি ছোট একটা নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলেন।

গীর্জার এক কোণায় চোখদুটি তাঁর পড়ে রইল স্থির হয়ে। তবু বুকভরা আশায় সহসা বলে উঠলেন :

'ভগবানের কৃপায় সব কিছুই সম্ভব হয় হে, সব কিছুই সম্ভব, বুঝলে ?'

'কিন্তু কই, আমি তেমন কিছু দেখছি নে।'

'তুমি যদি একবার কায়মনবাক্যে ভগবানকে ডাক, তিনি নিশ্চয় সাড়া দেবেন।'

গীর্জার উপর সহসা এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা জন্মে উঠল আমার। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই যেন বেঁচে যাই। এর ত্রিসীমানাও আর মাড়াই না তাহোলে। প্রধান কিন্তু আমার হাতখানা চেপে ধরলেন। এক পা নড়তেও দিলেন না।

'প্রধান, এ কিন্তু সবই ভুল। এমন ধারা কিছু একটা ঘটবে আমি কখনো কল্পনাও করি নি।'

'ছাখো রিচার্ড', তিনি বলে চললেন : 'আমি কিন্তু বয়সে তোমার চাইতে অনেক বড়ো। আমি মনে করি ভগবানের ছাপ আঁকা আছে তোমার বুকে।'

আমি বুঝি ক্রমশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলাম। তিনি আরও বলে চললেন : 'সত্যি, আমার তাই মনে হয়!'.

'দেখুন, এসব কথা কারো কাছে আর বিশেষ বলাবলি করবেন না।' আমি কাতর অনুনয় করলাম।

ফিকে ধূসর আশায় মুখখানা বুঝি তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আবার। বললেন :

'তুমি হয়ত লজ্জায় কিছু বলতে চাইছ না। কিন্তু ছাখো, কথাটা খুব গুরুতর। তুমি যদি সত্যিই দেবদূতের দর্শন-লাভ করে থাক আমায় তবে বলে ফেল।'

মুখ ফুটে আর না বলতে পারলাম না। কেবল মাথা নেড়েই তাঁকে জানিয়ে দিলাম। কথা বলে তাঁর বিশ্বাসের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে মন সরল না কিছুতেই।

'আজ তুমি প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে যে প্রার্থনা করবে। কায়মনবাক্যে তুমি যদি একবার ভগবানকে ডাক, সাড়া তিনি দেবেনই।'

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দুঃখ হোল তাঁর জন্য। নিজেকে মহাপরাধী বলে মনে হতে লাগল। মিছে কেনো অতখানি উচ্চাশা তাঁর মনে জাগিয়ে তুললাম? দুঃখও হোল খুব। সম্মুখ থেকে তাঁর কেটে পড়তে ইচ্ছে হোল। তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন:

'আচ্ছা, পরে তোমার সঙ্গে আবার কথাবার্তা হবে।'

গীর্জার সভ্যরা তাকিয়ে রইল সবাই হাঁ করে। মুঠি দুটো আমার কড় কড় করে উঠল। দিদিমা কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন অকপটে। আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। অমন একটা ভুল করে বসলেন দিদিমা! এর জন্যই কি তিনি প্রতিদিন বসে থাকতেন উন্মুখ হয়ে? এমনতর একটা ঘটনা ঘটুক, তিনি কি তাই কামনা করতেন মনে মনে? অপরাপর সভ্যরাও এ খবর বুঝি পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয় তাঁদের জানিয়েছেন। এমন কি প্রধানের স্ত্রীকেও হয়ত। ওই যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়। পরস্পর পরস্পরকে কি সব যেন বলছে কানাকানি। আনন্দ আর বিস্ময় যেন ছুপসে পড়ছে তাঁদের চোখ-মুখ দিয়ে। এ মুহূর্তেই আমি ইচ্ছে করলে মঞ্চে গিয়ে আরোহণ করতে পারতাম! সবাইকে নিয়ে যেতে পারতাম পিছু পিছু চালিয়ে। আমার জয়যাত্রার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত বুঝি তাই হতে পারত।

দিদিমা ছুটে এলেন আমার নিকট। আমাকে তিনি ঝাপটে ধরলেন

প্রচণ্ড আবেগে। আনন্দের বান ডাকল তাঁর চোখে। বিড় বিড় করে দিদিমাকে আমি মৃদু ভৎসনা করে উঠলাম। আবেগে ফেটে পড়ে অভিযোগ জানালাম আমাকে ভুল বোঝার জন্য। মুখ দিয়ে কথাগুলো বুঝি বেশ জোরেই বেরিয়ে পড়েছিল। চারদিকে ভীড় জমে উঠল রীতিমত। দিদিমা হঠাৎ গীর্জার দূর এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওখান থেকে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে কঠিন চোখদুটি নিবদ্ধ করে। আমি মহা ঘাবড়ে গেলাম। ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম।

'ওসব আমাকে আর না বললেই পারতে।' গলাটা তাঁর কেঁপে উঠল। তিনি যে কতখানি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এ কথা থেকেই প্রকাশ পেল।

ফিরবার পথে তিনি একটাও কথা বললেন না। গভীর আগ্রহে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললাম। বার বার তাকাতে লাগলাম খাঁজ-কাটা তাঁর শুভ্র আনত মুখ আর কালো বড়ো বড়ো দুটি চোখের দিকে। তিনি বুঝি ভেবেছিলেন : ধর্মের যে আলোক, যে নিগূঢ় অর্থের জন্য মানব-হৃদয়ে অনন্ত বুভুক্ষা, নিজেদের অসংখ্য অক্ষম পশুতাকে জয় আর বশীভূত করবার জন্য যে চিরন্তর আকাঙ্ক্ষা—তার সন্ধান আমি পেয়েছি।

সব ব্যাপারটা পরে আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম বুঝিয়ে। জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁর মনে আমি কোন আঘাত দিতে চাই নি। আমার এই মনোভাবের উপর তিনি কিন্তু সহসা এক হাত নিয়ে বসলেন। আমাকে আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলবার জন্য হয়ে উঠলেন সচেষ্ট। তিনি এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। কায়মনবাক্যে ভগবানকে উপাসনা করবার জন্য কাতর অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।

'দিদিমা, আর যাই করো, আমায় শপথ করতে বলো না।' আমি মিনতি জানালাম।

'না, শপথ করো। আমি তোমার আত্মার সংগতির জন্তই বলছি।'

শপথ করলাম। গীর্জা শুদ্ধ অতগুলো লোকের সামনে দিদিমাকে ওভাবে অপ্রস্তুত করার আমার কিই বা অমন সার্থকতা আছে? নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হোতে লাগল।

আমি আমার উপরের ঘরে প্রত্যেকদিন গিয়ে দোর বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে বসতাম উপাসনার উদ্দেশে। কিন্তু মুখ দিয়ে আমি যা উচ্চারণ করে যেতাম তাতে নিজেরই আমার হাসি পেত। একদিন তো হাঁটু গেড়ে উপাসনা করতে বসে হেসেই ফেললাম হা হা করে। এ সব সঙ সাজবার কি দরকার? প্রার্থনা টার্থনা হবে না কথনও আমার দ্বারা। আমি কথন তা পারবও না। আমি কিন্তু আমার এই অক্ষমতার কথাটা গোপনই রেখে গেলাম।

উপাসনার ভান করাও একটা অসহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কেবল সময়ের অপচয়। দিদিমার নিকট কথাটা দিয়ে বসে ভালো হয় নি। অনুতাপ হোল। ঘরে বসে সময় কাটাবার অভিনব এক ফঁন্দি আমি কিন্তু আবিষ্কার করে ফেললাম। একখানা বাইবেল, কাগজ-পত্র আর পদ্যলেখার একখানা অভিধান নিয়ে অক্ষর গুণে গুণে আমি উপাসনা-ভজন রচনা করতে লেগে যেতাম। আর মনকে প্রবোধ দিতাম, কথনো যদি সত্যিকারের ভালো ভজন রচনা করতে পারি, দিদিমা হয়ত আমায় ক্ষমা করে বসবেন। এখানেও কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমার ত্রিসীমাও মাড়ালেন না 'পবিত্র আত্মা'টি!

এমনি করেই একদিন উপসনার সময়টুকুন কাটাচ্ছিলাম। বছর খানেক আগে-পড়া রেড ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কথা

আমার সহসা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ; সেই ভালো। ওদের নিয়ে আমি এক কাহিনী রচনা করব।...ওদের সবাইকে নিয়ে কি? না। ইণ্ডিয়ানদের একটি যুবতী কন্যা...অপরূপ সুন্দরী আর সংযত—কাক-চক্ষুর মত স্বচ্ছ স্থির এক স্রোতস্বিনীর পাশে বনের প্রাচীন বনস্পতিদের নিবিড় ছায়ায় বসে আছে একাকিনী—উদ্বেল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছে বুঝি কারও আগমনের।...ইণ্ডিয়ানদের এমনি একটি মেয়েকে নায়িকা করে আমি লিখে যাব কাহিনীটি। বিড় বিড় করে মেয়েটি হয়ত কোন মন্ত্র আউড়াতে থাকবে। ও সব কিন্তু আমি আর লিখব না। আচ্ছা, তারপর লিখবো কি? গল্পের পরিণতির কথা ভেবে উঠতে না পেরে আমি স্থির করলাম, মেয়েটাকে মেরে ফেলতে হবে।...আসন ছেড়ে সে এক সময় উঠে দাঁড়াবে। তারপর কালো স্রোতস্বিনীর দিকে যাবে এগিয়ে ধীর পদক্ষেপে। স্থির অবিচলিত অপূর্ব এক সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বুঝি মুখখানা তার। জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল: বুক, চিবুক তার তলিয়ে গেল জলে—অবশেষে সে নিজেও। মরণ কালেও তার একটি টুঁ শব্দ, একটু গোঙানি পর্যন্ত বেরুল না মুখ থেকে!...

"অবশেষে নিরন্ধ্র রাত্রি নামিয়া আসিল ধীরে ধীরে। হতভাগা রমনীর সলিল সমাধিকে সে তাহার কালো উত্তরীয় দিয়া সস্নেহে ঢাকিয়া দিল। স্তব্ধ চলাচল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। সুপ্ত বনস্পতিরা কেবল মৃদু কলগুঞ্জন তুলিয়া বুঝি একটু সহানুভূতি নিবেদন করিল।—"
এখানেই পরিসমাপ্তির রেখা টানলাম গল্পের।

আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম আনন্দে। বারবার পড়লাম গল্পটি। মনে হোল, কোথায় যেন বিরাট একটা ফাঁক রয়েছে গল্পটার। প্যাঁচানো কোন প্লট নেই, ঘাত-প্রতিঘাত নেই কিছুই—খালি খানিকটা প্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস, মৃত্যু আর জমকালো পরিবেশ নিয়ে কি গল্প জমে? তা হোক,

বাজেই হোক! নিজে তো লিখেছি। এমন আগে আর কবে লিখলাম? আচ্ছা, এটা এখন পড়ে শোনাব কাকে? না; বাড়ির কাউকেও না কিছুতেই। ওঁরা নিশ্চয় আমাকে পাগল ঠাওরাবেন। আচ্ছা, পাশের বাড়ির ওই মেয়েটিকে পড়ে শোনালে কেমন হয়? এক রাশ এঁটো বাসন ধুয়ে নিচ্ছিল মেয়েটা। আমি তাকে ডেকে আনলাম বাধা দিয়ে। বললাম, কাউকে বলো না যেন। তারপর উচ্চস্বরে পড়ে গেলাম গল্পটি। শেষ হতেই সে একটু হাসলে বোকার মত। বিস্মিত চোখ ছুটি তুলে শুধালে :

'কি হবে ও নিয়ে!'

'কিছু না।'

'তবে লিখলে কেনো?'

'লিখতে ইচ্ছে হোল তাই লিখে ফেললাম।'

'বানানো বানানো অত সব কথা তুমি পেলে কোথায়?'

আমি মাথাটা একবার মৃদু নাড়লাম। মুখের দুপাশটায় একবার বুলিয়ে নিলাম হাতখানা। তারপর গল্পের পাণ্ডুলিপিটা পকেটের মধ্যে পুরতে পুরতে ওর দিকে একবার তাকালাম তেরচাভাবে। বুঝি বললাম : ওঃ, এ আবার কি দেখলে! এমনি কত আমি লিখতে পারি! তারপর সহজ, বিনীত কণ্ঠে মুখ তুলে বললাম :

'অত সব জানিনে। হঠাৎ মাথায় এসে গেল!'

'এখন কি করবে ও নিয়ে?'

'কিছু না।'

ও কি যে ভাবছিল কেবল ভগবানই হয়ত জানেন। লিখে নিজেকে একটু আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু আমি চাই নি। কিন্তু গল্পটি ঠিক শেষ হবার পর মেয়েটির সেই স্তব্ধ, বিস্মিত হতবাক দৃষ্টির কথা আমি কখনও ভুলব না। গল্পটির পূর্ণ রস গ্রহণ সে যে করে উঠতে পারে

নি, তার সে অক্ষম অপটুতা আমাকে অধিক কৃতার্থ করে তুলল। পরে যখনই ঐ কথাটি আমার মনে পড়ত, তখন কেন যেন অকারণ হেসে উঠতাম!

পাঁচ

না। এবার থেকে আর ভান করতে হবে না উপাসনার। পাপী বলেও আর ভাবতে হবে না নিজেকে। আমি বুঝি আজ মুক্ত কারাগার থেকে। আবার বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো। বিভীষিকাময় অশরীরী সেই ছায়ামূর্তিগুলি এবার নিশ্চয় দূর হয়ে যাবে। বাইরের প্রাত্যহিক জগৎ দেখা দিল এবার তার পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ নিয়ে। ধ্যান ধারণা আর নয়। বোকার মত প্রার্থানাও আর করতে হবে না। তার পরিবর্তে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াও, ছুটাছুটি করো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে, মিশে গিয়ে হল্লা করো; তুমিও ভোগ করে নাও জীবন, মিটিয়ে নাও বেঁচে থাকার ক্ষুধা। কেউ আর বাধ সাধতে আসবে না তোমার।

আমার প্রতি দিদিমা ও অডি মাসীরও মনের ভাব পরিবর্তিত হোল। আমি একেবারে জাহান্নমে গেছি তাঁরা ধরে নিলেন। জানিয়ে দিলেন সংসারের মায়া মমতা তাঁরা সব কেটে উঠেছেন। আমার সঙ্গে তাঁদের রক্তের সব সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে নিশ্বেষে। মরে গেছে। সহৃদয় পৃথিবী থেকে হঠাৎ আজ বুঝি আমি এসে পড়লাম শত্রুভাবাপন্ন এক অপরিচিত জগতে। ইতিমধ্যে মা কিছুটা সেরে উঠেছিলেন। স্নেহ মমতার দ্বারটা তিনিই কেবল রাখলেন উন্মুক্ত করে। অনুনয় করলেন, আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করি। যে সময়টা বৃথা অপচয় করেছি এত দিন, পুরণ করে নিই সেটা।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল নানান সমস্যা। পাঠ্য পুস্তক এখন

পাই কোথায়? দিদিমা তো মুখের উপর বলে বলেন, 'পার্থিব' কোন বই পত্র তিনি আমায় কিনে দিতে পারবেন না। মাসের পর মাস আমায় অপেক্ষা করতে হোল একখানা বইএর জন্যে। জামা কাপড়ের দশাও তেমনি শোচনীয়। দিদিমা আর অডি মাসী এমন খাপ্পা হয়ে ছিলেন যে, আদেশ দিলেন এবার থেকে আমার কাপড় আমাকেই কাচতে হবে। ইস্ত্রীও করতে হবে। খাবার বেলায়ও তাই। খানিকটা ছাতুর মণ্ড আর শাক-সব্জী। তাও আবার আধ পেটা। আমি কিন্তু তাতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। ইস্কুলে যেতাম এই ভেবে যে কেবল লেখাপড়া শেখাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এক নতুন পৃথিবীর সংস্পর্শেও আসতে হবে না আমায়।

জিম্ হিল পাবলিক ইস্কুলে আমি এসে যখন ভর্তি হলাম, তার পূর্বে এক কেবল গীর্জার পাঠশালা ছাড়া আর কোথাও একটানা পুরো একটা বছর আমার শিক্ষা লাভ ঘটে নি। বছরের মাঝামাঝি সময়টায় এমন একটা কিছু ঘটত যার ফলে নানান বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হোত আমার পড়াশুনার। ইতিমধ্যেই আমার ব্যক্তিত্ব-বোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমার অনুভূতির ধারা ছাপিয়ে গেল আমার বাস্তব জ্ঞানকে বহুলাংশে।

এবারকার ইস্কুলের প্রথম দিনেও চিরানুচরিত সেই সমস্যাটা দেখা দিল। আমিও অবশ্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম প্রথম থেকে। ইস্কুলের মধ্যে আজ আমার কি দশা হবে, কে জানে? শ্ল্যাট ও পেন্সিল বগলদাবা করে আমি পা বাড়ালাম ইস্কুল প্রাঙ্গণের দিকে নির্লিপ্ত ভাবে। ছেলেদের দলে মিশেও গেলাম। ভাবলাম কেউ হয়ত আমায় লক্ষ্য করেনি। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভাঙল। নবাগত বলে ধরা পড়ে গেলাম। বিপদও দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে। আমার মাথায় ছিল নতুন আনকোরা এক খড়ের টুপি। একটা নিগ্রো ছেলে কোথা থেকে হঠাৎ এসে পাশ কেটে

গেল আমার। যাবার সময় টুপিটা মাটীতে ফেলে দিয়ে গেল ছোঁ মেরে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার বলে উঠল :

'ঘেসো ফড়িং !'

আমি কুড়িয়ে নিলাম নীচ থেকে টুপিটা। আর একটা ছেলে এসে টুপিটা আবার ফেলে দিয়ে গেল ছোঁ মেরে। এবার আরো জোরে।

'ঘেসো ফড়িং !'

টুপিটা আমি আবার কুড়িয়ে নিলাম। চিৎকার ক্রমশ বেড়ে চলল। ছেলেরা আমায় ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল :

'ঘেসো ফড়িং রে, ঘেসো ফড়িং !'

এটা যে ওদের একটা রীতিমত সংগ্রামের আহ্বান, আমার এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। না হবার কারণ, বিশেষ কোন একটা ছেলে এগিয়ে এসে তো আর আমায় উপহাস করেনি ! তাই আমি ভাবছিলাম, এবার হয়ত সব থেমে যাবে। কাল থেকে আর নতুন টুপিটা পরে না এলেই হবে।

কিন্তু যে ছোড়াটা সব নষ্টের গোড়া, সে এবার এল এগিয়ে।

'মা আমারে টুপি কিনে দিয়েছেন।' সে ভেঙিয়ে উঠল স্বর করে টেনে টেনে।

'বলছো কি তুমি জানো ?' আমি তাকে সাবধান করে দিলাম।

'ওরে ছাখ্ ! এবার ওর মুখ ফুটেছে রে !' বলে উঠল ছেলেটা। ছেলেদের দলও ফেটে পড়ল হাসিতে।

'তা ভাই তুমি এলে কোথেকে ?' ছেলেটা প্রশ্ন করলে নেহাৎ ভাল মানুষের মত।

'যেখান থেকেই আসি না,কি দরকার তোমার ?' আমি জবাব দিলাম।

'ত্থাখ, বেশী তেরিমেরি করিসনে কিন্তু। মেরে ভূত ছাড়িয়ে দেবো!'

'হুঁ, ভূত ছাড়াবেন? আমি যা খুশি তাই বলব।'

ছেলেটা এবার এক খণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিল। কাঁধের ওপর বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এল আমার দিকে। বলল:

'ফেল না দেখি এটা!'

মুহূর্তখানেক আমি ইতস্ততঃ করলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাহস করে এগিয়ে গেলাম। পাথরটা ফেলে দিলাম একটা ধাক্কা মেরে। তারপর পা দুটো তার ধরে হেঁচকা এক টানে তাকে ফেলে দিলাম চিৎপটাং। ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠল। ছেলেটার উপর আমি আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সমানে চালিয়ে যেতে লাগলাম ঘুসির পর ঘুসি।

আচমকা এক ঝাকুনি খেয়ে চেয়ে দেখলাম, আর একটা ছেলে এসেও সুরু করে দিয়েছে মারামারি। আমার টুপিটা দূরে ছিটকে পড়ল। দুমড়ে গেল একেবারে। ভুলে গেলাম আমি তার কথা।

'আমার ভাইকে তুই মারছিস কেনো রে?' খেঁকিয়ে উঠল নতুন ছেলেটা।

'একা আমার সঙ্গে দু'জনে তোরা লড়বি নাকি!'

তবু কিন্তু দুজনেই তেড়ে এল। মাথার পেছনটায় সহসা এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, এক খণ্ড ইট পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। হাত দিয়ে দেখলাম রক্ত ছুটেছে ফিনকি দিয়ে। এদিক-ওদিক তাকালাম। কয়েক টুকরো ইট দেখলাম পড়ে আছে পাশে। কয়েকটা আমি কুড়িয়ে নিলাম। ছেলে দুটো তখন পিছু হটতে লাগল। তাক করে একখানা ইট ছুঁড়ে মারবার ভান করতেই একটা ছেলে অমনি পিঠটান দিল দৌড়ে। পিঠের মাঝখানটায় তাক করে আমি হাতের ইটটা ছুড়ে মারলাম। ছেলেটা চিৎকার করে উঠল। অপর ছেলেটাকেও

আমি ইস্কুল মাঠের অর্দ্ধেকটা পর্যন্ত নিয়ে গেলাম তেড়ে। ছেলেরা হাত তালি দিয়ে উঠল সোল্লাসে। ঘিরে ধরল আমাকে চাক করে। একা একা ওই ডানপিটে দুই ছেলের সঙ্গে লড়াই করেছি বলে বাহাবা দিলে খুব। সহসা কিন্তু ছেলের দল সরে দাঁড়াল পথ করে দিয়ে। মুখের রা তাদের মিলিয়ে গেল। আমার দিকে এবার এগিয়ে আসতে দেখলাম এক শিক্ষয়িত্রীকে। ঘাড় থেকে রক্তের ধারাটা লুকোবার চেষ্টা করলাম।

'কে, তুমিই বুঝি ঢিল ছুঁড়েছিলে ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'দুটো ছেলে মারামারি করছিল কিনা।'

'এসো আমার সঙ্গে।' তিনি এসে আমার একখানা হাত ধরলেন।

শিক্ষয়িত্রীর হেফাজতে আমি ইস্কুলে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আমায় নিয়ে যাওয়া হোল একটা ঘরে। মুখোমুখি দেখা হোল সেই ছেলে দুটোর সঙ্গে।

'কে, এরাই নাকি ?' শিক্ষয়িত্রী শুধালেন।

'হ্যাঁ ওরা দু'জনেই এসেছিল আমাকে মারতে।'

'প্রথম ওই তো গায়ে হাত তুললে।' এক ভাই চিৎকার করে উঠল।

'মিথ্যেবাদী !'

'গালাগালি করতে নেই এখানে।' শিক্ষয়িত্রী আমাকে সাবধান করে দিলেন।

'কিন্তু ওরা যে সত্যি কথা বলছে না ?' আমি উত্তর দিলাম। '—আমি আজ নতুন এসেছি। আমার টুপিটা ওরা ছিঁড়ে দিলে।'

'ওই তো প্রথম গায়ে হাত তুললে।' ছেলেটা আবার জানালো।'

শিক্ষয়িত্রী দাঁড়ায়েছিলেন আমাদের দুজনের মাঝখানে। আমি

তাঁর পাশ কেটে গিয়ে ঠ্যাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলাম ছেলেটার গালে। সে চিৎকার করে উঠল। আমাদের ছাড়িয়ে দিলেন শিক্ষয়িত্রী।

'তুমি তো আচ্ছা দেখছি!' তিনি গর্জে উঠলেন।—'ইস্কুলের মধ্যে মারামারি করতে চাইছো? হোল কি তোমার?'

'ও যে সত্যি কথা বলছে না।'' তিনি আমায় গিয়ে বসতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। কিন্তু ছেলে দুজনের ওপর থেকে চোখ সরালাম না। শিক্ষয়িত্রী এসে বললেন:

'ভেবেছিলাম এ যাত্রায় তোমাকেও নিষ্কৃতি দেবো না।'

'আমি তো কোন দোষ করিনি।'

'আমি জানি। কিন্তু তুমি তো আমার সামনেই মেরে বসলে এইমাত্র একজনকে।'

'আমি দুঃখিত।'

তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমাকে অপর এক ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

কেনো বুঝলাম না, পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে আমায় সুপারিশ করে হোল পাঠানো। আচ্ছা, আমাকে কি এঁরা ঐ শ্রেণীর অনুপযুক্ত ভাবছেন?—বসে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার বয়স কত এবার জিজ্ঞেস করা হোল। উত্তর দিলাম। আমায় তখন নেয়া হোল ভর্তি করে।

রাতদিন খেটেখুটে পড়াশুনা করতে লাগলাম। সপ্তা দুয়ের মধ্যেই প্রমোশন পেয়ে গেলাম ষষ্ঠ শ্রেণীতে। বাড়ি এলাম সুখবরটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে। খুশিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে বেড়াতে লাগলাম সবাইকে। বাড়ির কেউ এটা ভাবতেই পারি নি। একটা বদ নষ্ট ছোকরার পক্ষে এ আবার সম্ভব হয় কি করে? আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটাও

বাড়ির সকলকে জানিয়ে দিলাম জোর গলায়। বললাম: আমি এবার ডাক্তারি পড়তে যাব। রিসার্চ করব। আবিষ্কার করব কত কি! কিন্তু এ ভাবনা আমার মনে একবার এলো না যে, মেডিক্যাল ইস্কুলের খরচটা আমার জুটবে কোত্থেকে? তাহোক! মাত্র দু সপ্তার মধ্যে যে ছেলে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে যেতে পারে, তার আবার অত শত চিন্তা কি? সবই সে পারে। সব কিছুই জলের মত তার কাছে তরল, সহজ হয়ে যাবে।

এখানকার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমিও ভিড়ে পড়লাম। ওরা কেবল লেখাপড়া করে না। মারামারিও করে। প্রাণ খুলে আলাপও করে। উদ্দীপ্ত করে তুলল ওরা আমার নিজ সত্তাকে। প্রেরণা জোগাল আমার অনুভূতির। আমাকে নিয়ে গেল তাড়িয়ে গ্রহণশীলতার উদগ্র শিখর দেশে। আমি জানতাম, আমার পায়ের নীচেকার ঘূর্ণমান পৃথিবীটার মুখোমুখি একদিন দাঁড়াতে হবে আমাকে বড়ো হয়ে। সংগ্রাম করতে হবে প্রতি পদে পদে তার বিরুদ্ধে। সমগ্র ভবিষ্যৎটা আজ যেন সহসা বাস্তব মূর্তি ধরে দেখা দিল আমার সম্মুখে! দেখা দিল সুস্পষ্ট মিসিসিপির কোন এক নিগ্রো ছেলের সম্মুখে যেভাবে দেখা দেওয়া উচিত।

সহপাঠীদের অনেকে সকাল, বিকেল বা শনিবারের দিন অন্যত্র কাজকর্ম করত। তাই দিয়েই ওরা নিজেদের কাপড় জামা বইপত্র সব কিনত। পকেটে করে পয়সাও নিয়ে আসত ইস্কুলে। দুপুরের ছুটিতে ইস্কুলের কোন ছেলেকে মুদীর দোকানে ঢুকে পড়তে দেখা এবং তাকে ভর্তি খাবার জিনিসের ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া আর খুশি মত কিছু একটা কেনা—দাম তার এক ডাইম বা তার বেশী যতই হোক—এ যেন আমার কাছে নিবিড় এক রহস্যের মত। আচ্ছা, কাজকর্ম তো আমিও কিছু একটা করতে পারি? কিন্তু কথাটা দিদিমার

কাছে পাড়তেই তিনি বেঁকে বসলেন। সোজা জানিয়ে দিলেন : এ বাড়ির ছাঁচের তলায় আমায় বাস্ করতে হলে শনিবারের দিন কাজ কর্ম করা চলবে না কিছুতেই। আমিও সহজে ছাড়লাম না। যুক্তি দেখালাম, শনিবারগুলোই হোল একমাত্র দিন যখন আমি বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতে পারি। দিদিমা বুঝি আকাশ থেকে পড়লেন। তাকিয়ে রইলেন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে। শাস্ত্র আওড়িয়ে শুনিয়ে দিলেন :

"কিন্তু সপ্তাহের সপ্তম দিন তোমার প্রভু ভগবানের বিশ্রামের দিন : ওই দিবস তুমি, কিংবা তোমার পুত্র, কিংবা তোমার কন্যা, কিংবা তোমার ভৃত্য, কিংবা তোমার দাসী, কিংবা তোমার কোন গর্দভ, কিংবা তোমার কোন গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ার, কিংবা তোমার গৃহে অভ্যাগত কেহ কোন কাজকর্ম করিবে না; যাহাতে তোমার দাস-দাসী ও তুমি বিশ্রাম করিতে পার।"......

এই তাঁর শেষ কথা। ঠিক আধপেটে খেয়েই আমাদের দিন কাটছিল; দিদিমাকে আমার ভবিষ্যৎ আয়ের অর্দ্ধেক কি দুই তৃতীয়াংশ ঘুষ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পাওয়া গেল না অনুমতি। দিদিমার কেবল এক কথা : না। কখ্খনো না। তাঁর এ প্রত্যাখ্যানে আমি ভয়ানক দুমড়ে গেলাম। এবার থেকে আমায় বুঝি দল ছাড়া উন্মত্ত জীবনই যাপন করতে হবে। অভিসম্পাৎ দিতে লাগলাম আমি নিজকে নিজে।

মুখের উপর দিদিমাকে শুনিয়ে দিলাম : আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য অত মাথা ঘামাতে হবে না তাঁকে। তিনি জবাব দিলেন, আমি এখনও নাবালক, আমার আত্মার ভাগ্য এখনও ন্যস্ত তাঁর হস্তে। এসব ব্যাপারে আমার কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা উচিত নয়। ইত্যাদি।

ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা আমার সম্বন্ধে মহাকৌতূহলী হয়ে উঠল।

করতে লাগল নানান চোখাচোখা প্রশ্ন। এমন সব নিমন্ত্রণ করত যা আমার পক্ষে রক্ষা করা অসম্ভব। আমি ওদের সাহচর্য চাইলেও খুব বেশী গা মাখাতাম না তাতে। এড়িয়ে এড়িয়ে চলতাম। প্রাচীর তুলে রক্ষা করতাম নিজেকে। ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে দিতাম না, ওদের চলার পৃথিবীতে আমার কোন প্রবেশাধিকার নেই। তাই তাদের সাময়িক বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম মুখে এক পোঁচ ভাড়া করা হাসির সাহায্যে অথবা প্রত্যুত্তরে দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিয়ে। আত্ম-সচেতনও হয়ে উঠতাম মনে মনে।

দুপুর বেলা ছেলে-মেয়েরা সকলে মোড়ের দোকান থেকে স্যাণ্ডুইচ্ কিনে খেত। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখতাম। যদি কেউ বা জিজ্ঞেস করত : 'কই, তুমি লাঞ্চ খেলে না?' আমি তখন ঘাড় নেড়ে জানাতাম : 'ও : দুপুরবেলা আমার মোটে খিদেই পায় না।' কিন্তু পাঁউরুটি কেটে ওরা যখন তাতে সার্ডিন মাছের ঝোল মাখাত, জিভে আমার তখন জল এসে পড়ত। আমি ঢোক গিলতাম। আর বারবার শপথ নিতাম, আমিও একদিন আমার এই বুভুক্ষার অবসান ঘটাব। অবসান ঘটাব দুস্তর এই ব্যবধানের—চিরন্তর এই বৈষম্যের। ওদের পৃথিবীতে আমিও একদিন নিশ্চয় আসন করে নেবো আমার স্বতন্ত্র নিজস্ব পথ ধরে। ওরা সেদিন অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, জীবনের কি উত্তুঙ্গ দুর্গম বন্ধুর পথই না করতে হয়েছে ওকে অতিক্রম।

আমার চোখের উপর নতুন এক পৃথিবীর দ্বার এবার গেল খুলে। সে যেন নেচে উঠল জীবন আনন্দে। ইস্কুল ছুটির পর সিধে বাড়ি না ফিরে ঘুরে বেড়াও তুমি টো টো করে এখানে ওখানে, লক্ষ্য করো, প্রশ্ন করো, কথা কও আপন মনে। এক প্লেট সব্জী খাবারের লোভে একবার যদি বাড়ি ঢোক, দিদিমা কি তোমায় আর বেরুতে দেবেন ভেবেছ? পুরো বারোটা ঘণ্টা না হয় খাবার নাই বা জুটল। পথে পথে ঘুরে

বেড়ানর অমন মজাটি তুমি বা পাচ্ছ কোথায় ? খেলেই বা তুমি ছাতুর মণ্ড সেই ভোর আটটায় আর সাতটা বা তারও পরে রাত্রি বেলার খাবার —এক প্লেট শাকসজ্জী। কিন্তু জানব বলে, শিখব বলে অমন উপোস করে থাকারও বা কি কারণ থাকতে পারে সঙ্গত ? তাই বলে অমন খিদেও বা পাবে কেনো ? তবু আমি কিন্তু বই-পত্র সব কাঁধে ঝুলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ঢুকে পড়তাম বন-বাদাড়ে। নদী, নালা, ব্যবসায়ী এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াতাম। হয়ত ফাঁকতালে কোন বায়স্কোপ ঘরে ঢুকে পড়তাম বিনা টিকিটে। আশ-পাশের ইটের পাঁজা, কাঠের গোলা কিংবা সুতাবীচির মিলের ভেতর গিয়ে ঢুকতাম। দেখতাম লোকে কাজ করছে কেমন করে। ঘণ্টা কয়েক বুঝি আমায় তখন ভয়ানক কাবু করে ফেলত খিদেয়। চলতে গিয়ে আমি টাল সামলিয়ে উঠতে পারতাম না। হৃদপিণ্ডটা যেন সহসা ঢেঁকির পাড় দিতে সুরু করত। থর থর করে কেঁপে উঠত আমার সর্বাঙ্গ। দম আসত বন্ধ হয়ে। কিন্তু স্বাধীন পরিবেশের বিপুল আনন্দ আবার মাতিয়ে তুলত। ভুলিয়ে দিত আমার সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তত সাময়িকভাবে।

আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে কালো ঢেঙা মত একটা ছেলে পড়ত। পড়া শুনোয় সে ভালই ছিল। কিন্তু কাউকেও সে পরওয়া কোরত না। নিজেকে জাহির করতে এক চুলও পিছ্‌পা হোত না কখনও। ফস্ করে হঠাৎ অমন একটা কাণ্ড করে বসত যাতে ক্লাশের নৈতিক ঠাট আর বজায় থাকতো না। শিক্ষয়িত্রী নিজেও তাকে বাগে আনতে পারতেন না। খিদেয় আমি যে অত্যন্ত কষ্ট পাই, বিদ্রোহী ছেলেটাই প্রথম লক্ষ্য করল। অর্থ উপার্জনের একটা পথ বাতলিয়ে দিল সে।

'সারাদিন কিছু না খেয়ে বসে থাকা যায় নাকি ইস্কুলে ?' সে কথাটা পাড়লে।

'খাবো কি ?' আমি জবাব দিলাম।

'আমার মত তুমিও করো না কেনো ?'

'তুমি কি করো ?'

'কাগজ বিক্রি করি।'

'আমিও প্রথম ভেবেছিলাম কাগজ বিক্রি করবো। কিন্তু দেখলাম ওই কাগজ সবাই রাখে।' আমি ওকে জানালাম। আরও বললাম : কাগজ বিক্রি করতে চেয়েছিলাম। কেননা, তাহোলে নিজেরও বেশ পড়া হোতো।

'ও, তুমিও তাই ?' সে হেসে ফেলল।

'কি ?'

'আমি তো সেই জন্যেই কাগজ বিক্রি করি। নিজেরও বেশ পড়া হয়।'

'তোমার বাপ-মা বুঝি তোমার লেখাপড়ায় আপত্তি করেন ?'

'হ্যাঁ, বুড়োটা আবার বেজায় খাপ্‌পা।'

'তুমি কোন কাগজ বিক্রি করো ?'

'ওটা বেরোয় চিকাগো থেকে। প্রতি সপ্তাহেই আসে। সঙ্গে থাকে একটা সাময়িকীও।' ছেলেটা সব সংবাদ দিলে।

'কাগজটা কোন্ ধরনের ?'

'অত সব খবর-টবর আমি পড়িনে। কি এসে যায় তাতে ? কিন্তু ভাই, কাগজটার যা সাময়িকী! মজার মজার কত গল্প থাকে তাতে !...জ্যানি গ্রে-র 'রাইডার্স্ অব্ দি পার্পস্ স্যাজ'-খানা এখন চলছে ক্রমশ। আমি কেবল তাই পড়ি!'

ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। সবিস্ময়ে বললাম :

'রাইডার্স্ অব্ দি পার্পল স্যাজ !'

'হ্যাঁ।'

'ও কাগজ আমিও পারি বিক্রি করতে ?'

'নিশ্চয়। প্রতি সপ্তায় আমি পাই পঞ্চাশ সেণ্ট করে। পড়ার খোরাকও জুটে যায় এক গাদা।' ছেলেটা জানাল।

ছেলেটার সঙ্গে আমি তার বাড়ি গেলাম। এক সংখ্যা কাগজ সে দিল আমাকে। সঙ্গে সাময়িকীখানাও। কাগজখানা চটি। ভালো সম্পাদিতও নয়। গ্রাম্য শ্বেতাঙ্গ প্রোটেস্ট্যাণ্ট পাঠকদের মধ্যেই কেবল তার প্রচার।

'বিক্রি করে নিও চটপট করে', অনুরোধ করলে বুঝি ছেলেটা। 'গল্পটা সম্বন্ধে আলাপ করতে হবে দু'জনে মিলে।'

সে রাত্রিতেই এক গাদা কাগজের অর্ডার দেব বলে আমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কাগজখানা পড়তে পড়তে আমি বাড়ি ফিরলাম হেঁটে। পাছে অপর কোন পথচারীর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি এই আশংকায় দু-একবার যা চোখ দুটোকে উপড়ে নিতে হয়েছিল ছাপা অক্ষরগুলো থেকে। মশগুল হয়ে ডুবে গেলাম কাহিনীটার মধ্যে। কাহিনীটা হোল : বিখ্যাত কোন এক বৈজ্ঞানিক এক রহস্য কুঠির নির্মাণ করে নিয়েছিলেন ধাতব পদার্থ দিয়ে তাঁর বিরাট রাজ প্রাসাদের নীচের তলার। নিজের গুপ্ত অভিলাষ পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি নিরীহ বহু লোককে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যেতেন ঐ কুঠিরের মধ্যে। তিনি তারপর বৈদ্যুতিক সুইস্‌টা দিতেন টিপে। ধাতব সেই কুটির থেকে সমস্ত বাতাসও নিতেন একটু একটু করে পাম্প করে। হতভাগা লোকটা তখন

লাল, নীল তারপর কালো বিবর্ণ হয়ে যেত। মরে গেল অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। এই তো চাই! ঠিক এমনি কাহিনী-ই! ইতিপূর্বে আমি এমন কিছু একটা পড়িনি যাতে সুস্থ কোন রুচিবোধ আমার গড়ে উঠতে পারে। চিত্তাকর্ষক কিছু একটা পেলেই হোল, আমি তাতেই বর্তে যেতাম।

আরও একটা সুবিধে হোল। এবার থেকে বাড়ি বসে আমি পড়াশুনো করতে পারব। দিদিমা আর আপত্তি জানাতে পারবেন না। কাগজ বিক্রি করতে তিনিই তো দিয়েছেন অনুমতি। ভাগ্যিস, দিদিমা পড়তে জানেন না! একমাত্র ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অপর কোন বই-টই বাড়িতে আনলে দিদিমা অমনি ফেলতেন পুড়িয়ে। এবার আর পোড়ান চলবে না। নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হলে খবরের কাগজ তাঁকে নিতে হবে সহ্য করে। আর অডি মাসীর বলাতে বিশেষ কিছু এসে যাবে না। আমার কোন ব্যাপারে তিনি বড়ো একটা চোখ তুলেও তাকান না। তাঁর চক্ষে আমি বুঝি মৃত। কাগজ বিক্রি করে আমি দু পয়সা ঘরে আনতে চাই দিদিমাকে জানালাম।

তিনি রাজী হলেন। ভাবলেন এতদিন পরে বুঝি আমার সুমতি হোল! সে রাত্রিতেই আমি কাগজের অর্ডার দিয়ে রাখলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম উৎসুক পথ চেয়ে।

কাগজ এল। তাই নিয়ে আমি গোটা নিগ্রো এলাকায় ঘুরে বেড়ালাম। এক দল গ্রাহকও জুটিয়ে নিলাম। তাঁরা কাগজটা রাখলেন পড়ার আগ্রহের চাইতে আমাকে অধিক জানতেন বলে। রাত্রিতে বাড়ি ফিরেই আমি কিন্তু সিধে চলে যাব আমার ঘরে। দরজায় খিলটা দেব এঁটে। তারপর বুঝি ঘুরে বেড়াব দূর দুরান্তের কত রাজ্য ও নগরে নগরে—অজানা-অচেনা কত লোকের সঙ্গে!

জীবনে আমি এই প্রথম আধুনিক জগতের জীবনধারা সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে উঠলাম। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তার নগর ও নগরীর। ভালোবেসে ফেললাম তাদের। হ্যাঁ জানি, ঐসব গল্প কেবল মিথ্যে কথারই জাল-বোনা। আমি কিন্তু তাদের সত্য বলে মেনে নিলাম। সাময়িকীর ঐ ফাঁপান খেলো গল্পগুলি আমায় এমন এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিল যার সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার ইতিপূর্বে। বস্তির খেলো বাড়ি, শুঁড়িখানার দরজা আর নদীর বাঁক নিয়ে আমার জীবনের যে পট-ভূমিকা গড়ে উঠেছিল, বিপ্লবী এক পরিবর্তন নিয়ে এল ঐ কাহিনীগুলি। হাত ধরে আমায় নিয়ে গেল সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের সিংহদ্বারে।

আমি ফেটে পড়লাম খুশিতে। অনির্দিষ্ট কাল ধরেই হয়ত আমায় এই সংবাদ ও সাময়িকী পত্রিকা বিক্রয় করে যেতে হোত যদি না আমাদের পরিবারের জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুব জাতীয় আত্মাভিমানে ঘা না পড়ত। মাঝখানে এসে তিনি যদি না বাধ সাধতেন। দেখতে তিনি বেশ লম্বা-চওড়া। ধীর-স্থির। কথাবার্তা কমই বলেন। কাজ করেন এক ছুতোর মিস্ত্রির। কাগজ নিয়ে একদিন সন্ধ্যে বেলা আমি বাড়ি তাঁর গিয়েছিলাম। একটা ডাইম তিনি আমার হাতে দিলেন তুলে। তারপর স্থির অপলকে তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন:

'বাছা, প্রতি সপ্তায় সপ্তায় দু-এক পয়সা তুমি যাতে পেতে পারো আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু বাছা বলো তো দেখি, তোমাকে ঐ কাগজ বিক্রি করতে কে বলে দিয়েছে?' তিনি সহসা প্রশ্ন করলেন।

'কেউ না তো?'

'ওগুলো আসে কোত্থেকে?'

'চিকাগো থেকে।'

'তুমি কখনও ঐ কাগজ পড়ে থাকো ?'

'নিশ্চয়। সাময়িকীর সব কটা গল্পই আমি পড়ি।' আমি জানিয়ে দিলাম।—'কিন্তু বাদ বাকী খবর-টবর কখ্‌খনো পড়ি নে।'

তিনি এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন।

'আচ্ছা, তোমাকে কি কোন শ্বেতাঙ্গ ওসব কাগজ বিক্রি করতে বলেছে ?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন।

'অজ্ঞে, না।' আমি জবাব দিলাম ঘাবড়ে গিয়ে।—'আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেনো ?'

'তুমি যে ঐ কাগজ বিক্রি করো বাড়িতে সবাই জানেন ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিন্তু অন্যায়টা কি হোল ?'

'ঐ কাগজের তুমি ঠিকানা পেলে কোথায় ?' তিনি আমায় আবার শুধালেন। এড়িয়ে গেলেন কিন্তু আমার প্রশ্নটি।

'আমার এক বন্ধুও বিক্রি করে। সেই দিলে ঠিকানাটা।'

'তোমার বন্ধুটি শ্বেতাঙ্গ বুঝি ?'

'আজ্ঞে, না। সেও আমাদের মত নিগ্রো। কিন্তু আপনি অত সব প্রশ্ন করছেন কেন ?'

তিনি কোন জবাব দিলেন না। বাড়ির সামনের চাত্তালের উপর তিনি বসেছিলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন:

'একটু দাঁড়াও বাছা, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

দোষ হ'ল কোথায় ? বেশ তো কাগজটা। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বাকি ক'টা কাগজ বিক্রি করে বাড়ি ফিরতে পারলেই যেন বাঁচা যায়। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে তাহলে লোমহর্ষক সেই হত্যা-

কাহিনীর পরবর্তী কিস্তি পড়া যাবে দিব্যি। লোকটি ফিরে এলেন। হাতে সযত্নে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ। কাগজখানা তিনি দিলেন আমার হাতে।

'তুমি এটা দেখেছ ?' বীভৎস একটা ব্যঙ্গ চিত্র দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'না তো !' আমি উত্তর দিলাম।'—ম্যাগাজিনের পাতা ছাড়া আমি কাগজে আর কিছুই পড়ি না।'

'বেশ তো, তুমি নিজেই একবার পড়ে দেখ। তারপর বেশ ভেবে-চিন্তে বলো তোমার মতামত কি।'

কাগজখানা গত সপ্তাহের। ছবিটার দিকে আমি এবার তাকালাম। বিপুল আয়তন একটা কৃষ্ণাঙ্গ লোক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে এক প্রকাণ্ড ডেস্ক এর সামনে বসে আছে এক দোলন-চেয়ারে। মুখখানা তার চট্‌চট করছে ঘামে। ঠোঁট দুটো পুরু। নাকটা চ্যাপটা। দাঁত ক'টা সোনালী; পা দুটো টিকরে বেরিয়ে পড়েছে ডেস্ক-এর। পায়ের জুতো জোড়াটি করছে চিকচিক। পুরু ঠোঁট দুটোতে তার মস্ত একটা কালো সিগার। সিগারটার শাদা এক ইঞ্চি লম্বা ছাই। ঝারা হয় নি বুঝি অনেকক্ষণ। লাল ফুটকিওয়ালা ওর টাইটা আটকানো রয়েছে ঘোড়ার খুড়ের মত এক পিনে। ঝলমল করে উঠছে পিনটা। লোকটার পরনে লাল সাস্‌পেণ্ডার্ আর সিল্কের ডোরা কাটা শার্ট। থ্যাবড়া থ্যাবড়া আঙুলে হীরার আংটি। সোনার এক গাছা চেন ঝুলছে অর্দ্ধ-চক্রাকারে তার বুকের নীচে। আর জেব ঘড়ির খোপ থেকে খরগোসের একটা ঠ্যাং যেন বেরিয়ে পড়ছে। ডেস্ক-এর এক পাশে মেঝের উপর পড়ে আছে কফে ভর্তি নোংরা একটা পিক্‌দানি। লোকটা যে ঘরটায় বসে আছে তার দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা :

দি হোয়াইট্ হাউস

নীচে আব্রাহাম লিঙ্কন্-এর এক প্রতিকৃতি। ষণ্ডামার্কা লোকের মত বিকৃত করা হয়েছে তাঁর মুখখানা। আমার চোখ গিয়ে এবার পড়ল ব্যঙ্গচিত্রটার মাথায়। লেখা আছে :

মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর মসনদ আর শ্বেতাঙ্গিনী রমণীদের সহিত সহবাস করাই হোল প্রত্যেকটি 'নিগারের' জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। মার্কিন ভাইগণ, আমাদের এই সুন্দর দেশে আমরা কি কখন এসব ঘটতে দিতে পারি? সংগঠিত হও! সম্মান রক্ষা করো শ্বেতাঙ্গ নারী জাতির!

ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম। ব্যঙ্গ চিত্রটি আব তার শিরোনামার নিগূঢ় অর্থ উদ্ধারের হয়ে উঠলাম সচেষ্ট।

'কেমন, এবার বুঝতে পারলে?' ভদ্রলোক আমায় শুধালেন।

'উঁহু, না তো?'

'আচ্ছা, কখনো নাম শুনোছা কু ক্লাক্স ক্ল্যানের?' চাপা গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়। কেনো?'

'কু ক্লাক্স-রা কৃষ্ণাঙ্গদের কি করে জানো?'

'মেরে ফেলে। আমাদের ভোট দিতেও দেয় না ওরা। ভালো কোন চাকরীও না।' আমি উত্তর দিলাম।

'বেশ। কিন্তু তুমি যে সব কাগজ বিক্রি করছিলে তাতে শুধু কু ক্লাক্স ক্ল্যান মতবাদই প্রচারিত হচ্ছে।'

'না না, তা কেনো?' আমি প্রতিবাদ জানালাম।

'ম্যাগাজিন পাতাটা তো আমি সবটাই পড়ি।' গজ গজ করতে করতে আমি জবাব দিলাম।

'শোন বাছা', তিনি বলে চললেন। 'শোন, তুমি নিগ্রো ছেলে। কাগজ বেচে তুমি দুটো পয়সা পেতে চাও ভালো কথা। ওই কাগজ তুমি বিক্রি করতে চাইলে আমি কোন বাধা দেব না। কিন্তু গত দুমাস ধরে আমি তো কাগজখানা পড়ে আসছি। আমি জানি ওরা কি প্রচার করতে চায়। তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার কাগজ বিক্রির করার অর্থই হোল তোমাকে হত্যা করতে সাহায্য করা শ্বেতাঙ্গদের।'

'কিন্তু ও সব কাগজ তো আসছে চিকাগো থেকে।' আমি তবু প্রতিবাদ জানালাম অকপট এই আত্মবিশ্বাসে যে, যে পত্রিকা উত্তরের চিকাগো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিশ্চয় জাতিগত প্রচার কার্য অন্তত থাকতে পারে না। তাই যদি থাকত চিকাগো শহরে কি হাজারে হাজারে লোক পালিয়ে যেত?

'কোথা থেকে এলো না এলো তাকে আমি বড়ো করে দেখি না।' তিনি জবাব দিলেন। 'তুমি যখন বিশ্বেস করতে চাইছ না তবে নিজেই শোন।'

দীর্ঘ এক প্রবন্ধ তিনি এবার পড়ে গেলেন। নিগ্রো সমস্যার সমাধানের জন্য প্রবন্ধে 'লিঞ্চিং' বা জীয়ন্ত পুড়িয়ে মারার বর্বর প্রথার নির্লজ্জ ওকালতি করা হয়েছে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে। তাঁকে স্বচক্ষে পড়তে দেখেও কিন্তু আমি কথাটা কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারলাম না। বললাম:

'কই, দেখি?'

তাঁর হাত থেকে আমি কাগজখানা একরূপ ছিনিয়ে নিলাম।

পড়তে বসে গেলাম তাই নিয়ে সিঁড়ির ধাপের উপর। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আমি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চললাম একান্ত মনযোগে। নিগ্রো-বিরোধিতার নৃশংস কাহিনীতে ভরপুর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়তে পড়তে সর্বাঙ্গ আমার কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল ভয় ও আতংকে।

'তুমি এখনও ঐ কাগজ পছন্দ করো?' তিনি শুধালেন।

'আজ্ঞে, না।' আমি হাঁপ ছাড়লাম।

'এখন টের পেলে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে?'

'আমি যে আগে জানতাম না।' কৈফিয়তের সুরে আমি বিড় বিড় করে উঠলাম।

'এখনও কি ঐ কাগজ বিক্রি করবে?'

'না, আর কখ্খনো না।'

'শুনছিলাম তুমি নাকি ইস্কুলে পড়াশুনোয় ভালো। বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে যখন ঐ কাগজ বিক্রি করছ, কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারলাম না। ভাবলাম ছেলেটা নিশ্চয় জানে না কি যে সে করছে। এখানকার আরো অনেকেও এ সম্পর্কে আলাপ করতে চেয়েছিলেন তোমার সঙ্গে। তাঁরা কিন্তু শেষকালে ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। ভাবলেন, শেতাঙ্গ কু ক্লাক্স-দের দলে তুমি বুঝি ভিড়ে পড়েছো। তোমাকে কাগজ বেচা বন্ধ করতে বললে তুমি হয়ত কু-ক্লুক্সদের লেলিয়ে দেবে ওদের বিরুদ্ধে। আমি কিন্তু বিশ্বেস করিনি। জোর গলায় বলছিলাম: না। ছোলটা নিজেই জানে না, কি করছে সে।'

আমি তাঁকে ডাইমটা ফিরিয়ে দিতে গেলাম। তিনি কিন্তু নিলেন না। বললেন:

'ডাইমটা তোমার কাছেই থাক বাছা। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আর কোনদিন ও কাগজ বিক্রি করো না।'

সে রাত্রিতে আমি একখানা কাগজও বিক্রি করতে চেষ্টা করলাম না। কাগজগুলো সব বগলদাবা করে বাড়ি ফিরলাম। মন্থর পা ফেলে বাড়ি আসতে আসতে মনে হতে লাগল: ঝোপ-ঝাড় থেকে এই বুঝি এক দল কালা আদমি নিগ্রো সহসা রে-রে—চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল আমার সম্মুখে আর আমার নিয়ে চলল বিপথে! এতদিন কি মারাত্মক ভুলই না করে এসেছি! কথাটা গোপন রাখতেই ঠিক করলাম। ভাগ্যচক্রে আমি যে একজন কু ক্লাক্স ক্ল্যান সাহিত্য প্রচারের এজেণ্ট হয়ে পড়েছিলাম, কাউকে তা জানালাম না। পথের এক খানার মধ্যে কাগজগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বাড়ি এসে দিদিমাকে খুব আহত মনমরা হবার ভান করে বললাম, কোম্পানি আর আমার কাছে কাগজ পাঠালেন না। জ্যাকসনে ওঁরা অপর এজেণ্ট ঠিক করেছেন। প্রকৃত সত্যটাকে ঢাকতে বুঝি মিথ্যাটা মনের মতো জুৎসই হোল না। দিদিমাও বিশেষ কোন আর পীড়াপীড়ি করলেন না। কেন না, কাগজ বিক্রি করে যে সামান্য ক'টা পয়সা আমি কামাই করতাম তাতে দৈনন্দিন সংসার খরচার তেমন বিশেষ বড় একটা সুরাহা হোত না।

যে ছেলেটা আমায় প্রথম কাগজ বিক্রি করতে অনুরোধ করেছিল তার বাবাও কু ক্লাক্সদের এ-প্রচার কার্যের কথা টের পেলেন। তিনিও তাঁর ছেলেকে ঐ কাগজ বিক্রি করতে নিষেধ করে দিলেন। আমরা দুজনে কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথাই আর বললাম না। নিজেদের আচরণে বড় লজ্জিত হলাম। কথাটা একদিন ওই পাড়ল সতর্ক হয়ে:

'কই, ওসব কাগজ আর বিক্রি করো না আজকাল?'

'ওঃ! না। তেমন সময় করে উঠতে পারি নে।' আমি জবাব দিলাম। চোখ তুলে একবার তাকাতেও পারলাম না।

'আমিও না,' সেও জানাল ঠোঁটের কোণে একটু হেসে। 'আমিও ভাই সময় পাই না।'

পড়াশুনায় এবার মেতে গেলাম। ক্লাশের গোড়াতেই সিভিক্স, ইংরেজী আর ভূগোলের বইক'টা পড়ে নিলাম আগাগোড়া। অঙ্কেও ক্লাশ থেকে এগিয়ে গেলাম অনেকখানি। তাই ইস্কুলে আমায় আর বিশেষ পড়তে হোত না। আমি ফ্লিন্-এর আধ-ময়লা ছেঁড়া ডিটেকৃটিভ সাপ্তাহিক কিংবা গল্পের আসর আর্গসি পত্রিকাগুলো কাটাতাম পড়ে। আর রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতাম যে সকল নগর ও নগরীর সঙ্গে আমার এখনও চাক্ষুস পরিচয় ঘটেনি কিংবা যে সকল অজানা অচেনা নর-নারীর আমি এখনও সাক্ষাৎ পাইনি তাদের।

ইস্কুলের বছর শেষ হোল। আমি এমন কোন কাজ জুটিয়ে নিতে পারলাম না যাতে দিদিমার পবিত্র 'বিশ্রাম দিবসে' হাত-পা গুটিয়ে চুপ-চাপ বসে বেশ নিষ্কর্মা জিরিয়ে নেওয়া যায়। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনগুলি তাই কাটতে লাগল নিরস। বাড়িতে বসে বসে আমি কেবল আকাশকুসুম ভাবতাম আর ছটফট করতাম ক্ষুধায়। বিকেল বেলা রোদ পড়ে এলে আমি বল খেলতাম পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। আর রাত্রি হলে সামনের চাতালের সিড়ির উপর গিয়ে বসতাম। পথ দিয়ে যাচ্ছে কত লোকের পর লোক, ওয়াগন আর গাড়ি। শূন্য চোখে কেবল তাকিয়ে থাকতাম।......

এমনি এক গ্রীষ্মের উষ্ণ অলস রাত্রিতে দিদিমা, মা আর অডি মাসী সামনের চাতালের উপর বসে তত্ত্বকথার কি এক জটিল প্রশ্নের জোর আলোচনা করছিলেন। হাত-পা গুটিয়ে আমি বসেছিলাম সিঁড়ির উপর। দু'হাতের তালুর উপর চিবুকটি রেখে অন্যমনস্ক হয়ে আমিও শুনছিলাম ওঁদের আলোচনা। বড়োদের কথার মাঝখানে হঠাৎ

ফস করে কি-যেন একটা ফোড়ন দিয়ে বসলাম। একবার খেয়ালও হোল না, বিনা অনুমতিতে দিদিমাদের কথার মাঝখানে কিছু বলার আমার কোন অধিকার নেই। দিদিমা অমনি গর্জে উঠলেন :

'তুই চুপ কর!' সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ঝুঁকে পড়ে তেড়ে মারতে এলেন আমায় হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড এক থাপ্পড়। দিদিমার হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই চট করে আমি মাথাটা সরিয়ে নিলাম। এ ব্যাপারে আমি সম্প্রতি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলাম। অমন জোর থাপ্পড়টা ফসকে গেল। দিদিমা কিন্তু টাল সামলাতে পারলেন না। বৃদ্ধ শরীর। মুখ থুবড়ে একেবারে পড়ে গেলেন সিঁড়িটার নীচের ধাপ আর বেড়ার মাঝখানের সরু জায়গাটায়। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মা আর অডি মাসী চিৎকার করে উঠলেন। তাঁরা নেমে গিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন দিদিমাকে। তাঁকে কিন্তু ওঁরা নাড়াতেও পারলেন না। তখন ডেকে আনা হোল দাদামশাইকে। তিনি এসে বেড়াটা উপড়ে ফেললেন। তবে উঠান গেল দিদিমাকে। দিদিমার জ্ঞান ছিল না একরূপ। ধরাধরি করে তাঁকে শোয়ায়ে রাখা হোল বিছানায়। ডাকা হোল ডাক্তার।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে পালিয়ে গেলাম নিজের ঘরে। খিল দিলাম আটকে। আশংকা হোল : দাদামশাই আমায় বুঝি আজ কেটে ফেলবেন টুকরো টুকরো করে। মাথাটা অমন করে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়াটা ভালো হয় নি। চুপ করে বসে থাকলেই তো পারতাম। দিদিমার থাপ্পড়টা না হয় খেতামই। অমন করে তিনি তা হোলে পড়ে যেতেন না। কিন্তু কেউ তেড়ে মারতে এলে কি বসে থাকতে আছে চোখ বুঁজে? পাশ কেটে এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে না? আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ভয়ে

ভয়ে। কেউ কিন্তু এলেন না। বাড়িটা চুপ-চাপ। দিদিমা কি মারা গেলেন ?

ঘণ্টা কয়েক পর ঘরের কপাটটা খুললাম। চুপিচুপি পা ফেলে নেমে এলাম নীচে। সেই ভালো—আমি বিড় বিড় করে উঠলাম—দিদিমা যদি মারাই যান, আমি তাহোলে এখনই চলে যাবো বাড়ি ছেড়ে। হল ঘরের মাঝখানে সাক্ষাৎ হোল অডি মাসীর সঙ্গে। চোখ দুটি থেকে তাঁর যেন আগুন পড়ছে ঠিকরে। বললেন :

'কি দশা করে বসেছ দিদিমার একবার গিয়ে দেখে এসো।'

'আমি তো তাঁকে ছুঁইনি পর্যন্ত!' দিদিমা এখন আছেন কেমন তাই চেয়েছিলাম শুধাতে। সবটা কিন্তু গুলিয়ে গেল ভয়ে।

'না, ছোঁবে কেনো ? খুন করতে চেয়েছিলে যে।' মাসী জবাব দিলেন।

'তাই দেখলেন কিনা ? দিদিমাকে আমি ছুঁয়েছিলাম ?'

'তুমিই সব নষ্টের গোড়া! একটা না একটা আপদ ডেকে আনা চাই!'

'আমায় অমন য়্যাসা তেড়ে মারতে এলেন কেনো ? হু, যত দোষ নন্দ ঘোষ!'

অডি মাসীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেবার বুঝি একটা ফিকির খুঁজতে লাগলেন।

'বুড়োদের কথাবার্তায় নাক গলাতেই বা আসো কেন ?' অবশেষে বুঝি খুঁত একটা খুঁজে পেলেন।

'কেনো, আমি চুপ চাপ বসে থাকবো নাকি ?' মুখ শুকনো করে আমি জবাব দিলাম—'অনেকক্ষণ কারো সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি নি পর্যন্ত'।

'এর পর কেউ কিছু না বললে টুঁ শব্দটি করবে না কখ্খনো।'

'দিদিমারও কিন্তু সব সময় অমন ধারা ফট্ করে মেরে বসা উচিত নয়।'

'দিদিমার কি করা উচিত নয় সেটা তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে না, ডেঁপো ছোড়া।' অডি মাসী খেঁকিয়ে উঠলেন। খুঁত একটা বুঝি এবার পেয়ে গেলেন।

'দিদিমা পড়ে গেলেন কি করে আমি তো তাই বুঝিয়ে বলছি।'

'চুপ করো এক্ষুনি! নইলে ঘাড় মটকে দেবো, বোকা কোথাকার!'

'বোকা আপনিও!' মুখের উপর ছুঁড়ে মারলাম জবাবটা।

অডি মাসী রাগে কাঁপতে লাগলেন।

'আজ রাত্রিতেই আমি তোকে শায়েস্তা করবো।' তিনি ছুটে এলেন আমার দিকে।

আমি তাঁর পাশ কেটে ঢুকে পড়লাম রান্না ঘরে। লম্বা রুটি কাটা ছোরাখানা নিলাম হাতে। অডি মাসীও আমার পিছু পিছু এসে দাঁড়ালেন মুখোমুখি। আবেগের মাথায় আমি একরূপ কেঁদে ফেললাম।

'আমার গায়ে হাত দেবেন তো দুখান করে ফেলবো কেটে।' আমি ফোঁপিয়ে উঠলাম। '—কাজকর্ম একটা জোটাতে পারলে আমি চলে যাবো এখান থেকে। কিন্তু খবর্দার, এখানে যদ্দিন আছি আমার গায়ে হাত দেবেন না কিন্তু!'

পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা ফুলতে লাগলাম অন্ধ ঘৃণা ও আক্রোশে।

'তোকে আমি আজ দেখে নেবো,' স্তব্ধ চাপা গলায় তিনি শপথ নিলেন। '—ছোরা হাতে করে তুই থাকবি কতক্ষণ?'

'এটা আমি পাশে পাশে রাখছি সব সময়।'

'রাত্রিতে তোকে ঘুমোতে হবে না? তখন আমি ঠিক দেখে নেবো।'

'ঘুমিয়ে পড়লে আমার গায়ে হাত দেবেন তো আপনাকে আমি খুন করে ফেলব।'

রান্নাঘর থেকে তিনি এবার বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দরজাটায় করে গেলেন পদাঘাত। লাথি মেরেই তিনি দরজা খোলেন সবসময়। দরজাটা যদি খোলাই থাকে, যাবার সময় সেটা ভেজিয়ে দিয়ে যান পা দিয়ে। দরজায় এমনি লাথি মারা অডি মাসীর একটা অভ্যাস।

এর পর মাসখানেক ধরে রান্নাঘরের একখানা ছোরা নিয়ে আমি রোজ ঘুমোতাম রাত্রি বেলা। ছোরাখানা রেখে দিতাম বালিসের নীচে। অডি মাসী এলে আত্মরক্ষা করা যাবে। কিন্তু তিনি আর এলেন না কোনদিন। বুঝি প্রার্থনাই করতেন!

সপ্তাহ ছয়েক দিদিমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হোল। আমায় তেড়ে এসে চড় মারতে গিয়ে নিজের পিঠেই চোট খেয়ে বসলেন জবর।

আমাদের অমন ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান বাড়িতেও প্রায় ঝগড়া ঝাঁটি যেত বেঁধে। সেটা চোর ডাকাত কি বাটপাড়দের আড্ডাখানাকে কিংবা কোন বেশ্যাপল্লীকেও পর্যন্ত দিত হার মানিয়ে। লজ্জা হোত আমার। আকার ইঙ্গিতে দিদিমাকে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোন ফল হোত না। 'জগন্নাথের রথের' দড়ি দিদিমা টেনে বেড়ালেও শান্তি ছিল না আমাদের পরিবারে। দিদিমা আর অডি মাসী কেবল আমার সঙ্গেই ঝগড়াঝাঁটি করতেন তা নয়। নিজেদের মধ্যেও ধর্ম কি তত্ত্বকথার খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিতেন হামিশা। জীবনে যখনই এসেছি ধর্মের কোন সংস্পর্শে তখনই সম্মুখীন হতে হয়েছে বিরাট সংঘর্ষের। দেখতাম ঈশ্বরের নামে কোন

ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ কি ভাবেই না সচেষ্ট হয়ে উঠেছে আধিপত্য স্থাপনের লালসায়। উপাসনার সুমধুর ধর্ম সংগীতই বুঝি এই নগ্ন রূপের কুহক মন্ত্র।

গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে আমি একটা মজার চাকরী পেয়ে গেলাম। আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশীটি একজন দরোয়ান। দরোয়ানগিরী ছেড়ে এবার ওর এক বীমা কোম্পানির দালাল হতে সখ গেল। কিন্তু মুস্কিল হোল কি, লোকটা লেখাপড়া জানতো না। উপত্যকার আবাদ এলাকায় ওর সঙ্গে গিয়ে লেখাপড়ার কাজটা করে দিতে আমায় নিযুক্ত করল সে। বেতন প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ডলার করে। ব্রাদার ম্যাক্স-এর (এ নামেই ও পরিচিত) সঙ্গে আবাদের খামার বাড়িতে বাড়িতে আমি কয়েকবার যাতায়াত করলাম। রাত্রিতে ঘুমাতাম খড়ের মাদুরের উপর। আর সকাল দুপুর বা রাত্রির খাবার বলতে মিলত ঐ এক সল্টেড্ পোর্ক আর বাদাম। দুধও একবার মিলত পর্যাপ্ত মাত্রায়।

এমন এক আবাদে আমারও যে জন্ম হয়েছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অবাক হয়ে গেলাম এখানকার ছেলে মেয়েদের অকাট অজ্ঞতা দেখে। পড়বার মত কোন বই নেই বলে কীই না কষ্ট হয় আমার মনে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, এমন সব ছেলেমেয়েরা আছে যাদের কোন দিন অক্ষর পরিচয়টাও হয়নি। আমায় দেখে ওরা মাটীর সঙ্গে মিশে যেত লজ্জায়। একবার এক নিগ্রো মা তো তাঁর কাচ্চা বাচ্চাদের হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ওদের করমর্দন করতে আমার সঙ্গে। ওরা কিন্তু কিছুতেই সাহস পেল না। দাঁড়িয়ে রইল কপাট আঁকড়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে আমায় কেবল দেখতে লাগল উঁকি মেরে আর খিল খিল করে হাসতে লাগল পাগলের মত। শহুরে এক বিস্ময় বুঝি

আমি তাদের চোখে! রাত্রি বেলা কেরোসিন ল্যাম্পের নীচে রুক্ষ এক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বীমা কোম্পানির ফর্মগুলি আমি যেতাম পূর্ণ করে। মাঠের কাজ কর্ম সেরে এক একটি করে সহজ সরল নিগ্রো ক্ষেতচাষী পরিবার এসে দাঁড়াত তখন আমার টেবিলটার পাশে আর বুঝি চেয়ে থাকত অবাক বিস্ময়ে। ভাবত: তাদের ছেলে পিলেরাও যদি জ্যাকসনের ওই বাহাদুর ছেলেটার মত 'নিখা পড়া' জানত!

যাওয়া আসাটাই ছিল যা কষ্টকর। সেই সকাল থেকে রাতভর একবার ট্রেণ, একবার মালগাড়ি, অথবা একবার বাসে চাপার ছিল না অন্ত। এমনি করে খামারে খামারে আবাদে আবাদে ঘুরে বেড়াতে হোত। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম দু দিনেই। তবু কাজ করে চললাম। নিগ্রো জীবনের নগ্ন নিষ্করুণ মশীময় দিকটা আমার চোখে এখানে ফুটে উঠল উদ্ভাসিত হয়ে। এখানকার লোকজন সব, তাদের ঘর বাড়ি, তাদের খামার—সবটাই ঢালা এক ধাঁচে। আমি কুঁচকে উঠলাম ঘৃণায়।

রবিবার দিন ব্রাদার ম্যান্স নিকটবর্তী কোন গীর্জায় গিয়ে উপস্থিত হোত। পাদ্রীদের ঢঙে নিজের ব্যবসায়ী প্রচার কার্য তারপর দিত সুরু করে। বলতে বলতে নিজেই উঠত হাততালি দিয়ে।

মুখস্ত করা বক্তৃতার এক একটা অনুচ্ছেদের পর মেঝের উপর থুথু ফেলে দিয়ে রাখত চিহ্ন। বক্তৃতার মুখে মেঝের উপর প্রচণ্ড পা ছুঁড়ে এক গাদা থুথু ছিটিয়ে রীতিমত অবাক বানিয়ে দিত গেঁয়ো সব নিগ্রো ভাগচাষীদের। ওরা তখন দল বেঁধে ছুটত ব্রাদার ম্যান্সের নিকট বীমা করতে। আমিও তখন ফর্ম লিখে চলতাম উর্দ্ধশ্বাসে। হাতখান উঠত টন্‌টন্ করে।

পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু আমাদের অভাবের সংসারে ওই কটা ডলারে কি হয়? মা তবু ফেঁপে উঠলেন

গর্বে। এমন কি আঁডি মাসী পর্যন্ত অন্তত কিছুকালের জন্য ভুলে গেলেন সব বিবাদ বিসম্বাদ। আর দিদিমা তো তাজ্জব বনে গেলেন রীতিমত। ভাবলেন, আমি বুঝি দিগ্‌বিজয় করে এলাম অলৌকিক কিছু একটা! আমার কৃত অনেক পাপের তিনি ক্ষমাও করে বসলেন বেমালুম। কেন না, তাঁর কাছে জয় হোল ধর্মপ্রাণতারই পুরস্কার আর পরাজয়—পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অত ভালো বুঝি সইল না ঈশ্বরের। সেই শীতকালেই ব্রাদার ম্যাক্সকে তিনি তলব করে পাঠালেন খোদ স্বর্গে এবং যেহেতু বীমা কোম্পানীটি আমার মত নাবালক এক বালখিল্যকে নিজেদের এজেন্ট বানাতে রাজী হলেন না, একান্ত নিরুপায় হয়ে আমাকেও পুনরায় ফিরে আসতে হোল মর্ত্যধামে! বিপথচারী এক বিধর্মী ছোকরার জন্য দিদিমাদের অমন 'পবিত্র' গৃহটি আবার হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত!

ইস্কুল খুলে গেল। সপ্তম শ্রেণীতে আমি এবার উঠলাম। পুরোন খিদেটা আবার পেয়ে বসল। না খেয়েই একরূপ আমার দিন কাটতে লাগল। বিশুদ্ধ আলো বাতাস আর ঐ এক প্লেট শাক-সব্জীই কিন্তু আমায় রাখল বাঁচিয়ে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে পড়ছিলাম। পাশের বাড়ির রসুই থেকে হঠাৎ চমৎকার মাংস রান্নার সুঘ্রাণ ভেসে এল নাকে। পড়া শুনো আমার সব উঠল সিকোয়। ভাবতে বসলাম, আচ্ছা, আশ মিটিয়ে একবার মাংস খেলে কেমন হয়? দুবেলাই রোজ মাংস হয় এমন এক পরিবারের ছেলে বলে নিজেকে আমি তখন ভাবতে লাগলাম। উদ্ভট ঐ চিন্তায় এতই মেতে গেলাম যে আমার নিজেরই বিরক্ত ধরে গেল এক সময়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ধড়াম্ করে জানলাটাই দিলাম বন্ধ করে।

একদিন সকাল বেলা নীচে নামছিলাম খেতে। খাবার ঘরে ঢুকেই টের পেলাম, বাড়িতে আজ কিছু একটা যেন ঘটেছে। দাদামশাইকে আর আর দিনের মত আজকেও অনুপস্থিত দেখলাম টেবিলে। তিনি তাঁর খাবার নিজ ঘরে বসেই খান। আমায় দেখে দিদিমা ঘাড় নেড়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঘাড় হেঁট করে আমি গিয়ে বসলাম। মার মুখখানাও দেখলাম পাথরের মত স্তব্ধ অনড়। অডি মাসীরও চোখ দুটি বোঁজা। খাঁজ পড়েছে কপালে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে দিদিমা এবার দুহাতের মধ্যে মুখ ঢাকলেন। ব্যাপারটা কি আমি জানতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কেউ যে আমার কথায় সাড়া দেবেন না।

দিদিমার প্রার্থনা সুরু হোল : আমাদের সকলের জন্য তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করলেন। ভগবান যেন আমাদের সকলকে সৎপথে চালিত করেন। এর পর তিনি বলে উঠলেন : 'আমার হতভাগ্য বৃদ্ধ স্বামী আজিকার এই সুন্দর প্রাতঃকালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবান ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, তিনি আবার নিরাময় হইয়া উঠিবেন।'

আজ কোথায় কি ঘটল, কে মারা গেল, কোন ছেলে জন্মাল, আজ কোন নতুন অতিথি এলো, ইত্যাদি নানান খবরাখবরের মত দিদিমার প্রাতঃকালীন উপাসনা মারফৎই দাদামশায়ের অসুখের খবর জানতে পারলাম।

কালো লম্বামত দেখতে ছিলেন দাদামশাই। একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন সামনে। মুখখানা তাঁর একটু লম্বামত। দাঁত দুপাটি শাদা ঝক্‌ঝকে। আর মাথায় তাঁর পশমের মত একরাশ পাকা চুল। রেগে গেলেই তিনি দাঁত দুপাটি দেখিয়ে উঠেন। শব্দ করেন মুখ দিয়ে কেমন এক ধরণের। মুঠিদুটো ভিড়িয়ে নেন অমন জোরে যে শিরাগুলো তাঁর

উঠে ফুলে। দাদামশাই-এর এটা একটা অভ্যেস। দিদিমা বলেন, 'গৃহযুদ্ধে'র সময় পরিখার মধ্যে লড়াই করতে গিয়ে নাকি অভ্যেসটা ঐ দাঁড়িয়ে গেছে। এমনি হাসবার সময়ও দাদামশাই হাসেন অমন দাঁত বার করে। তবে দেহটা খাড়া হয়ে উঠত না। ধারাল একটা পকেট ছুরি সব সময় থাকত তাঁর কাছে। ওটা আমায় ছুঁতে দিতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি রোদে চুপচাপ বসে থাকতেন আর শিস কাটতেন আপন মনে। খোশতবিয়তে যেদিন থাকতেন সেদিন বুঝি গুনগুন করে গানও গাইতেন উদ্ভট এক সুরে।

'গৃহযুদ্ধ' সম্বন্ধে আমি তাঁকে কত প্রশ্ন করতাম: তিনি কেমন লড়েছিলেন, তখন তিনি কি মনে করতেন, আব্রাহাম লিঙ্কন্‌কে কখন দেখেছেন কি না। দাদামশাই কিন্তু কোন সাড়াই দিতেন না।

'এই ভাগ্‌ ছোড়া, ভাগ্‌ এখান থেকে!' দাদামশাই-এর কেবল ঐ এক কথা।

দিদিমার মুখে আরও শুনেছিলাম, 'গৃহযুদ্ধে'র সময় তিনি নাকি আহত হয়ে পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে নাকি 'অক্ষমতা'র কোন পেন্সন দেওয়া হয় নি। তিক্ত সে ঘটনাটা দাদামশাই এখনও ভুলতে পারেন নি। আশ্চর্য, আমি কোনদিন তাঁকে ভুলেও শ্বেতাঙ্গদের নাম উচ্চারণ করতে শুনি নি। ওদের নাম মুখে আনতেও পর্যন্ত তিনি হয়ত ঘৃণা বোধ করতেন। ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়ান পেয়ে তিনি নাকি কোন এক শ্বেতাঙ্গ অফিসরের নিকট প্রথম গিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় তাঁর কাগজপত্র সব লিখিয়ে আনতে। শ্বেতাঙ্গ ঐ অফিসরটি নাকি দাদামশাই-এর নাম রিচার্ড্‌ ইউল্‌সনের স্থানে লিখে বসে রিচার্ড্‌ ভিন্‌সন। হয়ত এমনও হতে পারে, নিরক্ষর দাদামশাই-এর দক্ষিণী কথার টানে উচ্চারণটা ভুলই শুনিয়েছিল। কেউ কেউ আবার বলেন, শ্বেতাঙ্গ

ওই অফিসরটা নাকি জাতিতে সুইড্। ইংরেজীতে একটা বিদ্যাদিগ্‌গজ। কিন্তু জোর গুজব, অফিসর পুঙ্গবটিও নাকি দক্ষিণদেশী লোক। ইচ্ছে করেই সে নাকি দাদামশাই-এর কাগজে নাম লিখেছিল ভুল করে। সে যাই হোক, ডিস্‌চার্জড্ হবার দিন দাদামশাই কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারলেন না যে রিচার্ড ভিন্‌সন নামেই তিনি খারিজ হলেন সৈন্যবাহিনী থেকে। পরে তিনি যখন পেন্সনের জন্য সমর-দপ্তরে আবেদন করলেন, তখন দেখা গেল রিচার্ড্ ইউলসন নামের কোন সৈনিকই নেই ইউনিয়ন সেনা বাহিনীতে।

পেন্সন সম্পর্কে আমি সবাইকে কতবার কত কত কথা জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি ছেলেমানুষ এখনও। এ সব বুঝব না। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে দাদামশাই কিন্তু সরকারী সমর দপ্তরের সঙ্গে এ সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যেক পত্রেই (প্রত্যেকখানা পত্রই অপর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন) সঠিক সন-তারিখ-কাল জানিয়ে কোন মাঠ-ঘাট-নদী-নালা-খাল-বিল-গ্রাম-শহর-নগরে, কোন কোন রেজিমেণ্ট আর কোম্পানীর অধীনে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কারা কারা মারা গেল সেই যুদ্ধে, কারা এখনও বেঁচে আছে—সে সব প্রকৃত ঘটনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তিনি ওয়াশিংটনের সমর দপ্তরে পাঠাতেন।

বহু দিন সকাল বেলা জেগে উঠেই দেখতাম, দোরগোড়ার তাকের উপর লম্বা একটা সরকারী লেফাপা পড়ে রয়েছে। ওটা নিয়ে আমি অমনি উপরে ছুটতাম দাদামশাই-এর কাছে। জানতাম, সমর দপ্তর থেকে তিনি আজ তাঁর আবেদনের এক উত্তর পেলেন। আমার হাত থেকে দাদামশাই লেফাপাটা একরূপ কেড়েই নিতেন।

উঠে বসতেন বিছানার উপর। নিজ হাতেই খুলতেন খামটা। কালো কালো অক্ষরগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে থাকতেন। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাভাবে চিঠিখানা দিতেন আমার হাতে।

প্রত্যেকটা শব্দের উপর সবিশেষ জোর দিয়ে চিঠিখানা আমি তাঁকে পড়ে শুনাতাম। জানাতাম, তাঁর পেন্সনের দাবীর কথা প্রমাণিত হয় নি এখনও। তাঁর আবেদন পত্র এবারও গেছে বাতিল হয়ে।

দাদামশাই অবাক নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। একটা দীর্ঘ শ্বাস চাপবার বুঝি চেষ্টা করতেন। বিড় বিড় করে কারও উদ্দেশে বুঝি গালি পাড়তেন।

'ওই শালা বিদ্রোহীদের এসব কাণ্ড!' ফোঁস করে উঠতেন একসময় দাদামশাই।

আমার চিঠি পড়ায় দাদামশাই বুঝি আশ্বস্ত হতে পারতেন না। তাই বেশ ভূষা করে তিনি অমনি বেরিয়ে পড়তেন পাড়ায় চিঠিখানা নিয়ে। দশ বারোজন তাঁর বন্ধুবান্ধবের মুখে চিঠিখানা আবার মন দিয়ে শুনতেন আদ্য প্রস্ত। শুনতে শুনতে চিঠিখানা তাঁর মুখস্তই হয়ে যেত। চিঠিখানা তারপর তুলে রাখতেন সযত্নে।

হাঁড়িতে যখন এক মুঠাও খাবার থাকতো না আমি তখন অনেক দিন বসে বসে ভাবতাম, এ মাত্র বুঝি একখানা সরকারী চিঠি এলো দাদামশাই-এর নামে। লেখা আছে ঃ

প্রিয় মহাশয় ঃ

আপনার পেন্সনের সঙ্গত দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। নামের গোলমাল সন্তোষজনক মিটিয়া গিয়াছে। সরকারী প্রথামত এতদ্দ্বারা ট্রেজারী

সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনার গত—বৎসরের বকেয়া পেন্সন বাবদ শুদসহ মোট—ডলার যথা সত্বর সম্ভবপর আপনার নিকট যেন প্রেরণ করা হয়।

অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের জন্য আমরা সবিশেষ দুঃখিত। আপনার এই ত্যাগের দ্বারা আপনার স্বদেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতা সহকারে উহা স্মরণ করা হইবে।...

অমন ধারা কোন চিঠিই কিন্তু এল না কোন কালে। দাদামশাইও শেষকালে এমন তিরিক্ষি হয়ে উঠলেন যে তাঁর কথা আমি একরূপ ছেড়েই দিলাম। কোন দিন সামনে পড়লে আমি চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাবতাম এই বুঝি কোন না কোন একটা ছুতোয় গালাগালি দিলেন সুরু করে। সামনে থেকে তিনি চলে গেলে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।

দিদিমার মুখেই যা দু-একটা ছাড়া-ছাড়া কথা শুনেছিলাম দাদামশাই-এর জীবনের। 'গৃহযুদ্ধ' যখন সুরু হয় তিনি ছিলেন তখন ক্রীতদাস। শ্বেতাঙ্গ মুনিবের চক্ষু এড়িয়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন কোন রকমে। এসে যোগ দেন উত্তরের কনফেডারেটদের শিবিরে। বহুদিন তাঁকে গোপনে বড়াই করতে শোনা গেছে: 'ইউনিয়ন আর্মিতে ভর্তি হ'তে যখন আসি ঐ শালা শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহীদের কত জনাকে আইলাম সাবাড় করে।' দাসপ্রথার তিনি ছিলেন সশস্ত্র বিরোধী। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের ঘায়েল করতেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন ইউনিয়ন আর্মিতে। লড়েছিলেন জল-কাদা তুষারের ঝড়-ঝাপটা সব নির্বিচারে মাথা পেতে নিয়ে।...বিজয়ী বেশে তিনি তারপর ফিরেছিলেন দক্ষিণ মুল্লুকে। নির্বাচনের সময় নিগ্রোরা যাতে ভোট দিতে পারে সঙীন খাড়া করে

তাই তিনি পাহারা দিয়েছিলেন ব্যালট্ বাক্স। কিন্তু সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে নিগ্রোদের করা হোল বঞ্চিত। দাদামশাই ভেঙে পড়লেন একেবারে। তাই তিনি এখনও বিশ্বেস করেন, যুদ্ধ বুঝি শেষ হয়েনি। আবার একদিন স্থরু হবে।

নীরবে ঘাড় গুঁজে আমরা সবাই প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। খেতে বসে আমরা কোনদিনই কথাবার্তা বলি না। দিদিমার নিষেধ আছে। বলেন : পাপ হয়। তোমাকে খাওয়ানোর সময় বাধা পাবেন ভগবান! নীরবে খেতে খেতে আমরা সবাই দাদামশাই এর পেন্সনের কথা ভাবছিলাম। আমার বিশ্বাস : শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্তের ঘোরবিরোধী ছিলেন বলেই দাদামশাই তাঁর ন্থায্য দাবী থেকে প্রতারিত হয়েছেন অমন ভাবে। হতে পারে হয়ত আমার এ বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আমার শ্বেতাঙ্গদের প্রতি আতংক!

একদিন বিকেল বেলা ইস্কুল থেকে ফিরতেই অডি মাসী এগিয়ে এলেন। চোখ দুটো তাঁর টকটকে লাল। মুখখানা কাঁপছে আবেগে। বললেন :

'উপরে গিয়ে বিদায় চেয়ে নাও গে দাদামশাই-এর কাছ থেকে।'

'কেনো? কি হোল?'

আমি উপরে ছুটে গেলাম! ক্লার্ক মামার সঙ্গে দেখা হোল সিঁড়িতে। গ্রীনউড্ থেকে তিনি এসে পড়েছেন। দিদিমা এসে আমার হাত ধরলেন। বললেন :

'এসো, বিদায় চেয়ে নাও দাদামশাই-এর কাছ থেকে।'

তিনি আমায় নিয়ে গেলেন দাদামশাই-এর ঘরে। পুরো পোষাক পরে দাদামশাই নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। চোখদুটি নিষ্পলক। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই ঠিক বুঝা গেল না।

'ওগো, এই যে রিচার্ড!' দিদিমা বলে উঠলেন চাপা গলায়।

দাদামশাই এবার আমার দিকে তাকালেন। মুহূর্তখানেক দাঁত বার করে হাসলেন তাঁর সেই চির-পরিচিত হাসি।

'বিদায়, দাদামশাই!' ধরা গলায় আমি বলে উঠলাম।

'চললাম ভায়া!' অস্পষ্ট রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন দাদামশাই।— 'আনন্দের কথা, ভগবান স্ব-স্ব-র্গে আ-আ-স-ন...'

কণ্ঠ তাঁর সহসা রুদ্ধ হয়ে এল। অস্পষ্ট কি যেন বললেন ঠিক বোঝা গেল না। আবার শুধিয়ে নেবো কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু দিদিমা আমায় টেনে নিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চুপচাপ। আস্ত বাড়িটা তারপর ঝিমিয়ে পড়ল। কান্না-কাটি করা হোল না। মাও তাঁর 'রকিং চেয়ারে' বসে রইলেন নিশ্বব্দে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে আর বার বার নাক মুছতে লগলেন। দিদিমা আর অডি মাসী কেবল নিশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এদিক-ওদিক। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম দাদামশাইয়ের মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তের। দাদামশাই তখন কি যেন বলছিলেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। দাদামশাই-এর মুখের শেষ কথা মনে রাখা আমার উচিত বই কি। দিদিমার পিছু পিছু আমি তাই ঢুকে পড়লাম রান্নাঘরে।

'দিদিমা, দাদামশাই তখন কি যেন বললেন না? আমি ঠিক শুনতে পাইনি।'

দিদিমা তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দিলেন মুখের উপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সুপরিচিত তাঁর সেই থাপ্পড়টা।

'চুপ কর! যমদূত শুনতে পাবেন!'

'আমি তো খালি জানতে চাচ্ছি!' আহত ঠোঁট দুটোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে আমি জবাব দিলাম।

দিদিমা তাকালেন কটমট করে। বললেন : 'উনি বলছিলেন, ভগবান স্বর্গে ওঁর আসন নির্দেশ করে দিয়েছেন। যাও এখন বসো গে। ন্যাকামো করো না।'

পরদিন ঘুম ভাঙতেই মা জানালেন : 'দাদামশাই তাঁর স্বগৃহে গমন করেছেন।' দিদিমা এসে বললেন :

'যাও, কোট আর টুপি পরে নাও গে।'

'কি করতে হবে?'

'যা বলছি তাই করো। অতো প্রশ্ন করো না।'

আমি বাইরে যাবার পোষাক পরে নিলাম।

'টমের কাছে গিয়ে জানিয়ে এসো : বাবা 'স্বগৃহে গমন করেছেন'। ও এসে যেন নেয় এখানকার সব কিছু বুঝে-শুনে।'

টম দিদিমার বড়ো ছেলে। হ্যাজেলহার্স্ট থেকে জ্যাক্‌সনে উঠে এসেছেন সম্প্রতি। থাকেন শহরের উপকণ্ঠে। অমন একটা জরুরী খবর নিয়ে কি গড়িমসি করতে আছে? দাদামশাই-এর মৃত্যুসংবাদ এক্ষুনি জানিয়ে আসতে হয় টম মামাকে। দু মাইল পথ আমি একরূপ ছুটে গেলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে। মামার বাড়ির কাছে এসে যখন পৌঁছলাম আমার বুকের ভেতর তখন ঢেঁকির পাড় দিতে শুরু হয়েছে। তবু সিঁড়ির ধাপ কটা কোন রকমে ডিঙিয়ে দরজায় এসে আমি জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলাম। মামার ছোট মেয়ে ম্যাগী এসে দরজাটা খুলে দিল।

'মামা কোথায় রে?'

'বাবা ঘুমোচ্ছেন।'

মামার ঘরের দিকে আমি ছুটে গেলাম। বিছানার কাছে গিয়ে তাঁকে জোরে এক ঝাঁকুনি দিলাম।

'টম মামা, দিদিমা আপনাকে এক্ষুনি আসতে বললেন। দাদামশাই মারা গেছেন।' আমি হাঁপাতে লাগলাম।

আমার দিকে মামা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর একসময় বললেন :

'তুমি একটা পয়লা নম্বরের বোকা! কাউকে তার পিতার মৃত্যুসংবাদ দিতে হয় কি করে জানো না?'

ধীরে ধীরে তিনি উঠে বসলেন। নীরবে বেশ-ভূষা পরে নিতে লাগলেন। মৌন উপেক্ষায় আমাকে বুঝি ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। মিনিট পাঁচের মুখ থেকে তাঁর কোন কথাও বেরুলো না।

'কি চাই আবার?' তিনি সহসা খেঁকিয়ে উঠলেন।

'কিছু না।'

মন্থর পা ফেলে বাড়ির দিকে আমি রওনা হলাম। আর বারবার নিজেকে নিজে শুধোতে লাগলাম : লোকে যেমনটি চায় তেমনটি কেনো আমি করে উঠতে পারি না সুষ্ঠু ভাবে? যা কিছু করতে যাই সবটা অমন থাপছাড়াই বা হয়ে পড়ে কেন? জাগিয়ে তুলে লোকের উদ্বেগ ও বিরক্তি? আমি কি আর ইচ্ছে করে টম মামার মনে অমন আচমকা আঘাত দিতে গিয়েছিলাম? তিনি অমন চটে উঠলেন কেনো? বাপস্, সে কী রাগ! নিজ বাপের মৃত্যুসংবাদের শোকও বুঝি হার মানে তার কাছে। এ সবের কোন উত্তর আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনকে আবার প্রবোধ দিতাম : আমি কী বোকা! কী হয়েছে? এর জন্য ভেবে মরছিও বা কেনো? আমি তো আর বাড়ির কোন ক্ষতি কি অনিষ্ট করতে যাই নি?

দাদামশাইয়ের শবানুগমনে আমায় যোগদান করতে দেওয়া হোল না। বলা হোল বাড়িতে থেকে বাড়ি পাহারা দিতে। ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ে সময়টা আমি কাটিয়ে দিলাম। গোরস্থান থেকে সবাই ফিরে এলেন। কেউ কিন্তু আমায় কোন কথা বললেন না। আমিও কিছু জিগ্‌গেস করলাম না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনচক্র আবার ঘুরে চলল : ঘুম, খাওয়া, ইস্কুল, পড়া, নিঃসঙ্গতা আর অতৃপ্ত আকাঙ্খা, তারপর আবার ঘুম—দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আমি আবার হারিয়ে গেলাম।

জামাকাপড় সব ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঐ সব পরে ইস্কুলে যেতে লজ্জা বোধ হত। ইস্কুলের আর সব ছেলেরা এর মধ্যেই ফুল-প্যাণ্ট স্যুট পরতে সুরু করেছে। ঠিক করলাম, এ নিয়ে দিদিমার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে নেবো। স্পষ্ট জানিয়ে দেব, শনিবার দিন কাজ-কর্ম আমায় কিছু করতে না দিলে এখান থেকে আমি চলে যাবো সটান। কিন্তু কথাটা যখন পাড়লাম দিদিমা কোন কানই দিলেন না। তবু তাঁর পিছু পিছু আমি ঘুরঘুর করতে লাগলাম। জিদ ধরলাম, শনিবার দিন কাজ করতে আমায় অনুমতি দিতে হবে। দিদিমার কিন্তু এক জবাব : না-না-না।

'আমি তবে ইস্কুলে যাবো না।' আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

'যেয়ো না। ইস্কুলে যেতে আমি খুব সাধাসাধি করছি কিনা!'

'এখান থেকে আমি তবে চলে যাবো। আমার কোন খবরও কেউ পাবে না।'

'কই, যাও না দেখি!' দিদিমা মুখ ঝামটা দিলেন।

'চাকরি-বাকরি কিছু একটা আমায় তো জোগাড় করতে হবে?' আমি এবার আমার শেষ শক্তিশেল হানলাম। পরনের শতছিন্ন কোট

আর প্যাণ্টটা দেখিয়ে বললাম :

'এ পরে ইস্কুলে যাই কি করে বলতো? টাকা-পয়সার জন্য আমি তো আর তোমার কাছে হাত পাতছি না। কোন একটা কাজ-কর্ম দেখে নেবো কেবল তারাই তো অনুমতি চাচ্ছি!'

'তুমি ইস্কুলে যাও আর না যাও আমার বড়ো বয়ে গেল।' দিদিমা জবাবটা ছুঁড়ে মারলেন। 'যেদিন থেকে তুমি আর গীর্জার ছায়া মাড়াও না, সেদিন থেকে তুমি তোমার নিজের পথ বেছে নিয়েছ জেনে রেখো। আমার কাছে তুমি মরে গেছো—যীশুর কাছেও মরে গেছো!'

'তোমার ওই পোড়া গীর্জাটাই দেখছি আমার কাল হয়ে দাঁড়াল!'

'খবর্দার, এ বাড়িতে অমন কথা কখ্খনো মুখে আনবে না।'

'সত্যি কথা বলতে আবার দোষ কি?'

'এ জন্য কিন্তু শাস্তি ভোগ করতে হবে ঈশ্বরের কাছে,' দিদিমা জানিয়ে দিলেন—'বিপদে পড়ে তাঁকেই আবার ডাকতে হবে।'

'আমি চললাম চাকরি-বাকরির চেষ্টায়।'

'এখানে তবে থাকা চলবে না তোমার?'

'বেশ, আমি আজই চলে যাবো।' গলার স্বরটা আমার কেঁপে উঠল।

'না। তোমার যাওয়া হবে না।'

'কি, আমি ঠাট্টা করছি ভেবেছো, না?' আমি তাঁকে আমার সংকল্প জানিয়ে দিলাম। 'এক্ষুণি—এ মুহূর্তে আমি চলে যাবো দেখি!'

আমি আমার ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। ছেঁড়া আধ-ময়লা জামা-কাপড় ক'টা দুমড়ানো স্যুটকেশের মধ্যে পুরতে লাগলাম। যাবার জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি, অথচ একটা কপর্দকও যে আমার হাতে নেই খেয়াল হোল না একবারও। দিদিমা ছুটে এলেন দোরগোড়ায়।

'আচ্ছা বোকা একটা! রেখে দে স্যুটকেশ।'

'আমি চললাম চাকরি করতে।'

দিদিমা এসে স্যুটকেশটা ছিনিয়ে নিলেন হাত থেকে। থর থর করে কাঁপতে লাগল তাঁর সর্বাঙ্গ। বললেন :

'বেশ, রসাতলে যেতে চাও যাও! কিন্তু ভগবান সাক্ষী রইলেন, আমি দায়ী নই এ সবের জন্য। তিনি আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমাকে নয়।'

দিদিমা কেঁদে ফেললেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দিদিমার মানবিকতা আজ তাঁর ধর্ম-ভীরুতাকে ছাপিয়ে উঠল বুঝি। স্যুটকেশটা থেকে জামা-কাপড় ক'টা আমি আবার বার করে নিলাম। আজ সত্যিই যেন মনে হোল : দিদিমা আর অডি মাসীর নিকট আমি মরে গেছি নিঃশেষে। ফুরিয়ে গেছি একেবারে। কিন্তু মাকে যখন কথাটা বললাম, তিনি আমায় মৌন সম্মতি দিলেন হেসে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় পা দুটোর উপর ভর করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে কপালে আমার এঁকে দিলেন চুম্বনের অভয় টিকা।

ছয়

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে আমি ছেলেদের কাছে খোঁজ নিতে লাগলাম কাজ-কর্মের। শ্বেতাঙ্গ এক পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল। ঘরের কাজ-কর্ম করে দেবার জন্য ওঁদের একটা ঠিকে ছোকরার প্রয়োজন। সেদিনই বিকেল বেলা ইস্কুল ছুটি হ'লে আমি খোঁজ নিতে গেলাম ওই ঠিকানায়। ঠেঁটা, ঢেঙামত এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। হ্যাঁ, সং একটা ছোকরার প্রয়োজন আছে বটে। বাসন ধোয়া, কাঠ চেরা, ঘর মোছা, বাগান সাফ করার কাজ সব করতে হবে। সকাল, বিকেল— শনিবার দিনও বাদ দিলে চলবে না। বেতন সপ্তা পিছু দুই ডলার। সকালের জলখাবার আর রাত্রির খাবারও মিলবে এখানে।

'কেমন, করবি তো কাজ?' মহিলা শুধালেন।

'হ্যাঁ, কর্তামা।' ভয়ে ভয়ে আমি জবাব দিলাম।

'তা বেশ। কিন্তু তোর কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিতে চাই আগেভাগে। আশা করি সত্য কথা বলবি।'

'হ্যাঁ, কর্তামা!'

'চুরি-চামারি করিস টরিস না তো?' তিনি প্রশ্ন করলেন গম্ভীর হয়ে।

আমি কিন্তু ফেটে পড়লাম হাসিতে। পরক্ষণেই আবার সামলে নিলাম নিজেকে।

'এটা একটা হাসির কথা হোল নাকি?' তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন।

'আচ্ছা কর্তামা কন ত, চুরি-চামারি আমি যদি করেই থাকি, সেটা কি বলে বেড়াবো লোকের কাছে?'

'য়্যাঁ, কি বললি?' মুখখানা তাঁর জ্বলে উঠল বুঝি দপ্ করে।

শ্বেতাঙ্গ জগতে পদার্পণ করেছি পাঁচ মিনিট পূর্ণ হয়নি এখনও। এর মধ্যেই আমি কিন্তু ভুল করে বসলাম! মাথাটা আমার ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। বিড় বিড় করে জবাব দিলাম:

'না কর্তমা, আমি চুরি-চামারি করি না।'

চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বুঝি নিজেকে সংযত করে নিলেন। বললেন:

'দেখ, নিগারদের কোন বে-আদবি কিন্তু খাটবে না এখানে।'

'না, কর্তামা, আমি কোন বেআদবি করবো না।' আশ্বাস দিলাম।

পরদিন সকাল ছ'টায় কাজে এসে হাজির হবো বলে কথা দিয়ে এলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে কেবল ভাবতে লাগলাম: আচ্ছা, চুরি করি কিনা অমন একটা বোকা প্রশ্ন উনি মুখের উপর আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেনই বা কেনো? আমি যদি তাঁকে খুন করার চক্রান্তই করে থাকি, কাজটা কি বলে কয়েই করতে যাবো? এটুকু বোধ শক্তি তাঁর অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এতদিনকার তাঁর ঘুণেধরা পুরাতন স্বভাবটাই বুঝি বাধ সাধিল সব। তাই তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন: 'কি রে ছোকরা, চুরি-টুরি করিস নাকি?' এক অকাট মূর্খ ছাড়া কেউ কি আর জবাব দেবে: 'হ্যাঁ, কর্তামা, আমি চুরি করি!'

এবার থেকে একটানা দীর্ঘ বহুক্ষণ শ্বেতাঙ্গদের পাড়ায় আমায় থাকতে হবে। কপালে কি আছে কে জানে ? ওরা হয়ত ফট করে মেরে বসবে। হয়ত গাল মন্দ করবে। যদি তাই করে আমি বাপু তক্ষুনি ছেড়ে ছুঁড়ে চলে আসব। না—না। চাকরিটা ছাড়া চলবে না। নম্র আর বিনীত হয়েই থাকব। প্রত্যেক কথায় সায় দিয়ে যাবো : হ্যাঁ—আজ্ঞে না, হ্যাঁ কর্তামা—না কর্তামা। কিংবা এমনও হতে পারে, আমি মনে মনে কেবল কুকথাই ভারছি। ওঁরা হয়ত আমায় ভালোও বাসতে পারেন।

পরদিন সকালে কাজে এসে আমি রান্নাঘরের উনানের জন্য কাঠ চিরলাম, কয়লা ভাঙলাম, বাড়ির সমনের চত্তরটা মুছলাম, পেছনের বারান্দা ও রান্নাঘর সব ঝাঁট দিলাম, খাবার এনে টেবিল সাজালাম, বাসন-কোসন সাফ করলাম। কপাল বেয়ে আমার ঘাম ঝরতে লাগল টস্ টস্ করে। বাইরের দেয়ালটা ঝেড়ে মুছে আমি এবার দোকানে ছুটলাম বাজার করতে। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন বাড়ী এসে পৌঁছিলাম মহিলাটি বললেন :

'তোর খাবার রয়েছে রান্নাঘরে।'

'ধন্যবাদ, কর্তামা।'

রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম, টেবিলের উপর এক প্লেট কালো ঝোলাগুড় আর খানিকটা সাদা পাঁউরুটি পড়ে আছে। এই বুঝি আমার খাবার ? কেনো, ডিম, মাংস, কফি...আমি বুঝি ওসবের কিছুই পাবো না ? রুটিটা আমি তুলে নিলাম। কিন্তু দাঁত দিয়ে টেনে একটুও পারলাম না ছিঁড়তে। শক্ত বাসি গেছে হয়ে। যাক গে, গুড়টাই গিলে নি। প্লেটটা আমি মুখের কাছে তুলে ধরলাম। কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ল শাদা সবুজ ছাতার মত টুকরো টুকরো কি যেন সব ভাসছে তার উপরটায়।

ধুত্তেরি...এ আমি খাবো না। পিত্ত আমার জ্বলে উঠল। খাবারটাও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে নেই ? আমি কোটটা গায়ে দিয়ে নিলাম। মহিলাটী এসে ঢুকলেন রান্নঘরে।

'কি, খাবার খেলি নে ?'

'না কর্তা মা, আমার খিদে নেই।'

'কেন বাড়িতেই খাবি বুঝি ?'

'না, আমার আজ কেবল খিদে নেই, কর্তা মা।'

'রুটি আর গুড়ও বুঝি মুখে রুচলো না তোর ?' তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'না-না, কর্তা মা, রুচবে না কেনো আবার ?' আত্মরক্ষা করে নিলাম। জানতে দিলাম না, আমি তাঁর ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করছি।

'দিন দিন কি যে সব হচ্ছে বাপু আজকালকার নিগ্রোরা।' তিনি বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। একবার নাড়লেন মাথাটা। প্লেটের গুড়টার দিকে চোখ রেখে তারপর বলে লঠলেন : 'এভাবে গুড় নষ্ট করা কিন্তু মহা পাপ! রাত্রি বেলার তোর খাবারের জন্য আমি এটা তুলে রাখলাম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা মা।'

গুড়ের রেকাবিখানার উপর আর একখানা রেকাবি তিনি চাপা দিয়ে রাখলেন। রুটিটাও ধরে দেখলেন হাতে। তারপর ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জঞ্জালের মধ্যে। তিনি এবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন :

'তুই কোন ক্লাশে পড়ছিস ?'

'সপ্তম শ্রেণীতে, কর্তা মা।'

'তবে আবার ইস্কুলে যাস কেনো?' তিনি যেন এবারও আকাশ থেকে পড়লেন।

'আমি যে লেখক হতে চাই।' আমি জবাব দিলাম বিড়বিড় করে। মনের কথা জানাতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মুখ থেকে কখন তা খসে পড়ল জবাবদিহি করতে গিয়ে।

'য়্যাঁ, কি হ'তে চাস?'

'লেখক।'

'কেনো?'

'গল্প লিখতে।'

'হ্যা, তুই আবার লেখক হবি!' জবাবটা তিনি ছুঁড়ে মারলেন মুখের উপর। '—ওসব কথা তোর মত এক নিগারের মাথায় আবার ঢুকিয়ে দিল কে?'

আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। না, ও-বাড়ি মুখো আমি আর হচ্ছি না। মেয়েটা আমার অহমিকাকে বুঝি মাড়িয়ে দিয়েছে দু পায়ে নৃশংস-ভাবে। ধরে নিয়েছে আপনা থেকে: জীবনে আমার স্থান কোথায়। আমি কি ভাবি, কি আমি হবো আর না হবো। কথাটা ভাবতেও ঘৃণায় কুঁচকে উঠল মনটা। হয়তো তিনি ঠিকই বলেছেন। জীবনে আমি কখনো লেখক হতে পারবো না। কিন্তু উনিই বা তা বলবার কে?

ও বাড়িতে কাজে লেগে থাকলে হয়ত নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আচরণের অনেক কিছুই জানতে পারতাম অল্পদিনের মধ্যে। কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে আসতে হোল। পোষাল না। বাড়ি ফিরে কিন্তু মিথ্যে কথাই বললাম। জানালাম: শ্বেতাঙ্গ মেয়েটা আর একটি নিগ্রো ছোকরাকে কাজে বহাল করেছে। ইস্কুলে গিয়ে কিন্তু আমি রোজ চাকরির খোঁজ-খবর নিতে ভুললাম না। আর একটা কাজেরও সন্ধান

পেলাম। ইস্কুল ছুটির পর আমি রওনা হলাম তার খোঁজ করতে। এবারকার শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েটিও জানালেন, তাঁর একটা ছোকরার দরকার যে গরু দুইতে, মুরগী ছানাদের খাওয়াতে, শাকসব্জী তুলতে, সকাল আর রাত্রি দু'বেলা টেবিলে খাবার পরিবেশন করার কাজে পারে সাহায্য করতে।

'আমি তো কিন্তু দুধ দুইতে জানিনে কর্তামা?'

'ও মা, সেকি কথা! তোর দেশ কোথায় রে?' তিনি বুঝি কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারলেন না।

'এখানকার এই জ্যাকসনে।'

'এখানে এই জ্যাকসন শহরে থাকিস—জাতে তুই নিগ্রো, অথচ বলছিস, গরু দুইতে জানিস নে?' বিস্ময়ে তিনি ফেটে পড়লেন।

আমি কোন জবাব দিলাম না। শ্বেতাঙ্গ জগৎ সম্বন্ধে নিগ্রোদের বাস্তব জীবনের অ-আ পাঠ আমি তখন নিয়ে নিয়েছি। একজন তো ইতিপূর্বে আমায় দেখেই আব্দার করে বসলেন: আমি চুরি করি কিনা তাঁকে বলতে হবে। আর ইনি যদি আকাশ থেকে পড়েন যে জ্যাকসনে বাস করে এমন কোন নিগ্রো ছেলে দুধ দুইতে জানে না, তাতে অবাক হবার কি আছে? তাই উত্তর দিলাম:

'এখনো শেখা হয় নি, কর্তামা।'

'বেশ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।' নিগ্রো এক ছেলের অসম্পূর্ণ শিক্ষার ভার তিনি নিজে গ্রহণ করলেন ভেবে বুঝি আত্মপ্রসাদ গণলেন। গদগদ হয়ে আবার বললেন: 'খুব সোজা।'

বাড়িটা প্রকাণ্ড। গরু, মুরগী, বাগান সবই আছে। প্রচুর খাবারও মিলবে। পরদিন সকালে কাজে এলাম। সোজা কাজ। তবে অনেক। প্রথমতঃ ওঁর তদারকে দুধ দোয়া, মুরগীর খাঁচা থেকে ডিম কুড়িয়ে আনা,

সাফ করা সেটা। তারপর টেবিলে প্রাতঃরাশ পরিবেশন করা। মাত্র পাঁচখানা আসন: ডিম, মাংস, টোস্ট, জ্যাম, মাখন, দুধ, আপেল... অভাব বলতে কোনটারই নেই। বলামাত্র রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে আসতে আমায় বলে রেখেছিলেন স্ত্রীলোকটি। রান্নাঘরের ঘের-কোণ সবটাই আমি চিনে রাখলাম ভালো করে।

রোগা, পাঁশুটে, এক যুবককে সঙ্গে করে স্ত্রীলোকটি এবার ঢুকলেন খাবার ঘরে। টেবিলের খাবারের উপর একবার চোখ বুলিয়ে যুবকটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল:

'ধুত্তেরি শালা, রোজ রোজ সকালে ডিমের পিণ্ডি গেলা!'

'ও পিণ্ডি আর গিলতে হবে না তোকে, 'কুত্তির বাচ্চা', মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন স্ত্রীলোকটি।

'উনান থেকে তবে ছাই এনে দে না খেয়ে নি চারটিখানি?' এক টুকরো মাংস মুখে পুরতে পুরতে যুবকটাও জবাব দিলে মারমুখো হয়ে।

পায়ের নীচে আমার পৃথিবীটা বুঝি কেঁপে উঠে। মনে হয়, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। এই যদি এখানকার আসল রূপ হয় আমার তাহোলে থাকা চলবে না। এবার এক তরুণী এসে বসলেন টেবিলে।

'এই শালী,' যুবকটা হেঁকে উঠল আবার। 'কি করছিস বসে বসে? শালার খাবারটা ফেলে দিতে পারছিস নে হাঁ-এর মধ্যে?'

'কেনো? নিজের পিণ্ডি নিজে গিলতে পারো না?'

ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম এঁদের দিকে। যুবকটার চোখ দুটি এবার আমার উপর পড়তেই সে খেঁকিয়ে উঠল:

'এই জারাজ নিগ্রো ব্যাটা! শালা, দেখছিস কি রে হাঁ করে? ওই শালার বিস্কুটগুলো নিয়ে আসতে পারছিস নে এখানটায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনছি।'

প্রৌঢ় দুজন লোক এসে এবার বসলেন টেবিলে। এঁরা একে অপরের আত্মীয়-স্বজন কিনা, কিংবা এঁরা একই পরিবারভুক্ত কিনা—আমি পূর্বে সে খবর নিই নি। কিন্তু দেখলাম সমানে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে কারো মুখে কিছু বাধে না।

সকালে খেটে খেটে আমি অবসন্ন হয়ে পড়তাম। সব সময় আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হোত পাছে এদের কাছে যদি আবার গালিমন্দ খেতে হয়, এই অশংকায়। তাই ইস্কুলের যাবার সময় আমি একেবারে ভেঙে পড়তাম। তবু চাকরিটা হাতছাড়া করলাম না। আর যাই হোক, ইচ্ছে মতো পেট ভরে তো খাওয়া চলবে। জীবনে ডিমের মুখ দেখেছিই বা কবে? যত খুশি খাও কেউ কিছু বলতে আসবে না। তাই এক খামলা মাখন গরম স্কিলেট-টার উপর ছেড়ে দিয়ে তির চারটে ডিম ভেঙে আমি ওমলেট তৈয়েরী করে নিতাম! গোগ্রাসে তারপর গিলে নিতাম গিন্নীমা এসে পড়ার পূর্বে। গামলা ভর্তি দুধটাও জলের মত আমি গিলে নিতাম ঢক্ ঢক্ করে দরজার একটু আড়ালে গিয়ে।

পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করায় দুদিনেই আমি চাঙা হয়ে উঠলাম। কিন্তু নতুন একটা সমস্যাও দেখা দিল এর সঙ্গে। ক্লাশে লেখাপড়ায় ভয়ানক পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। শরীরটা যদি সুস্থ সবল হতো কোন বেগ পেতে হোত না। সকাল বিকেল হাড় ভাঙা খাটুনির পরও আমি দিব্যি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এতদিনকার অনাহার ও অর্দ্ধাহারের ফলে কর্মশক্তির প্রাণরস আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল নিশ্বেসে। দুপুরে ক্লাশেই আমি ঝিমিয়ে পড়তাম একান্ত অবসাদে। মনে হোত শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্র ছাত্রী সকলের মুখর জগৎটা ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। আমি তখন ঘুমে ঢলে পড়তাম।

বারান্দায় ছুটে গিয়ে এক রাশ ঠাণ্ডা জল চোখে মুখে গায়ের উপর ছিটিয়ে দিতাম। চেষ্টা করতাম জেগে থাকবার।

চাকরিটা নেবার ফলে আর একটা কিন্তু সুবিধা হোল। দুপুরের ছুটিতে আমিও ভিড় করে মোড়ের মুদির দোকানটার দিকে ছুটে যেতাম। কাউণ্টারের দিকে কড়কড়ে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে খুশি মত কিছু একটা কিনতাম। স্যানডুইস খেতাম অপর সব ছেলেদের সঙ্গে বসে। নিজ নিজ শ্বেতাঙ্গ মনিব বাড়ির আলাপ-আলোচনায় মেতে যেতাম মশগুল হয়ে। মুনিব বাড়ির দৈনন্দিন ঝগড়া ঝাঁটি অশ্রাব্য গালাগালি আর মান অভিমানের বিশদ বিবরণ জানিয়ে আমিও ফোড়ন কেটে উঠতাম। গিন্নির চোখের আড়ালে চুরি করে খাওয়াটার কাহিনীও জানিয়ে দিতাম সবিস্তারে। বন্ধুদের চোখদুটি বুঝি তখন চকচক্ করে উঠত ঈর্ষায়। নতুন কেনা আমার পোষাক পরিচ্ছদও তখন কেউ কেউ দেখত পরীক্ষা করে। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমরা কিছু না কিছু কিনতাম নতুন। দামের জন্য কোন ভাবনা নেই। নগদ পঞ্চাশটা সেণ্ট দিলেই হল। আর বাদবাকিটা সপ্তা পিছু পঞ্চাশ সেণ্ট কিস্তিতে। আমরা যে তাতে ঠকছি তা সবাই জানতাম। কিন্তু উপায় নেই। নগদ দাম দিয়ে কিনবার মত পয়সাও বা কোথায়?

মা দ্রুত সেরে উঠতে লাগলেন। নিজের বাড়ি ঘর তিনি আবার করবেন বলেও আশা করতে লাগলেন। শুনে আমার খুব আনন্দ হোল। পাড়ার এক 'মেথডিস্ট চার্চে'ও মা যাওয়া আসা শুরু করলেন দিদিমার রাগ ও নিষেধ উপেক্ষা করে। রবিবারের গীর্জায় আমিও সঙ্গে যেতাম। মা খুব ধরে পড়েছিলেন বলে নয়। যেতাম সহপাঠিদের সঙ্গে গল্প গুজব করতে।

নিগ্রো প্রোটেস্টাণ্ট চার্চের সংস্পর্শে এসে এক নতুন জগতের দ্বার

খুলে গেল : এখানে এসে প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম ফিফ্‌ট পিউরিটান অনেক মেয়েদের যাঁরা পাবলিক ইস্কুলে পড়ান। সাক্ষাৎ পেলাম নিগ্রো এমন সব কলেজ ছাত্রদের যারা আবাদী চাষী গন্ধ লুকিয়ে রাখতে সর্বদা থাকে সচেষ্ট। সন্ধান পেলাম এমন সব নিগ্রো ছেলে মেয়েদের যারা শৈশব অতিক্রম করে কৈশরের স্বপ্নময় জগতে পদার্পন করেছে সবে মাত্র। দেখলাম বিপুল বক্ষ নিগ্রো ও পীতাঙ্গ চার্চ তত্ত্বাবধায়িকাদের, নিগ্রো খানসামা আর দারোয়ানদের যারা গীর্জায় ভজনের ধুয়া ধরে জোর গলা চড়িয়ে। ভাসা ড্যাবড্যাবে নিরীহ গোছের ধোপা মেয়েদেরও দেখলাম যারা ভজনের সময় চিৎকার করে, নাকিস্থরে কান্না করে আর নাচে। ভুড়িওয়ালা নিগ্রো যাজকদের আর শিরা-বেরিয়ে-পড়া বুড়ি ঝিদেরও সন্ধান পেলাম নতুন এই জগতের সংস্পর্শে এসে। দেখলাম ন্যাকামি, নিজেদের সস্তা খোলা পোষাক পরিচ্ছদ দেখানোর বাহার, সামাজিক দলাদলি, ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাটি আর কলহ ঈর্ষা, গল্প নিয়ে মেতে আছে এঁরা।...আমার ভালও লাগত আবার লাগতও না। ইচ্ছে হোত ওদের সঙ্গে মিশে যাই। কিন্তু কাছে এলে পরক্ষণেই আবার মনে হোত : আমি যেন ছিটকে পড়েছি লক্ষ যোজন দূরে।

গীর্জায় কিসের এক উৎসব শুরু হয়েছিল। সহপাঠীরা সবাই ধরে বসল আমায় যোগ দিতে হবে। মারও খুব ইচ্ছে, আত্মার উদ্ধারের জন্য গীর্জার সভ্য হয়ে পড়ি আমি। ধর্মে কর্মে আমার তেমন কোন চাড় নেই বারবার বলা সত্ত্বেও ছেলের দল পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

‘সে কি, ভগবানে বিশ্বেস করিস নে?’

প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে গেলাম।

‘নতুন দিন—সমারোহ করে অমন উৎসব হচ্ছে।’ ছেলের দল জিদ

করতে লাগল। 'চার্চে গিয়ে আমরা তো আর হেসে খেলে কাটাতে পারিনে? এবার সভ্য হয়ে নে ভাই।'

'ও সব আমি জানি টানি না ভাই।' আমি জবাব দিলাম।

'বেশ আমরা তোকে আর পেড়াপীড়ি করছিনে।' বুঝি ওরা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আমাকে এবার থেকে দলছাড়া হতে হবে।

উৎসবের শেষ দিন যাজক মশাই নতুন এক চাল চাললেন। গীর্জার সমবেত সভ্যদের তিনি তখন উঠে দাঁড়াতে বললেন। উপস্থিত অনেকই উঠে দাঁড়লেন। এবার তিনি দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন যে সব খ্রীষ্ট-ধর্মী এখনও কোন গীর্জার সম্প্রদায়ভুক্ত হন নি তাঁদের। এবারও উঠে দাঁড়ালেন কিছু লোক। এখন তিনি ছাঁটাই করে নিলেন আমাদের মত বাদবাকী জন কয়েক বিধর্মী ছোকরাকে যারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। এভাবে পাপীদের আলাদা করে নিয়ে তিনি 'ডিকন'দের আদেশ দিলেন আমাদের নিয়ে যেতে অপর এক ঘরে। চোখ তুলে মার মুখের দিকে আমি একবার তাকালাম। চোখে তাঁর কাতর মিনতি। ঘাড় হেঁট করে চললাম ওদের সঙ্গে। পাশের ঘরে ঢুকে দেখলাম, যাজকমশাই দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। মুচকি মুচকি তিনি হাসছেন। এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন।

'যুবকগণ,' ক্ষিপ্র কড়কড়ে গলায় তিনি বলে উঠলেন সহসা। 'তোমাদের সকলকে আমি ঈশ্বরের সহিত পরিচয় করে দিতে চাই। আমি তোমাদের কোন গীর্জার সভ্যভুক্ত হতে অনুরোধ করছি না। কিন্তু ভগবানের দীন সেবক হিসেবে এ কথা আজ তোমাদের জানিয়ে দেওয়া আমি উচিত মনে করি যে তোমরা বিপন্ন। সম্মুখে ঘোরতর দুর্যোগ। তোমাদের জন্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং তোমাদের সকলের নিকট আমার একটি আবেদন: এ গীর্জার কোন এক

সভ্যকে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে দাও ভগবানের নিকট। নির্মম, নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ নরাধম এখানে কি এমন কেউ আছে যে তাতে আপত্তি করবে? বিমুখ করতে পারে এখানকার সমাজের কোন সাত্ত্বিক সভ্যকে এদের হয়ে একটু প্রার্থনা করতে ভগবানের কাছে?'

নাটকীয় ভাবে তিনি সহসা থেমে গেলেন। সবাই রইল ঘাড় হেঁট করে।

কেউ কোন সাড়া দিল না। যাজক মশাই-এর আবেদনের প্রত্যেকটি ধার প্যাঁচ আমার নিকট অপরিচিত নয়। তবু আমি বোকার মত চুপ করে বসে রইলাম। পাপের চাইতে বিরক্তির বোঝাই কণ্ঠ আমার উঠল ছাপিয়ে। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়?

'এখানে এই ঘরে এমন কি কেউ আছে যে ভগবানের মুখের উপর না বলার সাহস রাখে?' যাজকমশাই আবার প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চুপ নীরবতা। কারো মুখে কোন কথা নেই।

'নাও, এবার ওঠো। গীর্জায় গিয়ে বসগে সামনের বেঞ্চিতে।' মোক্ষম নির্দেশ হানতে তিনি বুঝি এক ধাপ এগিয়ে এলেন।'—নাও, এবার ওঠে!' যাদুকরের মত তিনি প্রশস্ত দু'হাত ওঠালেন ওপরে। সম্মোহিত যে ছেলেটি প্রথম উঠে দাঁড়ালে তাকে তিনি উৎসাহিত করলেন: 'বেশ, ছোকরা বেশ!'

গীর্জাঘরে গিয়ে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম ভিজে কাকের মত। চাপা মৃদু কণ্ঠে ভজন গান তখন সুরু হয়েছে:

জানি না তো, এ বুঝি মোর শেষ খেয়া...

যাজকমশাই এবার আর এক নতুন প্যাঁচ কষলেন। ভজনের মাঝখানে তিনি সহসা বলে উঠলেন:

'এ সকল যুবক সন্তানদের মায়েরা কি কেউ এখানে আছেন?'

আরও জন কয়েকের মত মাও উঠে দাঁড়ালেন সগর্বে।

'আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন এদিকে।' যাজকমশাই নির্দেশ দিলেন।

অনেকদিনকার মুলতুবী আমার মুক্তির দিনটা বুঝি আজ এসে গেল! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মা তাই এগিয়ে এলেন। চোখে তাঁর হাসি ও কান্না। অপর মায়েরাও তাঁদের ছেলেদের ঘিরে ধরলেন। কাতর মিনতি করতে লাগলেন চাপা গলায়।

পাদ্রী মশাইয়ের উদাত্ত কণ্ঠ ভেসে এল। জননীদের উদ্দেশ করে তিনি বললেন: আপনারা হলেন মাতা ম্যারীর প্রতীক। আপনাদের সন্তানদের জন্য—আপনাদের একমাত্র পুত্রদের জন্য নতজানু হয়ে একবার প্রার্থনা করুন!'

মা নতজানু হলেন। হাতদুটো আমার আঁকড়ে ধরলেন। টস্ টস্ করে আমার হাতের উপর ঝরে পড়তে লাগল উত্তপ্ত অশ্রু। বুঝলাম মা কাঁদছেন। সারা দেহ আমার বুঝি কুঁচকে উঠল ক্ষোভ ও অপমানে। বেশ পেতেছে দেখছি ফাঁদটা আমাদের সমাজ! ধরা পড়ে গেলাম আমরা সবাই। সকলের চোখের উপর আজ নতজানু হতে হচ্ছে আমাদের জননীদের। বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ প্রার্থনা করে বেড়াতে হচ্ছে আমাদের জন্য। শেষ হোল ভজন। পাদ্রীমশাই এবার অত্যন্ত আবেগময় এক রূপক কথামৃত সুরু করলেন। ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন: গর্ভধারিণী আমাদের জননীরা দশ মাস দশ দিন আমাদের গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছেন, শৈশবে কত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে আমাদের করেছেন লালন পালন, আমরা একটু অসুস্থ হয়ে পড়লে কী দারুণ উৎকণ্ঠায় না দিন তাঁদের যাপন করতে হয়েছে; এখন আমরা বড়ো হয়ে উঠেছি। ওঁরা এখন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। মা-রা সর্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।...

পাদ্রীমশাই এবার নতুন একটা ভজন সুরু করতে আদেশ করলেন। গান সুরু হোল গুন গুন করে। করুণ সুরে তিনি তখন বলে উঠলেন: "প্রকৃত স্নেহময়ী এমন কোন মাতা কি এখানে নাই যিনি তাঁহার সন্তানের দীক্ষার জন্য সর্বাগ্রে আগাইয়া আসেন?"

শালার নিকুচি করি! এর মধ্যেই পেড়ে বসলেন কথাটা! আমি বুঝি বিড় বিড় করে উঠলাম। আমার দিকে চোরাভাবে তাকাচ্ছেন দেখলাম মাকে।

'আয় বাবা, তোর বুড়ি মাকে তোর হাত ধরে নিয়ে যেতে দে ভগবানের সাক্ষাৎ।' মা কাকুতি করতে লাগলেন।—'তোকে পেটে ধরেছি। তোর আত্মার উদ্ধারের কাজে সাহায্য করতে দে এবার আমায়।'

মা এসে আমার একখানা হাত ধরলেন। আমি পিছিয়ে এলাম।

'আমি তোর মা হই না? বাবা, কষ্ট দিবি মার মনে?' মা এবার কেঁদে ফেললেন।

'সব শুনছেন গো সব শুনছেন স্বয়ং ভগবান।'

পাদ্রীমশাই মাকে বুঝি উৎসাহিত করলেন।

মানুষের আত্মার এই উদ্ধার ব্যবসায়ে কি এতটুকু কোন নীতিবোধ নেই? বিবেক নেই? নেই কি কোন বাধ-বিচার? মানুষের স্নেহ বন্ধনের প্রত্যেকটি সুকোমল দলকে নেওয়া হয় দুমড়ে, মুচড়ে, নিংড়ে। চলে নির্লজ্জ শোষণ। এক কথায় গীর্জার সভ্য হতে অস্বীকার করার অর্থই সূচিত করে আমাদের নৈতিক অধঃপতন! অর্থাৎ সমাজচ্যুত হওয়া। 'আমেন' ও 'হ্যালেলোয়া'র বিপুল স্বস্তিকা মন্ত্র উচ্চারণ ও স্তোত্র বন্দনার মধ্যে এক মা তো তাঁর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেকে ঠ্যাঙিয়ে ঠ্যাঙিয়ে নিয়ে এলেন পাদ্রীমশাই-এর নিকট।

'তুই কি তোর পঙ্গু বুড়ো মাকে ভালোবাসিস নে, রিচার্ড?' মা

শুধালেন।—'বাবা, আমি কি কেবল শুধু হাতে দাঁড়িয়ে থাকবো?' বুঝি তাঁর ভয় হোল, পাছে আমি তাঁকে অপমানিত করে বসি সকলের সম্মুখে।

ভগবানে আমি বিশ্বাস করি কিনা এবার আর সে প্রশ্ন উঠল না। চুরি করো, মিথ্যে বলো কিংবা খুন করো—কিছু তোমাদের এসে যাবে না। 'মুখ রাখাই' বড়ো সব চাইতে—জরুরী। সমাজের আর সবাই-এর সাথে তোমাকেও চলতে হবে এক তালে। পান থেকে চূণ খসাবার উপায় নেই। আর তুমি যদি রাজী না হও, তার অর্থ তুমি তোমার মাকে পর্যন্ত ভালোবাসো না। জলে বাস করতে হলে ভয় করতে হয় কুমীরকে। গোঁড়া ওই সঙ্কীর্ণ নিগ্রো সমাজকে উপেক্ষা করতে যাওয়া মানে বাতুলতা, খেয়াল আছে? মা আমায় টেনে নিয়ে গেলেন হাত ধরে। পাদ্রীমশাই-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর করমর্দন করলাম। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম: ব্যাপ্‌টিজমের দীক্ষায় আমিও সম্মত। রাত দুপুর পর্যন্ত একটানা গান-ভজন, প্রর্থনা আর স্তোত্র পাঠ চলল সমানে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, অমন একটা গুরু গম্ভীর সম্মতিজ্ঞাপনের পরও আমার মনে কিন্তু কোন রেখাপাত করল না। তাই মাকে বললাম: 'কই মা, আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।'

মা জবাব দিলেন: 'না, ব্যস্ত হোস নে। ক্রমশ সব হবে।'

রবিবার এসে গেল। আমি আমার তোলা পোষাক পরিচ্ছদ পরে নিলাম। অপর ছেলেরাও আমার মত সেজে গুজে গীর্জায় এসে উপস্থিত হোল আত্মোদ্ধারের উদ্দেশ্যে। এবার ডাক পড়ল আমাদের। ভেতরে ঢুকে আমরা প্রথম বেঞ্চিতে সার দিয়ে দাঁড়ালাম। শুভ্র পোষাক পরে পাদ্রীমশাই এগিয়ে এলেন সামনে। একটা ছোট পল্লব ডুবিয়ে নিলেন প্রকাণ্ড এক পাত্র জলের মধ্যে। প্রথম ছেলেটার মাথার উপর পল্লবটা দিয়ে জল ছিটিয়ে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন:

'পরম পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষিত করিলাম।'

ছেলেটার চিবুক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল টস্ টস্ করে।

প্রত্যেকটা ছেলেকে এক এক বার করে পল্লবের জল ছিটিয়ে তিনি দীক্ষা দিয়ে চললেন। এবার এল আমার পালা। কেমন ঘাবড়ে গেলাম। মুখ কান আমার লাল হয়ে উঠল। হচ্ছে কি? চিৎকার ছেড়ে পাদ্রীমশাইকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হোল। মুখ দিয়ে কিন্তু একটা কথাও বেরুলো না। পল্লবের ফোঁটা ফোঁটা জল আমার মাথায় আর নাকে মুখে পড়তে লাগল। গড়িয়ে পড়তে লাগল ঘাড় বেয়ে। ভিজে গেল বুঝি পিঠটা। আমি গা মোড়া দিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। রেহাই পাওয়া গেল। এবার বুঝি পাদ্রীমশাই পাশের ছেলেটাকে সিক্তিত করতে চললেন পবিত্রজলে। একটা হাঁপ ছাড়লাম। আমি দীক্ষিত হলাম।

সাত

গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের খড়খড়ে দিন। খিদেটা কিন্তু এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমার চেতনাকে। দাদামশাই মারা যাবার পর টাকা-কড়ির টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। তাই বাড়ির উপরের তলাটা ভাড়া খাটানো হয়েছিল টম মামার নিকট অল্প ভাড়ায়। লোকে সব সময় গিস-গিস করত বাড়িতে। হল ঘর দিয়ে পাশ কেটে যাবার সময় আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গে দেখা হলেই ওরা অমনি চোখ দুটি নামিয়ে নিতেন! কারো মুখে কোন কথাই নেই। উপাসনা সেরে আমরা নাকে-মুখে কিছুটা খাবার গুঁজে দিতাম। মা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন ক্রমশ সেরে উঠতে লাগলেন। তবে তাঁকে আজীবন খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে, এই যা। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইস্কুল খুললে ভর্তি হওয়া আমার হবে কিনা কে জানে? নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসল। খালি পড়া। চাকরি খোঁজা। উত্তর মুলুকে পালিয়ে যাবার দিবাস্বপ্ন দেখা খানিকটা। আচ্ছা, মাকে ফেলে গেলে এ অবস্থায় কি দশা হবে তাঁর? নতুন শহরে গিয়ে আমারও বা কি হবে কে জানে? সংশয় দানা বাঁধে। ভয়ে শুকিয়ে আসে গলাটা। আমার বন্ধুরা

ইতিমধ্যে পুরো লম্বা-স্যুট কিনতে শুরু করেছে। এক একটা স্যুটের দাম সতেরো থেকে কুড়ি ডলার। অত টাকা আমি বুঝি চক্ষেও দেখিনি! ১৯২৪ সালে এই ছিলো আমার বাস্তব পরিস্থিতি।

নিকটবর্তী এক ইটের পাঁজায় জন খাটবার লোক নেওয়া হচ্ছিল। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। খোঁজ নিতে গেলাম আমিও। রোগা লিকলিকে শরীর। এক শ' পাউণ্ডও ওজন হবেনা দেহের। ইটের পাঁজায় জন খাটতে আমি তবু ছুটলাম। জল যোগানদার ছোকরার কাজটা পেয়ে গেলাম। তলব এক ডলার করে। প্রচণ্ড রৌদ্রে পিতলের প্রকাণ্ড এক কলসী মাথায় করে ইট-খোলায় আমি ঘুরে বেড়াতাম। দলে দলে নিগ্রো মজুরেরা কাজ করে চলেছে ঘাড় গুঁজে। পাশ কেটে যাবার সময় টিনের মগে করে আমি তাদের জল ঢেলে দিতাম। প্রথমে একটা কুল-কুচি করে খানিকটা জল দিয়ে ওরা একবার ধুয়ে নিত মুখখানা। তারপর জলটা পান করে নিত লম্বা এক চুমুকে। চুইয়ে চুইয়ে ওদের তখন ঘাম পড়ত কপাল বেয়ে। কলসীটা আবার ঘাড়ে করে পাশ কেটে যাবার সময় আমি চিৎকার করে উঠতাম:

'জল চাই-ই—জল!'

গলা খাঁকরি দিয়ে কেউ হয়ত তখন বলে উঠত: 'এই যে ছোকরা, এ দিকে।'

কিছুদিন পর ইটের পাঁজায় আর একটা চাকরীও জুটে গেল। কাজটা হোল পাঁজায় ঘুরে ঘুরে ফাটা, ভাঙা-চোরা ইট কুড়ানো। ইটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তারপর এক চৌবাচ্চায় ফেলে আসা। বেতন সপ্তাহ পিছু দেড় ডলার করে।

এখানে একটা মস্ত ভয় কুকুরের। কুকুরটা ইটখোলার কর্তা বাবুর। ইট খোলার এদিক ওদিক ওটা ঘুরে বেড়াত। লাফালাফি

করত। ডাক ছাড়ত। নিগ্রো মজুরেরাও ক্ষেপিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলত কুকুরটাকে। থামাকা ছুঁড়ে মারত ইটের টুকরো। কুকুরটাকে দেখলে আমিও একখানা ইট তুলে নিয়ে ভয় দেখাতাম। লেজ গুটিয়ে ওটা তখন পালিয়ে যেত। একটু পরেই আবার ফিরে আসত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। ইতিপূর্বে বহু নিগ্রো মজুরকে কামড়িয়েছে কুকুরটা। বিষ লেগে অনেকে পাগলও হয়ে গেছে। কুকুরটাকে বেঁধে রাখবার জন্য তার মালিককে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হন নি।

একদিন বিকেল বেলা ভাঙা ইটের বোঝা নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম চৌবাচ্চার দিকে। আমার উরুতে সহসা কে যেন ধারাল দুপাটি দাঁত দিল বসিয়ে। আমি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালাম। কুকুরটা কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়ল। ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে। কুকুরটাকে আমি তাড়িয়ে দিলাম। ট্রাউজারটা খুলে ফেললাম একটানে। মাংসের উপর দাঁত দুপাটি বেশ বসে গেছে। লাল হয়ে উঠেছে। ভয় হতে লাগল: যদি বিষটা লেগে যায়। কর্তাবাবুর কুকুরে আমায় কামড়িয়েছে বলে জানিয়ে আসতে আমি ছুটলাম আফিসে। দীর্ঘ শ্বেতাঙ্গিনী এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল আফিস্ ঘরে।

'কি চাই ?' মেয়েটি প্রশ্ন করলে।

'কর্তাবাবুর সঙ্গে একবার মোলাকাৎ হবে, দিদিমণি ?'

'কেনো ?'

'কর্তাবাবুর কুকুরে আমায় কামড়ে দিয়েছে দিদিমণি। মনে হচ্ছে বিষটা লেগে যাবে।'

'কই দেখি, কোথায় কামড়িয়েছে ?'

'পায়ে দিদিমণি!' ক্ষতস্থানটা দেখাতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। মিথ্যে কথা বললাম।

'কই দেখি না!'

'না, দিদিমণি। কর্তাবাবুর সঙ্গে একবার মোলাকাৎ হবে না?'

'উনি এখন নেই এখানে।' মেয়েটি আবার টাইপ করতে বসে গেল।

আমিও আবার ফিরে গেলাম কাজে। ক্ষত স্থানটা বার বার দেখতে লাগলাম পরীক্ষা করে। ফুলে উঠেছে। জ্বালা করছে।

বিকেলের দিকে দীর্ঘ এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এলেন আমার নিকট। পরনে তার সাদা শীতের স্যুট। মাথায় পানামা টুপি।

'সেই নিগ্রোটা না?' আমায় দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন অপর এক নিগ্রো ছেলেকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' ছেলেটা জবাব দিল।

'এই ব্যাটা নিগার, এদিকে আয়।' ভদ্রলোক আমায় ডাকলেন।

আমি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম।

'এরা বলছিল আমার কুকুর নাকি তোকে কামড়িয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ট্রাউজারটা তুলে ধরে আমি তাঁকে দেখালাম ক্ষতস্থানটা।

'হুঁ।' তিনি হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠেঃ 'কুকুরে কামড়ালে পর কিছু হয় না নিগ্রোদের।'

'কিন্তু দেখুন কর্তা, অনেকখানি ফুলে উঠেছে, জ্বালা করছে।'

'তাতে হয়েছে কি?' তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন।—'আমি তো জন্মে কখনো শুনিনি কুকুরের কামড়ে মারা গেছে বলে কোন নিগ্রো!'

তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর হন হন করে চলে গেলেন। ভাঙ্গা-ইট-কুড়ানো অপর নিগ্রো ছেলেরাও এসে জড়ো হয়েছিল। কাঁচা

ইটের পাঁজার আড়ালে ভদ্রলোকের দীর্ঘ দেহ মিলিয়ে যেতেই ওরা বলে উঠল এক সঙ্গে :

'শালার ব্যাটা শালা !'

'শালা তোরও একদিন আসবে !'

'দেখলি তো ভাই, শালাদের কলজেটা একেবারে পাষাণ !'

'সব কিছুই করতে পারে শালারা ।'

একটা নিগ্রো ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এলো । কানে কানে বলল :

'তুই ভাই কোন ডাক্তারকে দেখা ।'

'কিন্তু টাকা পাবো কোথায় ?' আমি জবাব দিলাম ।

দিন দুই কেটে গেল । সৌভাগ্যক্রমে ক্ষতস্থানের ফোলাটা মিলিয়ে গেল ভালোয় ভালোয় ।

আমি তখন ইস্কুলের অষ্টম মানে পড়ি । চিরন্তন ক্ষুধা ও অভাব অনটনের মধ্যেই দিন যাচ্ছিল কেটে । দিন দিন আমি আত্মসচেতন হয়ে উঠছিলাম । একদিন বিকেল বেলা ক্লাশে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম । ভালো লাগছিল না কিছু । রচনার বইখানা খুলে ভাবলাম : আচ্ছা, একটা গল্প লিখলে কেমন হয় ? চন চন করে গল্পের একটা প্লটও এসে গেল মাথায় : কোন এক পাপাত্মা এক দুঃস্থ বিধবাকে প্রতারিত করে বাড়িখানা তার হস্তগত করবার ষড়যন্ত্র করছিল । কাহিনীটার আমি নাম দিলাম : 'দি ভুডো অব্ দি হেলস্ হাফ্-একার !' গল্পের পট-ভূমিকাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও আবেগময় । কিছুটা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকও । তিন দিনে গল্পটা আমি শেষ করে ফেললাম । এবার সমস্যা দেখা দিল : কি করি এবার গল্পটা নিয়ে ?

স্থানীয় নিগ্রো পত্রিকা আফিসে গিয়ে ধর্ণা দিলে কেমন হয় ? হ্যাঁ, সেই ভালো ।…তক্ষুনি আমি পত্রিকা আফিসের দিকে রওনা হলাম ।

সম্পাদক বলে অভিহিত এক ভদ্রলোকের নাকের ডগায় আমার গল্পের পাণ্ডুলিপিটা ধরলাম তুলে।

'কি ওটা?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'একটি গল্প।'

'কি, সংবাদ গল্প?'

'না, কাল্পনিক।'

'বেশ। পড়ে দেখব'খন।'

হাত বাড়িয়ে তিনি আমার পাণ্ডুলিপিটা নিলেন। রেখে দিলেন ডেস্ক-এ। মুখের পাইপটা দাঁতে চিবিয়ে ধরে কৌতূহলী চোখদুটি তুলে ধরলেন আমার দিকে।

'না, এক্ষুনি পড়ে দেখুন।' আমি আবদার জানালাম।

তিনি এবার একটু হাসলেন চোখ ঠেরে। সংবাদপত্র অফিস কি ভাবে কাজ করে আমার কিছু জানা ছিল না। তাই ভেবেছিলাম গল্পটি হাতে পেয়ে সম্পাদক মশাই বুঝি তক্ষুনি পড়ে ফেলবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমায় হ্যাঁ-না একটা জবাবও হয়ত দিয়ে দেবেন।

'গল্পটা পড়ে কাল তোমাকে আমি মতামত জানাবো।' সম্পাদক মশাই জবাব দিলেন।

আমি ভয়ানক দুমড়ে গেলাম। অত কষ্ট করে লিখলাম গল্পটা। সব পরিশ্রম বুঝি পণ্ডই হোল।

'না, আমার গল্পটা তবে দিয়ে দিন।' আমি হাত বাড়ালাম।

তিনি এবার আমার দিকে তাকালেন। পৃষ্ঠা দশেক পাণ্ডুলিপিটার পড়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। বললেন:

'কাল একবার আসতে পারবে না? আমি তাহোলে সবটা পড়ে নিতাম।'

বেশ, আমি না হয় কাল আবার আসব। আমি সম্মত হলাম। জানি গল্পটা উনি আর পড়বেন না। তবু পরদিন বিকেল বেলা কাজে যাবার পথে পত্রিকা আফিসে আমি একবার ঢুঁ মারলাম।

'কই, আমার গল্পটা কোথায় ?'

'ওই যে গ্যালিতে।'

'য়্যাঁ ?' গ্যালি কি আমি জানিতাম না। বিস্মিত হয়ে তাই তাকিয়ে রইলাম।

'ওটা এখন কম্পোজ হচ্ছে।' তিনি জবাব দিলেন। 'ওটা বেরুবে।'

'আমি কত টাকা পাবো ?' বুঝি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। প্রশ্ন করে বসলাম সিধে।

'গল্পের জন্যে আমরা তো টাকা দিই না।'

'কিন্তু কাগজ বেচে তো টাকা নেন আপনারা ?'

'তা নিই। কিন্তু তুমি তো এখনো লিখছো সবেমাত্র ?'

'হুঁ, ইদিকে আমায় তো খুব বলছেন বিনি পয়সায় লিখতে, বিনি পয়সায় আপনারা কি কাগজ বিক্রী করেন ?'

ফিক করে তিনি এবার হেসে ফেললেন। বললেন :

'তুমি তো লিখছ সবে মাত্র। এ গল্পটার মারফৎ তুমি যে আমাদের পাঠকদের নিকট পরিচিত হতে পারবে, সেটা কি কম ?'

'কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন গল্পটা ভালো কাটবে, তবে কিছু পারিশ্রমিক দেবেন না কেনো আমায় ?'

তিনি আবার হেসে উঠলেন। বুঝলাম আমার কথায় তিনি মজা পাচ্ছেন খুব। বললেন :

'আমি তোমাকে লিখবার সুযোগ দিচ্ছি। টাকার চাইতে তার মূল্য কিন্তু অনেক বেশী।'

এবার আমার মনটা গলে গেল। বললাম: 'গল্পটা কবে বেরুবে?'

'গল্পটাকে আমি তিন কিস্তিতে দেবো ঠিক করেছি। প্রথম কিস্তি যাচ্ছে এ সপ্তাহে।' তিনি জানালেন। 'আচ্ছা, তুমি আমাদের জন্য কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারো না? পাতা হিসেবে তাহোলে টাকা পেতে?'

'সকাল-বিকেল দুবেলাই আমি যে কাজ করি। হপ্তা পিছু তিন ডলার করে পাই মাইনে।'

'ওঃ, তা বেশ! কাজটা করো। গ্রীষ্মের ছুটিতে কি করছো?'

'কিছু না।'

'কোন কাজ নেবার আগে তবে তখন তুমি আমার নিকট একবার এসো। এদিকে গল্পসল্পও লিখতে থাকো আরও।'

দিন কয়েক পর ক্লাশের ছেলেরা আমায় ঘিরে ধরল। হাতে তাদের একখানা করে 'সাউর্দান রেজিস্টার।' চোখে তাদের উপচে পড়ছে বিস্ময়।

'সে কি, তুই লিখেছিস নাকি গল্পটা!'

'হ্যাঁ।'

'কেনো রে!'

'লিখতে ইচ্ছে হোল।'

'কোথায় পেলি ওটা?'

'নিজেই লিখলাম!'

'লিখেছিস না আর কিছু! কোন বই থেকে ঠিক মেরে দিয়েছিস।'

'তা হোলে কেউ ছাপতো না।'

'কিন্তু ওরা এটা ছাপছে কেনো?'

'লোকে যাতে পড়তে পারে ?'

'তোকে কে বলেছে গল্প লিখতে।'

'কেউ না।'

'তবে লিখলি কেনো ?'

'এমনি ইচ্ছে হোল।'

ছেলেরা কিন্তু কেউ বিশ্বেস করল না। ভাবলে আমি মিথ্যে কথা বলছি। বুঝতে চেষ্টা করল না লোকে কেনো গল্প লিখতে চায়। তা ছাড়া ওরা কেউ মানেও বুঝল না 'দি ভুডো অব দি হেলস্ হাফ-একার'-এর। তাই এক নতুন দৃষ্টি থেকে ওরা দেখতে লাগল আমায়। দ্বিধা ও সংকোচ মাথা তুলে দাঁড়াল আমাদের মধ্যে। ওরা বুঝি সরে দাঁড়াল দূরে।

এ নিয়ে বাড়িতেও তুমুল ঝড় উঠল। একদিন সকালবেলা দিদিমা এসে হাজির হলেন আমার ঘরে। চেপে বসলেন তিনি বিছানার এক ধারে। বললেনঃ

'রিচার্ড, তুই নাকি কি সব লিখছিস কাগজে ?'

'হ্যাঁ, একটা গল্প।'

'কি নিয়ে ?'

'এমনি একটা গল্প দিদিমা।'

'কিন্তু ওরা বলছিল, সেটা নাকি তিনবারে বেরুবে ?'

'হ্যাঁ একই গল্প, তবে বেরুবে তিন কিস্তিতে।'

'কিন্তু বিষয়টা কি ?'

দিদিমা জিদ করতে লাগলেন। ভয় হোল, এই বুঝি শাস্ত্রের ফ্যাকড়া একটা তুলে ধরবেন। বললামঃ 'সে এক বানানো গল্প দিদিমা।'

'তবে মিথ্যে কথা হোল তো ?'

'হে যীশু !'

'মিছিমিছি প্রভুর নামে কিরা কাটতে চাও তো বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।'

'না দিদিমা, আর কখনো বলবো না, ঘাট হয়েছে। আমি দুঃখিত।' আমি কাতর মিনতি করলাম।—'কিন্তু তোমায় কি করে বুঝাবো বলো তো ? বানানো গল্প কি সত্যি হয় কখনো ?'

'তবে লিখলে কেনো ?'

'লিখলাম লোকে পড়বে বলে।'

'হুঁ, যত সব শয়তানের কারসাজি।' দিদিমা বেরিয়ে গেলেন গজ গজ করতে করতে।

মাও খুব ব্যথিত হলেন। বললেন :

'বাবা, তুই এখনকি আর ছোট আছিস্ ? হেসে-খেলে বেড়ানোর কি আর তোর সময় আছে ? ধর, তোদের ইস্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট তোকে এখানকার এই জ্যাকৃশনে শিক্ষার কাজে নিয়োগ করলেন। কিন্তু তিনি যদি শোনেন যে তুই গল্প লিখিস, তা হোলে তোর কি আর কোন চাকৃরি বাকরি জুটবে !'

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। ঘার গুঁজে রইলাম।

'বেশ, তাই হবে মা।'

টম মামা অবাক বনে গিয়েছিলেন। তিনিই কিন্তু সব চেয়ে বেশী মুখর হয়ে উঠলেন কড়া সমালোচনায়। বললেন : 'দূর, ওটা একটা গল্প হয়েছে না ছাই ! মাথা-মুণ্ডু কিছুই হয় নি। নামের ছিরি কি ? 'দি ভুডো অব দি হেলস্ হাফ্-একার' ! বিদঘুটে অমন নাম কেউ আবার কোন দিন শুনেছে নাকি ?' অডি মাসী বললেন : 'হেল' বা নরক

কথাটা মুখে আনাই মহা পাপ। সদ্ উপদেষ্টা কেউ না থাকলে ছেলে তো অমন বিগড়ে যাবেই। আমার শিক্ষা-দীক্ষাকে তিনি সমস্ত দায়ী করলেন।

শেষকালে আমিও চটে গেলাম ভয়ানক। গল্পটা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পর্যন্ত আর প্রবৃত্তি হোত না। এক কেবল নিগ্রো পত্রিকার সম্পাদক মশাই ছাড়া কারো মুখ থেকে একটা উৎসাহ-বাণীও শুনতে পেলাম না। এমন কথাও কানে এল, 'নরক' শব্দ গল্পে ব্যবহার করেছি বলে অধ্যক্ষ নাকি কৈফিয়ৎ তলব করবেন আমার নিকট। এসব কথা শুনে শুনে আমার এক সময় মনে হোল: সত্যিই বুঝি কোন অপরাধ করে বসেছি।...

ধুৎ ছাই, উত্তর মুলুকেই আমি পালিয়ে যাবো! সেখানে গিয়ে বই লিখব, লিখব নভেল। যা কিছু এখনো দেখিনি, অনুভব করিনি এখনো যা কিছু তারই প্রতীক হয়ে উঠল উত্তর মুলুক আমার নিকট। তারই রঙিন স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে রইলাম। আমার বয়স তখন পনেরো বৎসর।

আট

গ্রীষ্মকাল এসে গেল। চাকরি খোঁজার পালা আবার শুরু হোল। যে বাড়ীটাতে আমি ঠিকে চাকরের কাজ করতাম সে বাড়ীর গিন্নীমা মিসেস্ বিবস্‌কে বললাম, ইস্কুলের নতুন বছরের জন্য আমার বই ও জামা কাপড় কিনতে হবে। দয়া করে তিনি যদি একটা সর্বক্ষণের চাকুরি আমায় যোগাড় করে দেন তবে ভাল হয়। মিসেস্ বিবস্ জানালেন: আচ্ছা তুই দাঁড়া, ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।

তাঁর স্বামী কাঠগোলার ফোরম্যান। তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। শুধালেন:

'কি, কাঠগোলায় কাজ করবি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তিনি এবার আমার নিকট এগিয়ে এলেন। শূন্যে আমাকে তুলে ধরলেন দুহাতে। বললেন:

'কাজটা ভারী—বিপদও আছে। উহুঁ, তোকে দিয়ে চলবে না।'

'অন্য কিছু,' আমি থতিয়ে উঠলাম।

মুহূর্তখানেক তিনি নীরব হয়ে রইলেন। বুঝলাম বিষয়টা বিবেচনা

করে দেখছেন। নিগ্রোদের ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের এই হোল চিরন্তন দক্ষিণ দেশী রীতি। মুখ ফুটে কিছু বলবেন না কথ্খনো। আত্মমর্যাদায় লাগে। অবশেষে জানালেন: 'আচ্ছা, কাল একবার যাস মিলে। দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

পরদিন সকালে আমি কাঠগোলায় গিয়ে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি কাটা হচ্ছে করাত দিয়ে। চিরা হচ্ছে সশব্দে। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

'হুঁসিয়ার!'

চমকে উঠলাম সহসা। মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম প্রকাণ্ড এক টুকরা কাঠ আর একটু হলে বুঝি এসে গড়িয়ে পড়তো আমার মাথার উপর। এক লাফে আমি সরে এলাম ওখান থেকে। নিগ্রো এক শ্রমিক এবার পাশে এসে দাঁড়াল। শুধালে:

'কি চাই ছোকরা?'

'এখানকার ফোরম্যান বিবস্ সাহেবের খোঁজে এসেছিলাম। একটা চাকরি—।'

শ্রমিকটি বুঝি অবাক হয়ে গেল। ওই টুকুন বয়সে কাঠগোলায় চাকরি করতে আসা? সে তার ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। তিন তিনটে আঙুল দেখলাম উধাও হয়ে গেছে হাতখানা থেকে। বললে: 'দেখলে?'

আমি একবার মাথা নাড়লাম। তারপর চলে এলাম ওখান থেকে। সহপাঠি নেড্ গ্রীনলের সঙ্গে দেখা হোল পথে। দেখলাম মুখ ভার করে সে বসে আছে তাদের বাড়ীর চাতালের উপর। শুধালাম:

'কি রে নেড, কেমন আছিস্?'

'তুই ভাই শুনিসনি?'

'কি রে ?'

'আমার দাদা ববের কথা !'

'না। কি হয়েছে ?'

নেড এবার ফোঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কোন রকমে জানাল: 'দাদাকে ওরা মেরে ফেলেছে ভাই।'

'শ্বেতাঙ্গরা ?' আমি আন্দাজে শুধালাম চাপা গলায়।

নেড্ কেঁদে কেঁদে সায় দিলে। ধ্ব নেই। নেডের মারফৎ তার দাদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রশ্ন করলাম:

'ঘটনাটা কি ?'

গাঁ-গাঁ-য়ে-র রা-রা-স্তা থেকে···ও-ও-রা ভাই গাড়ীতে তুলে নিলে দাদাকে···তারপর মে-মে-রে ফেল-লে গুলি করে।'

শুনেছিলাম বব্ শহরের এক হোটেলে কাজ করত। তবু শুধালাম: 'কেনো ?'

'ও-ও-র-রা বলছে, দাদা নাকি হোটেলে শ্বেতাঙ্গ এক বে-বুশ্যের সঙ্গে মজা লুটছিল।'

শহরের হোটেলগুলিতে নিগ্রো ছোঁড়ারা শ্বেতাঙ্গ বারবনিতাদের কাছে যাতায়াত করে থাকে, তার বহু খোশগল্প আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু তার যে এমন নিষ্ঠুর পরিণাম ঘটতে পারে জানা ছিল না। আমি তাই স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলাম। অসাড় হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। রৌদ্র স্নাত নিস্তব্ধ পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম শূন্যে চোখে।

চাকরির সন্ধানে যাওয়া আর হোল না সেদিন। আমি ফিরে এলাম বাড়ীতে।···

দেখতে দেখতে ইস্কুলের সারা বছর কেটে গেল। উপাধি-বিতরণী

জনসভায় সেরা ছাত্রের বিদায়ী বক্তৃতা দেবার জন্য আমি নির্বাচিত হলাম ক্লাশ থেকে। একদিন সকাল বেলা অধ্যক্ষ আমায় ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে।

'এই যে রিচার্ড, এই নাও তোমার বক্তৃতা।' এক গাদা লিখিত কাগজ তিনি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'কোন বক্তৃতা সার?' কাগজগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে আমি শুধালাম।

'উপাধি বিতরণী সভায় যে বক্তৃতা তোমাকে দিতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো আমার বক্তৃতাটা লিখে ফেলেছি সার।'

'শোন বাছা', অবজ্ঞা ভরে হেসে উঠলেন অধ্যক্ষ। 'সেদিন সভায় গণ্যমাণ্য বহু লোক আসছেন। শ্বেতাঙ্গরাও আসবেন। ওঁদের সম্মুখে তুমি আর ছাইপাশ কি বলবে? তোমার অভিজ্ঞতাও বা কই?...'

কানদুটো আমার জ্বলে উঠল। তবু বললাম: 'সার আমি জানি, আমি তেমনি শিক্ষিত নই। কিন্তু ওঁরা তো আসছেন ছাত্রদের মুখ থেকে কিছু শুনবেন আশা করে। আপনার লেখা বক্তৃতা আউড়াতে আমি সার পারবো না।'

অধ্যক্ষ তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বিস্মিত চোখদুটি তুলে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'তোমার মত অমন ছেলে তো আমি দেখিনি কখ্খনো! ভালো চাও তো বক্তৃতাটা নাও। শ্বেতাঙ্গদের সম্মুখে ছাইপাশ যা-তা তোমাকে আমি বলতে দিতে পারি না।' তিনি বুঝি এবার দম নিলেন। আবার বললেন:

'ইস্কুলে সুপারিন্টেডেণ্ট মশাইও সেদিন উপস্থিত থাকবেন। তাঁর মনেও তো একটা ভালো ছাপ রাখতে হবে। নইলে উনিও বা

ভাববেন কি?' তিনি আরও বলে চললেন: 'তোমার যা বয়স তার চাইতেও বেশী দিন আমি কিন্তু এখানে অধ্যাপনা করে আসছি। কত ছেলে মেয়ে পার হয়ে গেল আমার হাত দিয়ে। আমার লেখা বক্তৃতায় ওরা কি কখনো আপত্তি করেছে?'

আমি কিন্তু আমার সংকল্পে অটল রইলাম।

'না, আমি সার আমার লেখাটাই পড়বো।'

উনি এবার রেগে ফেটে পড়লেন। ডেস্ক থেকে পেন্সিলটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন:

'ভাখো ছোকরা, তুমি উপাধি পাবে কি পাবে না, সেটা কিন্তু বিবেচনা করব আমিই।'

'আমি তো পাশ করেছি সবটাতে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে সবই নির্ভর করছে আমার হাতে।'

আমি অবাক বনে গেলাম। সারা দেহটা আমার কুঁচকে উঠল। সিধে জানিয়ে দিলাম:

'বেশ, আমি তবে উপাধি চাইনে!'

হন হন করে আমি বেরিয়ে আসছিলাম। তিনি আবার আমায় ডাকলেন। মুখে তাঁর এবার মুচকি হাসি।

'তোমার সঙ্গে কথা কয়ে কিন্তু সত্যি খুব আনন্দ হোল। এখানকার শিক্ষকতার কাজে তোমাকে নিয়োগ করার কথা আমি ভাবছিলাম। তা তুমি—'

বুঝলাম তিনি আমায় মিষ্টি কথার প্রলোভনে টোপ গিলাতে চান। নিগ্রো ছোকরাদের দক্ষিণদেশী জীবন ধারার ফাঁদে টানার এই হোল চিরন্তন প্রথা। বললাম:

'দেখুন সার, আমার টাকাও নেই পয়সাও নেই। আমাকে এবার

চাকরির সন্ধানেই বেরুতে হবে। বেশী দূর আর পড়াশুনা করবার সুযোগ হয়ত আমি পাবো না। তবুও কিন্তু আমি কোন উপাধি নিতে চাই না এভাবে।'

অধ্যক্ষ একটু ইতস্তত করলেন। শুধালেন: 'আচ্ছা, এ নিয়ে কারো কাছে কিছু বলে বসো নি তো?'

'না। কিন্তু কেনো সার?'

'ঠিক বলছো তো?'

'আপনার কাছেই তো সার এই প্রথম শুনলাম।'

'শ্বেতাঙ্গ কারো কাছে কিছু বলো নি ঠিক?'

'আজ্ঞে না।'

'না! আমি এমনি সব জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে।'

তিনি সাফাই গাইলেন। কৌতূহল আমার বেড়ে উঠল। অধ্যক্ষ কি তাঁর চাকরির ভয় করছেন? মুচকি একটু হাসলাম।

'হ্যাঁ সার।'

'তুমি একটা আচ্ছা মাথা পাগলা', আশ্বস্ত হয়ে তিনি আবার বলে চললেন। —'তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে! শেখো বাছা, শেখো কোন জগতে আমরা বাস করছি। আমি তোমার আত্মীয় স্বজনদের সবাইকেও চিনি। সভার দিনটা যদি কোনরকমে ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দিতে পারো', তিনি মুচকি একটু হাসলেন। একটু চোখও ঠারলেন। —'দেখবে আমি তোমার ভবিষ্যৎ পড়া-শুনোর ব্যাপারে সাহয্য করবো।'

'পড়াশুনো করতে সার, আমারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু অনেক কিছুই যে জানিনে সার।'

আমি তারপর বাড়ি চলে এলাম। মনে মনে ক্ষুন্ন হলেও অটুট

রইলাম আপন সংকল্পে। মনে হোল : 'দাস-সুলভ' একটা লোকের সঙ্গে আমি বুঝি এতক্ষণ কথা বলছিলাম। আমাকেও তিনি বুঝি 'কিনে' নিতে চেয়েছিলেন নিজের মত। সারাটা গা আমার ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। পালিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার এ সংঘর্ষের সংবাদ কিন্তু চাপা রইল না। ক্লাশের ছেলেরা আমায় সামনা সামনি টিটকারী দিতে লাগল।

'রিচার্ড, তুই একটা আস্ত গাধা! সুযোগটা কি অমন করে নষ্ট করতে আছে? আর অমন বোকার মত তুই কাজ করবি জানলে তোকে বক্তৃতা দেবার জন্য নির্বাচনও করা হোত না।'

আমি কিন্তু কোন জবাব দিলাম না। দুপাটি দাঁত দেখিয়ে একটু হেসে তাদের সব অভিযোগ গড়িয়ে দিলাম গায়ের উপর দিয়ে।

উপাধি বিতরণের দিন এসে গেল। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে শ্রোতাদের উদ্দেশ করে আমি আমার বিবরণ পাঠ করে গেলাম। আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হাততালি উঠল। শ্রোতারা আমার কথা পছন্দ করলেন কি করলেন না তাতে ভারী বয়ে গেল আমার! ভালোয় ভালোয় চুকিয়ে দিয়েছি এই ঢের। সভামঞ্চ থেকে আমি নেমে পড়লাম। সহপাঠীদের অনেকে আমায় ঘিরে ধরল করমর্দন করতে। আমি কিন্তু সিধে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লাম। চুলোয় যাক্‌গে সব! আমি আর ছায়া মারাতে চাই না এখানকার। ব্যর্থ, পরিপূর্ণ সতেরোটি বৎসর আমি তখন ফেলে এসেছি পশ্চাতে। উনিশ শ' পঁচিশ-এর মুখর জগৎ দেখা দিল এবার আমার সম্মুখে।

নয়

চাকরি। চাকরি খোঁজার উপরই এখন সব কিছু নির্ভর করছে আমার জীবনের। সত্যি. মরিয়া হয়ে উঠলাম। হাতের কাছে যা পেলাম তাই গ্রহণ করে বসলাম। কাজটা এক বস্ত্রালয়ের পোর্টার ছোকরার। ঐ বস্ত্রালয় থেকে নিগ্রোদের ধারে সস্তা জামা কাপড় বিক্রী করা হোত। সস্তায় স্যুট ও পোষাক পরিচ্ছদ কিনতে নিগ্রো স্ত্রী পুরুষেরা ওখানে তাই ভিড় করত সব সময়। দামের দিকে একবার চোখ তুলেও তাকাত না। শ্বেতাঙ্গ দোকানী যে দামই হাঁকত তাতেই রাজী হয়ে যেত। শ্বেতাঙ্গ দোকানীও তার ছেলে আর দোকানের সরকারটি হামেশা গাল-মন্দ, মার-ধর, হামলা করতে কসুর করত না নিগ্রোদের উপর।

একদিন সকাল বেলা আমি দোকানের বাইরেটা ঝারা মোছা করছিলাম। এমন সময় মালিক আর তাঁর ছেলে এসে নামল গাড়ী থেকে। ভীতি সন্ত্রস্ত এক নিগ্রো মেয়েকেও ওরা নামালো গাড়ী থেকে একরূপ লাথি মেরে। তারপর হেঁচড়াতে হেঁছড়াতে ওকে নিয়ে চললো দোকানের মধ্যে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শ্বেতাঙ্গ কত লোক দেখে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটিও করল না কেউ! পুলিশও সবটা

দেখছিল দূর থেকে। কিছু বলল না সেও। রুল ঘোরাতে' ঘোরাতে চলে গেল পাশ কেটে। একটু পরেই ভেতর থেকে আর্ত চিৎকার শোনা গেল। দুহাতে তলপেট ধরে মেয়েটি তারপর বেরিয়ে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। দেহ তার রক্তাক্ত। জামা-কাপড় সব গেছে ছিঁড়ে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি কোন রকমে নেমে এল রাস্তায়। শ্বেতাঙ্গ পুলিশটা এসে এবার পাকড়াও করল ওকে। শালী, মদ খেয়ে আর মাতলামো করবার যায়গা পাস নি? এই বলে মেয়েটাকে ও এক পুলিশ ভ্যানে তুলল টানতে টানতে।

আমি যখন দোকানে এসে ঢুকলাম, দেখলাম কর্তা ও তার ছেলে দুজনে হাত নিচ্ছে ধুয়ে। ওরা আমায় দেখে একটু হাসলো অপ্রস্তুত হয়ে। মেঝের উপর তখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, গোছা গোছা ছেঁড়া চুল আর জামার টুকরো আছে পড়ে। তাই দেখে আমি বুঝি আঁতকে উঠছিলাম। কর্তা এসে আমার পিঠটা চাপড়ে দিলেন। বললেন:

'দেখলি তো, যে সব নিগ্রো বিলের পাওনা চুকিয়ে দেয় না তাদের কি দশা ঘটে?'

ওঁর ছেলে দাঁত দু'পাটী দেখিয়ে হেসে উঠল: 'নে-নে, সিগারেট নে একটা।'

কি করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। হাত বাড়িয়ে তবু নিলাম সিগারেটটা। মুখের সিগারেটটা ও ধরিয়ে নিল। আগুনটা এবার এগিয়ে দিলে আমার দিকে। ভাবখানা এই: নিগ্রো মেয়েটাকে অমন নিষ্ঠুর প্রহার করেছে সত্যি, কিন্তু আমি যদি নীরব থাকি তবে আমার গায়ে হাত তোলা হবে না। এমনি দয়া!

ওঁরা বেরিয়ে গেলেন ভেতর থেকে। এক প্যাকিংবাক্সের উপর বসে

বেকার। একদিন সকাল বেলা তাই গ্রীগস্‌এর কাছে এসে ধর্ণা দিলাম। গ্রীগস্ পুরোন সহপাঠী। ক্যাপিটেল ষ্ট্রীটের এক জুয়েলারের ওখানে কাজ করে। গ্রীগস্ তখন দোকানের জানলা সাফ করছিল। বললাম ঃ

'একটা কাজ টাজ দেখে দে ভাই ?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সে আমার দিকে।

'চাকরির খোঁজ একটা তোকে দিতে পারি।'

'কোথায় ?'

'কিন্তু ওখানে কি তুই পারবি টিঁকে থাকতে ?'

'মানে, বলছিস কি ? কাজটা কোথায় ?'

'ওই তো তোর মস্ত দোষ। সবটাতে অমনি অধৈর্য হয়ে উঠিস ?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। কেন না, এই অভিযোগ ইতিপূর্বে বহুবারই করেছে সে। গ্রীগস্ একটা সিগারেট ধরালে। খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লে নিঃশব্দে। দুহাতে সহসা আমার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে গ্রীগস্ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল ঃ

'আচ্ছা, তুই কি খামাকা মারা পড়তে চাস ?'

'দূর তা কেনো ?'

'তবে ঈশ্বরের দোহাই, দক্ষিণে কি করে বাস করতে হয় তা ভালো করে শেখ !'

'মানে ? তুই আবার শ্বেতাঙ্গ আদমী হোলি কবে থেকে ?'

'স্যাথ ডিক', গ্রীগস্ এবার থামল। চোখ তুলে একবার তাকাল রাস্তা ভর্তি শ্বেতাঙ্গ জনতার দিকে। চাপা গলায় তারপর বলল ঃ 'তুই যে একজন কালা আদমী—কৃষ্ণাঙ্গ—দেখতে পাস না ? জানিস নে কিছু ?'

'জানবো না কেনো ?'

'তবে বোকার মত কাজ করিস নে।'

'বেশ তো, বলে দে না কি করতে হবে ?'

'সবুর কর, বলছি।' গ্রীগস্ উত্তর দিল।

এ সময় একটি মেয়ে ও দুজন পুরুষ এসে ঢুকল জুয়েলারি স্টোরে। গ্রীগস্ এর কথাই ভাবছিলাম। অন্যমনস্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালাম পাশ কেটে। গ্রীগস্ সহসা আমার একখানা হাত ধরে হেঁচকা একটা ঝাঁকুনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির তিন চার ধাপ নীচে নামিয়ে দিল আমাকে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। রেগে গিয়ে শুধালাম।

'হোল কি তোর ?'

গ্রীগস্ আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তারপর হি হি করে হেসে ফেলল। বলল :

'শাদা আদমীদের দেখলে অমনি কি করে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হয় তোকে শিখিয়ে দিলাম।'

লোক দুটি ও মেয়েটি এবার বেরিয়ে এল দোকান থেকে। আমি তাঁদের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, তাই তো, আমি যে লক্ষ্য করি নি! ওঁরা যে শ্বেতাঙ্গ।

'এবার বুঝলি ?' গ্রীগস্ শুধাল। গলাটা খাদে নামিয়ে আবার বলল : 'শাদা আদমীরা চান, ওঁনারা যাবার সময় আমরা পথ ছেড়ে দাঁড়াই।'

'হুঁ।' আমি হাঁপ ছাড়লাম।

'রাগ করিস নে ডিক, আমি তোকে ভাইএর মতই ভাবি।' গ্রীগস্ আবার বলে চললো : 'শ্বেতাঙ্গদের নিকট তুই এমনভাবে চলাফেরা করিস যেন ওঁরা শ্বেতাঙ্গই নন। এটা কিন্তু ওঁদের নজর এড়ায় নি।'

'হে ঈশ্বর, আমি কিন্তু কিছুতেই ক্রীতদাস বনতে পারবো না।' অসহায় হয়ে আমি বলে উঠলাম।

'কিন্তু তোকে তো খেতে হবে?'

'তা হবে।'

'আজ থেকে তবে নতুন করে চলতে শেখ।' গ্রীগস্ নিজ হাতের তালুর উপর মুষ্ঠাঘাত করল। 'শাদা আদমীদের সামনে কিছু করবার আগে ভাববি, চিন্তা করবি কিছু বলার আগে। ওরা আমাদের মত কালা আদমী নয়। সহ্য করবে না।'

গ্রীগস্ যা বলছে একবর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু আগে থেকে ভেবে-চিন্তে মেপে ঝুঁকে কিছু একটা করতে যাওয়া সব সময়—আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রাতঃসূর্যের দিকে মুখ করে আমি তাকিয়ে রইলাম শূন্য চোখে। ছোট একটা নিশ্বাস চেপে বললাম:

'তুই হয়ত ঠিকই বলছিস ভাই। এবার থেকে সাবধান হয়ে—"

'না,' গ্রীগস্ বুঝি আহত হোল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল আরও। থেমে গেল সহসা। একজন শ্বেতাঙ্গ স্টোরে গিয়ে ঢুকল। গ্রীগস্ ওর পেছন থেকে চোখ দুটি নামিয়ে বলল: 'দেখ ডিক, তুই বোধ হয় ভাবছিস আমিও "টম খুড়ো"দের দলের। কিন্তু তা নয়। শাদা আদমীদের আমিও কায়-মন-বাক্যে ঘৃণা করি। তবে সেটা জানতে দিই না। জানতে দিলে ওরা আমায় খুন করে ফেলবে।'

এবার সে একটু থামলে। আশে পাশে কোন শ্বেতাঙ্গ আছে কিনা দেখে নিলে একবার। তারপর চাপা গলায় আবার বলল: 'জানিস, একবার এক বুড়ো নিগ্রো মাতালকে বলতে শুনেছিলাম ছড়া কেটে:

দেখতে সুবেশ সরেস যত
শ্বেতাঙ্গ বৃন্দ।
জানিস্ রে ভাই, ওদের গুয়েও
মোদের মত গন্ধ॥

খিলখিল করে আমি হেসে ফেললাম। গ্রীগস্ও হাসল। তবে হাঁটুর আড়ালে মুখখানা লুকিয়ে। সে বুঝি তার উচ্ছ্বসিত আবেককে ঢাকতে চায় শ্বেতাঙ্গদের কড়া নজর থেকে। হাসির ফাঁকে কোন রকমে বলল: 'আমিও তাই মনে করি।'

গ্রীগস্ এবার গম্ভীর হলো। বলল: 'দাঁড়া, ওপর তলায় এক চশমার কোম্পানী আছে। তার বাবু হলেন ইলিনইসের এক ইয়াঙ্কি ভদ্রলোক। গ্রীষ্মকালে সারাদিন আর শীতকালে সকাল বিকেল দুবেলা কাজ করবার জন্য তিনি এক ছোকরার খোঁজ করছিলেন। নিগ্রো ছেলেকে চশমার কাজ শিখাবারও তাঁর ইচ্ছে। তুই তো বীজগণিত জানিস। আমি তোর কথা মিঃ ক্র্যানকে বলবো।'

আগ্রহে আমি ফেটে পড়ে বললাম: 'চল না ভাই এক্ষুনি যাই।'

গ্রীগস্ সহসা খেঁকিয়ে উঠল: 'ওই তো তোর মস্ত দোষ। সবটাতে অমনি ক্ষ্যাপে উঠিস। ভুলে যাস তুই নিগ্রো। দোহাই একটু সবুর কর।'

'মাইনে কত দেবে রে?'

'প্রথমে হপ্তা পিছু পাঁচ ডলার। তোকে যদি পছন্দ হয় তবে পরে বাড়িয়েও দেবে।'

রঙিন স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে উঠলাম। বেশ তো মন্দ কি? নতুন এক ব্যবসাও শেখা হোল। ইস্কুলটাও ছাড়তে হোল না। চাকরিটা পাওয়া গেল! আমি নরম হয়ে থাকব বলে জানালাম গ্রীগস্-কে।

পরদিন সকালে চশমার দোকান খুলবার বহু পূর্বেই আমি এসে হাজির হলাম দরজায়। আর বারবার নিজেকে নিজে এই বলে শাসন করতে লাগলাম, ভেবে চিন্তে খুব মেপে ঝুঁকে আমায় কথা বার্তা বলতে হবে। চলতে হবে ভালো হয়ে। হঠাৎ একজন শ্বেতাঙ্গ এগিয়ে এলেন আমার দিকে :

'কি চাই ?'

'আজ্ঞে একটা চাকরির খোঁজে।'

'ও-কে, ভেতরে এসো।'

আমি তাঁর পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। তিনি এসে আপিস ঘরের তালা খুললেন। একটু যেন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শ্বেতাঙ্গ যুবকটির ব্যবহারে এবার অনেকটা হলাম আশ্বস্ত। টুপিটা হাতে করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবার এল এক শ্বেতাঙ্গ মেয়ে। এসে টাইপ করতে সে বসে গেল। একটু পরেই ঢুকল রোগা ছিপছিপে এক বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ। তারপর এলেন লাল মুখো লম্বা মত একজন ইয়াঙ্কি।

'তুমিই বুঝি সে নতুন ছোকরা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা একটু দাঁড়াও। চিঠি কটা একটু দেখে নি, পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো।' তিনি বিনীত নিবেদন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আধ-ঘণ্টা খানেক পর মিঃ ক্র্যান আমাকে তলব করে পাঠালেন। প্রশ্ন করলেন আমি কত দূর পর্যন্ত পড়ছি ইস্কুলে। অঙ্কটঙ্ক জানি কিনা। আমি যখন তাঁকে জানালাম যে বীজগণিতের আমি দু'বছর ক্লাশ করেছি, তিনি বুঝি শুনে খুব খুশী হলেন। শুধালেন :

'কেমন, একাজ শিখতে তোমার ইচ্ছে হয় তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার খুব ইচ্ছে হয়'। আমি জবাব দিলাম।

জানালেন: কোন এক নিগ্রো ছেলেকে তিনি চশমার কাজে শিক্ষানবীশ বানিয়ে তুলতে চান। তাকে তিনি সাহায্য করবেন। হাতে কলমে শিখিয়েও দেবেন। তিনি আমায় স্টেনোগ্রাফার মেয়েটির নিকট নিয়ে গেলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন: 'এ হোল রিচার্ড। এবার থেকে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে।'

তিনি এবার আমাকে আপিসের পেছনদিকটায় নিয়ে গেলেন। ছোটখাটো একটা কারখানার মত আছে এদিকটায়। ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র পাতিতে ভর্তি। শ্বেতাঙ্গ সেই যুবকটিকে তিনি ডেকে বললেন:

'রেনোল্ডস্, এর নাম রিচার্ড।'

মিঃ ক্র্যান এবার আমায় বৃদ্ধ লোকটীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

'পীস, এর নাম রিচার্ড। এবার থেকে ও আমাদের সঙ্গে কাজ করবে।'

পীস মুখ তুলে তাকালেন। একবার মাথা নাড়লেন। মিঃ ক্র্যান তারপর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী দুজনকে বুঝিয়ে দিলেন আমায় কি কি কাজ করতে হবে। চশমার কাঁচ কাটা, পালিশ করা প্রভৃতি কাজ আমায় শিখিয়ে দিতে—একটু একটু করে আমাকে এব্যবসায়ে শিক্ষিত করে তুলতে। তিনি ওদের নির্দেশ দিলেন। মাথা নেড়ে ওরা তখন সম্মতি জানাল। মিঃ ক্র্যান এবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা, এবার ঘরটা কেমন পরিষ্কার করতে পারো দেখি?'

কোমর বেঁধে আমি তখন আফিস ঘরটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝেরে মুছে তাকে একেবারে তকতকে করে তুললাম। এক দিন, দু দিন, তিন দিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহও কেটে গেল। আমি আমার বেতন পাঁচ ডলারও পেলাম। কিন্তু যে জন্য আসা কিছুই তার শেখা হোল না। কেউ আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে না কাজটা। অলস মুহূর্তে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কেবল চেয়েই থাকতাম: শ্বেতাঙ্গ অপর কর্মচারী দু' জন মেশিনে চশমার ল্যান্স কেটে চলেছে আপন মনে। একদিন বিকেল বেলা আমি রেনোল্ডস্‌এর নিকট এগিয়ে গেলাম। আমাকেও কাজটা একটু শিখিয়ে দিতে জানালাম অনুরোধ। রেনোল্ডস্ আমায় খেদিয়ে দিল মারমুখো হয়ে। আমি রীতিমত সাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, ও বুঝি আমায় সাহায্য করতে চায় না। তাই আমি পীসের নিকট গিয়ে বড়কর্ত্তার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনিও খেঁকিয়ে উঠলেন:

'তুই ব্যাটা নিগার, শাদা আদমী বনে গেলি কবে থেকে?'

'আজ্ঞে না, বড়কর্ত্তা বলছিলেন কিনা।' আমি জবাব দিলাম।

পীস আমার নাকের ডগায় ঘুসি বাগিয়ে বললেন: 'জানিস ব্যাটা, এটা কেবল শ্বেতাঙ্গদেরই একচেটিয়া ব্যবসা?'

এর পর থেকে ওদের মতিগতি বদলে গেল। আমি নমস্কার জানালে, প্রতিনমস্কার ছেড়েই দিল ওরা। কোন কাজ করতে একটু আধটু আমার দেরী হলেই অমনি মুখ খিস্তি করে গালাগালি দিত শুরু করে। আমি চুপ করে থাকতাম। ব্যাপারটাকে আরও ঘোলাটে করে তুলতে চাইতাম না। তবু কিন্তু ওরা গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে একটা ঝগড়াঝাঁটি বাঁধাবার চেষ্টায় থাকত সর্বদা।

ব্যাপারখানা চরমে দাঁড়াল একদিন দুপুর বেলা। পীস আমাকে

তাঁর কাজের টেবিলে ডেকে পাঠালেন। দুখানা বেঞ্চির মাঝখানের সরু পথ ধরে দেয়াল ঘেঁসে আমি এসে দাঁড়ালাম তাঁর কাছে।

'রিচার্ড, তোমার সঙ্গে আমার গুটিকয়েক কথা আছে।' তিনি বললেন ঘাড় গুঁজে নির্লিপ্তভাবে।

আস্তিন গুঁজে রেনোল্ডস্‌ও এগিয়ে এল। বেঞ্চির মাঝখানের সরু পথটা আগলে দাঁড়াল। গুরুতর কিছু একটা ঘটবে বুঝতে পারলাম আবহাওয়া দেখে। পীস এবার মুখ তুলে তাকালেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রিচার্ড, রেনোল্ডস্ বলছিল তুই নাকি আমার নাম ধরে ডাকছিলি?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম এটা একটা ছল মাত্র। আমি রেনোল্ডস্ এর দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম লোহার একটা ডাণ্ডা হাতে নিয়েছে সে! মুখ ফুটে কি যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। রেনোল্ডস্ এসে আঁকড়ে ধরল আমার জামার কলারটা। মাথাটা জোরে ঠুকে দিল দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল :

'এই ব্যাটা নিগার, সাবধান কিন্তু! মিথ্যে কথা বলবি তো তোকে আমি দেখে নেবো। ওঁকে তুই পীস্ বলে ডেকেছিস, আমি শুনেছি।' হাতের ডাণ্ডাটা নেড়ে সে আমায় ভয় দেখাল।

উভয়ে সংকটে পড়লাম। যদি বলি : মিঃ পীস্, আজ্ঞে না, আপনাকে আমি পিস্ বলে ডাকি নি, তবে রেনোল্ডস্‌কে মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত করা হয়। আর যদি বলি : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে আমি শুধু পীস্ বলে ডেকেছি, তবে জাতে নিগ্রো হয়ে দক্ষিণ দেশী এক শ্বেতাঙ্গের প্রতি চরম অবমাননা করা হয়। আমি রীতিমত ঘেমে উঠলাম। নিরপেক্ষ পন্থা অনুসরণ না করে উপায় নেই। অতি সাবধানে বললাম :

'মিঃ পীস, আপনাকে আমি কোনদিন পীস্ বলে ডেকেছি, স্মরণ করতে পাচ্ছি না। এবং যদি ডেকেও থাকি আমি কখ্খনো—'

'তবে রে শালার ব্যাটা শালা, কুত্তিকা বাচ্চা! আমায় নাম ধরে ডাকতে তোর এত সাহস হয়েছে!' পীস অবজ্ঞায় ফেটে পড়লেন। প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন আমার গালে। মুখ থুবড়ে আমি পড়ে গেলাম বেঞ্চির উপর।

রেনোল্ডস্ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর।

'শালা বাঞ্চোদ' কি রে, ডাকিস নি তুই ওঁকে নাম ধরে? না বলবি তো মাথা আমি তোর গুঁড়িয়ে দেবো এ ডাণ্ডা মেরে।'

ভয়ে মুখ আমার শুকিয়ে গেল। কাতর মিনতি করতে লাগলাম। আমায় আর মারবেন না। কাজটা আমি ছেড়েই দিচ্ছি। জানি এটাই ওরা চায়। তাই প্রতিশ্রুতি দিলাম:

'আমি এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি!'

কারখানা থেকে বেরিয়ে যেতে বুঝি ওরা মিনিটকয়েক আমায় সময় দিল। সাবধান করে দিল, এ দিক আর কোন দিন মাড়িয়েছি কি আর কর্তা বাবুর কানে এ সম্পর্কে কোন কথা তুলেছি কি ওরা আমায় মেরে খুন করে ফেলবে। আমার জামার কলার থেকে রেনোল্ডস্এর মুঠিটা একটু শিথিল হয়ে আসতেই ঘাই মেরে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আফিসে মিঃ ক্র্যান কি স্টেনোগ্রাফার কাউকেও দেখলাম না। ওঁদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই পীস আর রেনোল্ডস্ আমার উপর হামলার সময়টা নির্দ্ধারিত করেছে বুঝলাম। আমি রাস্তায় নেমে এলাম। কর্তাবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। জুয়েলারী স্টোর-এর শো-কেশের কাঁচ পরিষ্কার করছিল গ্রীগস্। দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে

ডাকলে। ও বেরিয়ে আসতেই আদ্যপ্রান্ত ঘটনাটা সব ওকে জানালাম।

'বোকার মত তবু এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেনো?' সে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল। 'এখনো বুঝি তোর শিক্ষে হয় নি? বাড়ি যা! ওরা এক্ষুনি আবার হয়ত এসে পড়বে।'

কেপিট্যাল ষ্ট্রীট ধরে আমি হেঁটে চললাম। পথচারী লোক-জন ঘর-বাড়ি সব কিছুই মিথ্যা, অলীক, অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল রাজপথ ধরে হেঁটে চলারও আমার বুঝি কোন অধিকার নেই স্বকীয়। আঘাতটাও মনের উপর কেটে বসল গভীর হয়ে। মনে হোল, কে যেন এসে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিল আমার মানব সত্তাকে। বাড়ি এসে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললাম না। শুধু বললাম, কাজটা ছেড়ে দিয়েছি। অল্প মাইনে। পোষাল না। অন্যত্র চেষ্টা করছি।

সে রাত্রিতে গ্রীগস্ এল আমাদের বাড়ীতে। আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে সে বলে উঠল এক সময়:

'কেমন, শিক্ষেটা খুব হোল তো?'

'কি, দোষটা আমার বুঝি?'

গ্রীগস্ নীরবে মাথা নাড়ল।

আমার পিত্ত জ্বলে উঠল। বললাম:

'খুব যে বিনয়! ব্যাপারটা কি?'

গ্রীগস্ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল: 'এ তো হামিশাই ঘটছে।'

'কিন্তু জানিস আমি এখনও টাকা পাই ওদের কাছে?'

'সে কথা বলতেই এসেছি।' গ্রীগস্ উত্তর দিল।'—কাল সকাল ঠিক দশটার সময় মিঃ ক্র্যান একবার দেখা করতে চান তোর সঙ্গে।

মনে থাকে যেন ঠিক দশটার সময়। ও সময় তিনি আসবেন অফিসে। ওরা তখন আর তোর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।'

পরদিন বেলা ঠিক দশটার সময় ভীরু সন্ত্রস্ত পা ফেলে আমি চশমার দোকানে এসে হাজির হলাম। উঁকি মেরে দেখলাম মিঃ ক্র্যান বসে আছেন তাঁর ডেস্কএ। পীস আর রেনোল্ডস্‌ও মেশিনে বসে কাজ করছে। আমায় দেখতে পেয়ে মিঃ ক্র্যান ডাকলেন :

'এই যে রিচার্ড, এসো।'

টুপি খুলে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমায় বসতে বললেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একবার মাথা নাড়লেন। বললেন : 'কি হয়েছে বলোতো ?'

আবেগের মাথায় প্রাণ খুলে এক রাশ কথা বলতে ইচ্ছে হোল। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার বাস্তব পরিস্থিতিতে আমি ফিরে গেলাম। কথাগুলি মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। বার কয়েক ঠোঁট নেড়ে বলবার চেষ্টা করলাম। একটা কথাও কিন্তু কণ্ঠ থেকে বেরুল না। উত্তপ্ত কপোল দু'টি বেয়ে কেবল কয়েক ফোঁটা জল পড়ল গড়িয়ে।

মিঃ ক্র্যান বলে উঠলেন : 'না-না কেঁদো না। কাঁদছো কেনো ?'

হাতের মুঠি দুটো আমার টনটন করে উঠল। সামলে নিয়ে বললাম : 'আমি এখানে কাজ করতে চেয়েছিলাম।'

'সে আমি জানি। কিন্তু কি হয়েছে বলো তো ? তোমায় বাগড়া দিচ্ছিল কে ?'

'আজ্ঞে ওঁরা দু'জনেই।'

রেনোল্ডস্‌ অমনি তেড়ে এল হন্তদন্ত হয়ে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিঃ ক্র্যানও খাড়া হয়ে উঠলেন। বললেন :

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'ও নিগ্রো ব্যাটা কিন্তু মিথ্যে কথা লাগাতে এসেছে।' রেনোল্ডস্ জবাব দিল। 'ব্যাটা, মিথ্যে কথা বলবি তো তোকে আমি মেরে ফেলব।'

'যাও, বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে।' মিঃ ক্র্যান গর্জে উঠলেন।

রেনোল্ডস্ আমার উপর তীব্র দৃষ্টি হেনে পিছিয়ে গেল।

মিঃ ক্র্যান আমার দিকে তাকালেন। বললেনঃ 'এবার বলো, কি হয়েছে?'

আমি তবু কিছু বলতে পারলাম না। কিই বা আর বলব? আমি নিগ্রো। বাস করি দক্ষিণ দেশে। শ্বেতাঙ্গরা কেউ শিখিয়ে না দিলে মেশিনের কাজ আমি শিখবই বা কি করে? মাথাটা আমার ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। দু'হাতে মুখ ঢেকে ব্যর্থ রাগ ও ভয়ে আমি ফোঁপিয়ে উঠলাম। মিঃ ক্র্যান ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'না, কেঁদো না। কাঁদছো কেনো? কি হয়েছে আমায় বলো না খুলে?'

'আজ্ঞে, বলে আর কি হবে?' রুদ্ধকণ্ঠে আমি জবাব দিলাম।

'তুমি কি এখানে কাজ করতে চাও না?'

মুখ তুলে আমি পীস্ আর রেনোল্ডস্এর দিকে একবার তাকালাম। নেডের দাদার কথা মনে পড়ে গেল সহসা। ওরাও হয়ত তেমনি করে আমায় একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। জানালামঃ

'আজ্ঞে, না।'

'কেনো?'

'আমার ভয় করছে। ওরা আমায় নিশ্চয় খুন করবে।'

মিঃ ক্র্যান ঘুরে দাঁড়ালেন। পীস্ আর রেনোল্ডস্‌কে ডেকে আনলেন অফিস ঘরে। আমাকে এবার শুধালেন ঃ

'তোমার কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে বলো, কে তোমাকে বাগড়া দিচ্ছিল ?'

ফ্যাল ফ্যাল করে আমি কেবল তাকিয়ে রইলাম নীরবে। কোন জবাব দিতে পারলাম না। এক নিশ্বাসে এক সময় বলে উঠলাম ঃ

'আজ্ঞে, আমার মাইনেটা চুকিয়ে দিন।'

'একটু দাঁড়াও।' মিঃ ক্র্যান জবাব দিলেন। 'জানো, আমি অত্যান্ত দুঃখিত এ জন্য।'

আমার মনটা গলে গেল। বললাম ঃ 'কাজটা পেয়ে মনে হয়েছিল বুঝি হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। কত আশা করেছিলাম ঃ এবার থেকে আবার ইস্কুলে যাবো, কলেজে যাবো। কিন্তু…'

'সে আমি জানি। এখন তুমি কি করবে ?'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'য়্যাঁ!'

'দক্ষিণ মুলুক ছেড়ে চলে যাবো ভাবছি।' এক নিশ্বাসে আমি জানিয়ে দিলাম।

'সেই ভালো,' তিনি জবাব দিলেন। 'এই তো আমি আসছি ইলিনয়স্ থেকে। আমিও দুদিনে হাঁপিয়ে উঠেছি রীতিমত।'

তিনি আমার বেতনটা দিলেন চুকিয়ে। আমার পাওনার চাইতে বেশীই দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও উঠলেন। হল ঘরটা পর্যন্ত এলেন আমায় পিছু পিছু। হাতখানা তারপর বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

আলগোসে কোন রকমে করমর্দনটা সেরে নিলাম। বুক ফেটে আমার কান্না আসছিল। অশ্রুর বান সংবরণ করে কোন রকমে তরতর করে আমি নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। শেষ ধাপে এসে একবার ফিরে তাকালাম। দেখলাম সিঁড়ির মাথায় তিনি তখনও ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন। মাথা নেড়ে তিনি আমায় বিদায় দিলেন। আমি রাজপথে নেমে এলাম। অন্ধের মত তারপর পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

ফিরছিলাম। রাত্রির শ্বেতাঙ্গ পাহারাদারদের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, ও সহসা মেয়েটার পাছার উপর একটা চিমটি কেটে বসল অশ্লীল এক রহস্য করে। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম মারমুখো হয়ে। মেয়েটি তখন বেরিয়ে গেছে ওর নাগালের বাইরে। ছেনালি করে সে বুঝি একটু হাসল পাহারাদারটার দিকে তাকিয়ে। ফটক পেরিয়ে তারপর নেমে পড়ল রাস্তায়। পা দুটো আমার অসাড় হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলাম স্থানুর মত।

'এই শালা নিগার, অমন চোখ রাঙাচ্ছিস কেনো রে?' শ্বেতাঙ্গ পাহারাদারটা খেঁকিয়ে উঠল এবার।

আমার মুখে কোন কথা ফুটল না। নড়তেও পারলাম না এক পা। আমার নিশ্চুপ নিস্তব্দতাকে ও বুঝি ভাবলে মৌন প্রতিবাদ। সে তার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলে।

'তবে রে শালা, এ সব তুই পছন্দ করিস নে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করি বই কি।' শুষ্ক কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম।

'তাই বল শালা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম! পেছন ফিরে একবার তাকাতেও সাহস হোল না। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছে আমার। কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখলাম মেয়েটি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি ওর পাশ কেটে গেলাম। ও এসে কিন্তু আমায় ধরে ফেললে। রেগে আমি এবার ফেটে পড়লাম:

'আচ্ছা তো তুমি! তখন কিছুই বললে না?'

'ও কিছু না। ওরা অমনটা হামিশাই করে থাকে।'

'আমি হলে কিন্তু মজাটা টের পাইয়ে দিতাম।'

'অমন বোকামি করতে যেয়ো না কিন্তু কোন দিন।'

'আশ্চর্য, তখন তুমি কিছু বললে না?' ওকে আমি আবার শুধালাম।

'কেন, কি হয়েছে? ওই টুকুন একটু ঠাট্টা ফক্কুড়ি ছাড়া ওরা আর আমাদের নাগাল পেলে তো?' শুকনো গলায় জবাব দিলে মেয়েটি।

'হুঁ, আমি বোকাই বটে!' ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল কথাটা। টিপ্পনিটা বুঝি কোন দাগ কাটিল ওর মনে।

-

মাইনে থেকে গোটা কয়েক ডলার জমিয়েছিলাম। 'হল বয়' থেকে হোটেলের 'বেল্ বয়'তে প্রমোশন পেয়ে গেলাম। মাইনেও বাড়ল কিছুটা। কিন্তু দু'দিনেই আমি জেনে নিলাম, হোটেলের শ্বেতাঙ্গ বারবনিতাদের চোরাই মদ যোগাতে পারলে এন্তার পয়সা আসে। হোটেলের অপর সব 'বেল বয়'-রাও তাই করত। আমিও নিলাম সেই ঝুঁকি। কোমরে চোরাই মাল নিয়ে শ্বেতাঙ্গ পুলিশদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাবার কৌশলটা আমি রপ্ত করে নিলাম। ওদের সামনে দিয়ে যাবার সময় হেলে দুলে শিস কাটতে কাটতে আমি যেতাম। যেন যাচ্ছে কোন এক নিরপরাধ নিগ্রো। বিন্দু বিসর্গও জানে না এ বিষয়ের। উদ্বৃত্ত ডলারও কিছু কিছু আসতে লাগল। তবে ধীরে ধীরে। আমি কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠলাম। সামান্য কোন অজুহাতে ধরা পড়ে জেলে যাবার আগে বেশ কিছু ডলার হাতে জমিয়ে নেয়া যায় কি করে? বেআইনী কাজটা যখন করতে যাচ্ছি ট্যাঁকে আমার কিছু আসা উচিত বই কি?

হোটেলে শ্বেতাঙ্গ বারবনিতাদের ঘরে চোরাই মদ যোগাতে গিয়ে প্রায় দেখতাম ওরা বিছানার উপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে আছে। আমার 'জিম ক্রো' জীবনের বুঝি হাতে খড়ি হোল আবার

নতুন করে। নতুন করে আবার শিখলাম হাল চাল। ওরা বুঝি মনে করত ওদের নগ্নতায় আমাদের আঁতকে উঠবার কিছু নেই। নীল কোন একটা পাত্র কিম্বা লাল এক টুকরো ন্যাকড়া দেখে আমরা কি অমন আঁতকে উঠি? তাছাড়া আমাদের তখনকার উপস্থিতিতে ওদের মনে কোন লজ্জা কি সরমও দেখা দিত না। কালা আদমীরা বুঝি মানুষই নয়। ওরা যদি কোন দিন একলা থাকত, আমি হয়ত তখন এক লহর তাকিয়ে নিতাম চোরা চাহনিতে। কিন্তু ওদের ঘরে লোক থাকলে চোখ তুলে তাকাতেও পারতাম না।

ধবধবে ফরসা, মোটা মত একটি শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী মেয়ে হোটেলে থাকত আমাদের তলায়। একদিন রাত্রিবেলা ওর ঘরে ফরমাস খাটতে আমার ডাক পড়ল। মোটা সোটা একটা লোক ছিল তখন ওর ঘরে। ওরা দুজনেই ছিল তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একেবারে বেআব্রু। আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটা এক পাইণ্ট মদ নিয়ে আসতে বলল। তারপর ঘরের ও পাশে ড্রেজার থেকে পয়সা বার করে দেবার জন্যে উলঙ্গ সে অবস্থায় টুক্ করে নেমে পড়ল মেঝের উপর। ফ্যাল ফ্যাল করে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

শ্বেতাঙ্গ লোকটা এবার কনুইএর উপর ভর করে উঠে বসল বিছানায়। সহসা ধমকে উঠল আমায়:

'এই নিগ্রো ব্যাটা, হাঁ করে অমন দেখছিস কিরে?'

'আজ্ঞে কিছু না।' দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি জবাব দিলাম।

'স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাস তো তাকাস নে অমন করে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'...

হোটেলে হয়ত আরও অনেক দিন ওই আবহাওয়ার মধ্যে কাটাতে হোত যদি ওখান থেকে কেটে পড়বার একটা সুযোগ জুটে না যেত। একদিন রাত্রি বেলা হোটেলের একটা ছোকরা এসে চুপি চুপি জানাল: স্থানীয় নিগ্রোদের একমাত্র ছবিঘরের জন্য একটা ছোকরার দরকার। কাজ হোল গেটে দাঁড়িয়ে খালি টিকিট চেয়ে নেয়া। ছোকরাটা আমায় শুধাল:

'জেলে টেলে তুই যাস নি তো?'

'না। এখনো যাই নি।'

'চাকরিটা তাহলে তুই পেয়ে যাবি।' ছোকরাটা বলল। আরও বলল: 'আমিই নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাস ছয়েকের মত যে একবার ভাই কাটিয়ে এসেছি শ্রীঘরে। আর সেটা ওরা যে জানে।'

'কিন্তু তাতে লাভটা কোথায়?'

আমি ওকে শুধালাম। আরও জিজ্ঞেস করলাম:

'ব্যাপারখানা কি বলতো?'

'যে মেয়েটা টিকিট বিক্রি করে ওরই সব কারবার।' বুঝিয়ে বললো সে।'— দেখিস, চাকরিটা পেলে তোর ট্যাঁকেও আসবে বেশ দু'পয়সা।'

চুরি করলে উত্তর মুলুকে পালিয়ে যাবার সুযোগটা হয়ত জুটে যাবে খুব শীঘ্রই। আর যদি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেজে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি আমাকে তাহোলে এখানে পড়ে থাকতে হবে আজীবন। চোরাই মদ চালানের দায়ে হয়ত একদিন ধরাও পড়তে হবে। তাই আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। তা ছাড়া চাকরিটা পাবার সম্ভাবনাও আছে। কেন না ইতিপূর্বে আমি কোনদিন চুরি-চামারির অপরাধে জেলে যাই নি। আইন ভংগের দায়ে অভিযুক্তও হয়নি। তাই ছবিঘরের ইহুদী মালিকের সঙ্গে

দেখা করতেই চাকরিটা হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। পরদিন থেকেই লেগে গেলাম কাজে। গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট পরীক্ষা করছিলাম। কর্তা হুঁশিয়ার করে দিলেন ঃ

'শুনো, তুমি যদি আমায় না ঠকাও আমিও তোমায় ঠকাতে চাই না। কে এখানকার খাঁটি আর কে খাঁটি নয় আমি তা জানতে চাই না মোটেই। তবে তুমি যদি ঠিক থাকো, বাকি সবাইকেও ঠিক থাকতে হবে। কেন না, তোমার মারফৎই যাবে সব টিকিট। তুমি নিজে চুরি না করলে কেউ চুরি করবার সুযোগ পাবে না।'

আমি ঠিক থাকব বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম হলফ করে। কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, চুরি যদি করিও বা তাহোলে বিবেকের নিকট আমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। দিতে হবে তাঁকেই। কেন না, তিনি হলেন জাতিতে শ্বেতাঙ্গ। এঁরা সকলে মিলে আমার যা ক্ষতি করেছেন আমি তার কতটুকুই বা প্রতিশোধ তুলতে পারব? তবু আশ্বস্ত হতে পারলাম না খুব।

প্রথম দিনই দেখলাম নিগ্রো মেয়েটি টিকিট ঘর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে একমনে। বুঝলাম, যাচাই করে দেখছে ও আমায়। আমায় দলে ভিড়াবে কি না এখনও বুঝি ঠিক করে উঠতে পারছে না। আমিও সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আসতে হয় ওই আসুক প্রথম এগিয়ে।

গেটে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে টিকিট চেয়ে নিয়ে এক বাক্সে ফেলাটাই হোল আমার কাজ। মাঝে মাঝে কর্তাবাবু টিকিট ঘর থেকে অবিক্রিত টিকিটের ক্রমিক নম্বর দেখে এসে বাক্সে ফেলা আমার শেষ টিকিটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। প্রথম দিন কয়েক তিনি তাই করলেন। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে তারপর তিনি নজর রাখতে লাগলেন

আমার ওপর। অবশেষে তাও একরূপ ছেড়ে দিলেন। যদি বা কোন দিন করতেন দীর্ঘ ব্যবধানের পর কশ্চিৎ দু-একবার মাত্র।

একদিন রাত্রিবেলা পাশের এক হোটেলে বসে খাচ্ছিলাম। এমন সময় অপরিচিত একটা লোক এসে বসল আমার পাশে।

'আরে, রিচার্ড্ যে!' একান্ত পরিচিতের মত ও বলে উঠল সহসা।

'তুমি আমায় চেনো নাকি?' অবাক হয়ে শুধালাম।

'আমি হলাম টেলের বন্ধু।' ছবি-ঘরে বসে যে-মেয়েটি টিকিট বিক্রি করে ও তার নাম করলে।

আমি চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। মনে সন্দেহ জাগল। সত্যি কথা বলছে তো? মালিকের লোক হয়ে ফাঁদে ফেলতে আসে নি তো?

'আজ থেকেই আমরা শুরু করবো, বুঝলে?'

'কি?' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কিছুই যেন জানি নে এমন ভাবটা দেখালাম।

'আরে, অতো ঘাবড়াচ্ছ কেন? কর্তা তো তোমায় বিশ্বেস করেন। আজ তিনি গেছেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। কখন ফিরবেন টেলিফোনে আমাদের আগে-ভাগে খবর দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।' ও জানালে সব।

খাবারটা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পড়ে রইল টেবিলেই। কিছুই খেতে পারলাম না। বগল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা।

'বুঝলে, আমাদের এ ভাবেই এগুতে হবে কিন্তু?' চাপা গলায় সে বলতে শুরু করলে।'—প্রথমেই একটি ছোকরা এসে একটা দেশলাইয়ের বাক্স চাইবে তোমার কাছে। হাতের পাঁচখানা টিকেট

তুমি তখন বাক্সের খোপে না ফেলে দিয়ে দিও ওর সঙ্গে। টেল সে ক'টা আবার বিক্রি করে দেবে ভিড়ের মধ্যে। ইংগিতে আমরা তোমায় জানিয়ে দেবো শুরু করতে হবে কখন থেকে, বুঝলে?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। জানি, ধরা পড়লেই আমার হাতে হাত-কড়া পড়বে। যেতে হবে শ্রীঘরে। কিন্তু এখনই বা তেমন আর বিশেষ ভালো কি? ধরা পড়লে আমার লোকসানটাই বা কোথায়?

'কেমন, আমাদের সঙ্গে আছো তো তুমি?' ও আবার শুধালে।

আমি তবুও হাঁ-না কোন জবাব দিলাম না। ও এবার উঠে পড়ল। আমার পিঠটা একবার চাপড়ে দিয়ে চলে গেল। আমিও উঠলাম। ছবি-ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। পা দু'টো কাঁপতে লাগল থর থর করে। কিন্তু ভয় করলে চলবে কেন? এই—সেবার যখন চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে আমায় ফেলে দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গরা, তারপর যখন হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল আর মুখের উপর বলছিল: 'এই ব্যাটা নিগার, বরাত তোর ভালোই বলতে হবে। এবার যা, জোর বেঁচে গেলি!' তখন কি আমার এমনটা মনে হয়েছিল? কিংবা সেবার যখন চশমার দোকানের চাকরিটা খোয়ায়ে বাড়ি ফিরছিলাম মনমরা হয়ে, তখনও কি এমনটা মনে হয়েছিল? কিংবা সেবার হলঘরের ফটকে রাত্রির সেই শ্বেতাঙ্গ পাহারাদারটা হোটেলের নিগ্রো ঝি-টির পাছায় সহসা চিমটি কেটে অশ্লীল এক ইংগিত করেছিল বলে আমি যখন তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, তখন কি একথা একবারও আমার মনে হয়েছিল? মনে হয়েছিল এমনিতরো হাজার হাজার ক্ষেত্রে?

গেটে দাঁড়িয়ে আমি টিকিট নিতে লাগলাম। আঙুলগুলো ঘেমে উঠল। দমটা বুঝি বন্ধ হয়ে এল। যেন জুয়া খেলছি: স্বাধীনতা অথবা হাত-কড়ি! তবু অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাকাতে লাগলাম রাস্তার এদিক-ওদিক। কর্তার টিকিটিও দেখলাম না কোথাও। সত্যি, বিপদে ফেলতে কোন ফাঁদ পাতা হয় নি তো?

হোটেলে যে লোকটা গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল, ওকে এবার এগিয়ে আসতে দেখলাম। ও এসে আমার হাতে একখানা টিকিট দিল। চুপি চুপি বলল:

'টিকিট-ঘরে আজ বেজায় ভিড়। পাঁচখানা নয় দশখানাই সরিয়ে রাখো, বুঝলে?'

নিজের টিকিটখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ও ভিতরে ঢুকে পড়ল। টিকিটখানা হাতে করে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চুপ। সর্বাঙ্গ আমার যেন অসাড় হয়ে গেল। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। হাতখানা উঠল কনকন করে। উপলব্ধি করলাম, কী বিষম দুর্ভোগ অপরাধের! ভিড় করে লোক আসতে লাগল। খানদশেক টিকিট হাতের মুঠোয় আমি লুকিয়ে রাখলাম বাক্সে না ফেলে। ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে আসতেই রোগা মত একটা ছেলে মুখে এক সিগারেট গুঁজে এবার এগিয়ে এল আমার দিকে।

'ম্যাচ্ আছে?'

টিকিটগুলো আমি এই ফাঁকে দিয়ে দিলাম ওর হাতে। ও বেরিয়ে গেল। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম, ও গিয়ে দাঁড়িয়েছে টিকিট-ঘরের সামনে। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে চাপা একটু হাসলে। কিছুক্ষণ পরে ওই টিকিটগুলোই আবার অপর লোক মারফৎ এসে পৌছল আমার হাতে।

সপ্তাহখানেক ধরে এ ব্যবস্থাই চলল। টাকাটা তারপর ভাগ করা হোল আমরা চারজনের মধ্যে। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল ৫০ ডলার করে। মুক্তি বুঝি এসে গেল হাতের মুঠোয় !

টাকাটা দিয়ে আমি জামা জুতো আর সস্তা দামের একটা স্যুটকেস কিনলাম। শনিবার ঘুরে এল। কর্তার কাছে খবর পাঠালাম, আমি অসুস্থ। দিদিমা আর অডিমাসী গেছেন চার্চে। ভাই পড়ে ঘুমুচ্ছে। মা তাঁর দোলান চেয়ারে বসে বসে গুনগুন করছেন আপন মনে। জামা কাপড় সব স্যুটকেসে পুরে আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। ঝুঁকে পড়ে বললাম :

'মা, আমি যাচ্ছি।'

'না গো, না।'

'আমায় তো একদিন যেতে হবে মা। আমি তো আর এভাবে পড়ে থাকতে পারি নে।'

'তুই তো অমন কিছু করিস নি যে পালিয়ে যাবি ?'

'না মা, গিয়ে আমি তোমায় চিঠি লিখবো—খবর পাঠাব।'

'নিজের উপর দৃষ্টি রাখিস বাবা। আর গিয়েই চিঠি লিখিস। আমি কি এখানে সুখে আছি ভাবছিস ?'

'আমারও খুব দুঃখ হয় মা। কিন্তু কি করবো ?'

আমি তাঁকে চুমু খেলাম। মা এবার কেঁদে ফেললেন।

'না মা, কেঁদো না তুমি। আমি ঠিকই থাকব। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

বেরিয়ে পড়লাম তারপর। সিকি মাইল পথ হেঁটে এসে পৌছলাম ইষ্টিশানে। বৃষ্টি পড়ছিল পিট পিট করে। আমি কিন্তু ঘেমে নেয়ে উঠলাম। ট্রেনের টিকিটখানা কিনে ইষ্টিশান থেকে বেরিয়ে

এলাম। একবার তাকালাম অদূরের ছবিঘরটার দিকে চোখ তুলে। দেখলাম, কর্তা নিজেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেটে টিকিট পরীক্ষা করছেন। আমি আবার ফিরে গেলাম ইষ্টিশানে। অপেক্ষা করতে লাগলাম ট্রেনের।

ঘণ্টাখানেক পরে মার্কিন বর্ণ বৈষম্যের প্রতীক জিম-ক্রোদের গাড়ি আমায় নিয়ে ছুটে চলল উত্তরাভিমুখে—বর্ণ বৈষম্যের কবল থেকে যেখানে হয়ত কিছুটা আমি রেহাই পাবো। ট্রেন ছুটে চলেছে হু-হু করে। কপোলদুটি আমার এক সময় চন্‌চন করে উঠল। হাত বাড়িয়ে দেখতেই টস্‌টস করে সহসা ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা জল। এ কি শাস্তি? না, আমি আর কখনও চুরি করবো না, অপরাধ করলেই শাস্তি ভোগ করতে হবে আপনা থেকে।

সেই ভালো! এই হোল আমার জীবন!—আমি বিড়বিড় করে উঠলাম।—দেখা যাক, কতদূর কি হয়।

এগারো

উপনয়ন

নভেম্বরের কনকনে শীতকাল। সকাল বেলা এক রবিবার আমি এসে পৌছলাম মেম্‌ফিসে। তখন উনিশ শ' পঁচিশ সাল।

হাতের স্যুটকেসটা পিঠে ঝুলিয়ে শহরের শান্ত জনবিরল রাজপথ ধরে আমি চললাম এগিয়ে। শীতের মুঠি মুঠি রৌদ্র ছিঁটিয়ে আছে সর্বত্র। এসে পড়লাম বীল স্ট্রীটে। এ সেই বীল স্ট্রীট যার আনাচে কানাচে নাকি কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজ্যের যত বেশ্যা, গাঁটকাটা, গলাকাটা আর সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির অপরাধীরা। খান কয়েক বড় বড় দালান পেরিয়ে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে তাকালাম জানালায়, একখানা সাইনবোর্ড রয়েছে ঝুলান: ঘর ভাড়া আছে।

মহানগরীতে প্রথম আসা মফঃস্বল শহরের বোকা সব ছেলেদের কথা মনে পড়ে গেল। না, আমাকে সাবধান হতে হবে। ওদের মত বোকা বন্‌লে চলবে না। আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম। প্রকাণ্ড বাড়িটার শেষ প্রান্তে গিয়ে আবার এলাম ফিরে। মাথা

গুঁজবার মত আমার তো আস্তানা একটা ঠিক করে নিতে হবে। দিন দুয়েকের জন্যে না হয় থাকলামই বা এখানে। পরে ভালো মত জায়গা একটা দেখে নিলে হবে। আমি তাই ঠিক করলাম। আর স্যুটকেসে আমার মহামূল্য তেমন কীই বা আছে? পয়সা কড়ি সব আমি রেখে দিয়েছি ট্যাঁকেই। আমায় খুন না করে কেউ তাতে হাত দিতে পারছে না।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমি বেল টিপতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম বিপুলায়তন মিউল্যাটো এক মহিলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তিনি মুচকি একটু হাসলেন। তারপর দরজাটা দিলেন খুলে। বললেন:

'এসো বাছা, এসো!'

আমি কিছুক্ষণ চোখ তুলে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তারপর ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। তিনি আপাদ মস্তক আমার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। একটু মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন:

'বাড়ির সামনে অতো ঘোরা-ফেরা করছিলে কেনো বলো তো?'

'আমি একখানা ঘর খোঁজ করছিলাম।'

'ঘর খুঁজছিলেন তো সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে পড়লে না কেনো অমনি?'

'এই প্রথম আসছি কিনা এখানে, জানতাম না।'

'সে কি গো, জানতে না কি রকম!' একখানা চেয়ারের মধ্যে তিনি ধপ্ করে বসে পড়লেন! তারপর সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন 'এ যে যে-কেউ বলে দিতে পারে।' তিনি টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। আবার বললেন: 'আমার নাম মিসেস্ মশ্।'

আমিও তাঁকে আমার নাম জানালাম।

মুহূর্ত খানেক তিনি কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন :

'সত্যি, বেশ নামটি তো তোমার!'

আমি একবার চোখ ঠারলাম। কে জানে জায়গাটা কেমন? ইনিও বা কে? স্যুটকেশটা হাতে করে আমি উঠে দাঁড়ালাম যাবার ভান করে।

'বোস বাবা, বোস। তোমার কোন ভয় নেই।' তিনি তারপর বলে চললেন : 'বীল স্ট্রীট সম্পর্কে নানা লোকে নানা কথা বলে থাকে। এটা কিন্তু খারাপ পল্লী নয়। আমারই নিজ বাড়ি। আমি গীর্জার সভ্য। থাকবার মধ্যে আছে আমার এক মেয়ে। এই বছর সতেরো হোল মাত্র। আমার ইচ্ছে মেয়েটা ঘর-কন্না করে সুখে শান্তিতে থাকুক।'

আমি হেসে ফেললাম। বসে পড়লাম আবার।

'তুমি আসছ কোত্থেকে?' তিনি শুধালেন।

'জ্যাক্‌সন—মিসিসিপি থেকে।'

আড়ষ্টতা আমার কেটে গেছে অনেকটা। ওঁকে আমার ভালো লেগে গেল।

আমার সঙ্গে তাঁর যেন অনেক দিনকার আলাপ পরিচয়। তিনি তেমনি সহজ সুরে বলে চললেন অনর্গল : 'আমার স্বামী এক বেকারীতে কাজ করেন। কিই বা তেমন আর পান। তাই ভাড়াটে পেলে আমরা রেখে থাকি। আমরা বাবা, সাদাসিদে মানুষ। সাত-পাঁচ ঝামেলার মধ্যে নেই। এখানে তুমি আপন বাড়ির মত থাকতে পারবে। তা বাবা ভাড়া লাগবে কিন্তু তিন ডলার করে।'

'তিন ডলার খুব বেশী কিন্তু।'

'বেশ যদ্দিন তুমি কাজ কর্ম একটা জুটিয়ে না নিচ্ছ, আড়াই ডলার করেই দিয়ো।'

আমি রাজী হয়ে গেলাম। মিসেস মশ্ আমায় ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। শুধালেন :

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি ?'

আমি আঁতকে উঠলাম বিস্ময়ে।

'আপনি তা জানলেন কি করে ?'

'আমি সব জানতে পারি বাবা। মুখ দেখেই সব টের পাই।' তিনি বলে চললেন : 'তোমার মতো এমনি কত ছেলে-ছোকরা নিজেদের ছোট শহর ছেড়ে পালিয়ে আসে মেমফিসে। ভাবে কতো খাসাই না থাকবে। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গতে দু'দিনও লাগে না। আচ্ছা,' তিনি এবার তাকালেন আমার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে : 'আচ্ছা, তুমি খাও নাকি মদ টদ ?'

'আজ্ঞে, না।'

'না। আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম বাছা। খেতে চাও খেয়ো। কোনো দোষ নেই। তবে বাড়াবাড়ি কিন্তু করো না। আর তুমি যদি তোমার কোনো মেয়ে বন্ধু টন্ধু নিয়ে আসতে চাও এখানে আনতে পারো। তবে দেখো কেলেঙ্কারী যেনো করে বসো না কিছু।'

বিছানার একপাশে আমি বসে পড়লাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মিসেস মশের দিকে। মেমফিস নগরীর কুখ্যাত বীল স্ট্রীটেও মিসেস মশের মত একজন সহৃদয় পরম হিতাকাংখিণী রমণীর সাক্ষাৎ পাবার আশা করতে পারিনি স্বপ্নেও কখনও। এখানে এসেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, দুনিয়ার সব লোকই বুঝি নীচু আর ইন্দ্রিয়াশক্ত নয়। আমাদের বাড়ির লোকদের মত নয় তেমন একগুঁয়ে বা ধর্মান্ধ।

'গীর্জা থেকে আমরা ফিরে এলে তুমি আমাদের সঙ্গেই আজ খেয়ো, কেমন ?'

'ধন্যবাদ। বেশ, তাই খাবো।'

'আমাদের সঙ্গে গীর্জায় যাবে নাকি?'

'আজ্ঞে তা……' আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

'না থাক; তুমি এখন ক্লান্ত।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গা এলিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

মিসেস মশ আমায় যখন খেতে ডাকলেন, বেলা তখন পড়ে এসেছিল। তিনি আমায় তাঁর মেয়ে বেচের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বেচকে দেখেই ভালো লেগে গেল। সাদা-সিদে, ছোট্ট, বেশ মিষ্টি মেয়েটি। গায়ের রঙটা কটা। খেতে বসে মিসেস্ মশ স্বামীর অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন। বেকারী থেকে এখনো উনি ফেরেন নি। মিসেস মশ আমায় অমন সহৃদয় চক্ষেও বা দেখছেন কেনো?' সংশয় দানা বাঁধে। আত্মসচেতন হয়ে উঠে। প্রচুর ভুরী ভোজনের পর ফল আর মিষ্টির ডিসটা টেনে নিয়েছিলাম। বেচ সহসা বলে উঠল:

'আপনার কাণ্ড সব মামনির মুখে শুনছিলাম।'

'আমার আবার কাণ্ড কি?'

'আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার উপর অতো ঘোরাফিরা করছিলেন কেনো বলুন তো?' হাসিতে বেচ ফেটে পড়ল।—'ঢুকবেন কি ঢুকবেন না তা বুঝি ঠিক করতে পারছিলেন না?'

আমিও হেসে ফেললাম। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। মিসেস মশও সহসা হেসে উঠলেন সশব্দে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'মামনি আরও বলছিলেন, স্যুটকেশ হাতে আপনাকে দেখেই অমনি তাঁর মনে হোল: আহা, ছেলেটা নিশ্চয় ভালো একটা আস্তানা

খুঁজছে।' বেচ বলে চলল।—'মামনি লোক দেখেই সব বুঝতে পারেন।'

'হ্যাঁ, তা পারেন।' বেচ বাসন ধুয়ে রাখছিল। ওকে খানিকটা সাহস করে জবাব দিলাম।

'আপনার যখন ইচ্ছে হবে আমাদের সঙ্গেই খাবেন।'

'ধন্যবাদ। তা হয় না কিন্তু।'

'হবে না কেনো?' বেচ শুধালে। 'আমাদের ঘরে কতো খাবারই তো ফেলা যায় হামিশা।'

'সে জানি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষকেই খাবারের বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত।'

'মামানিও একথা বলছিল।' বেচ জবাব দিলে খুশী হয়ে।

মিসেস মশ আবার ফিরে এলেন রান্নাঘরে। বললেন:

'জানো বাবা, বেচের শীগগীর বিয়ে হচ্ছে।'

'সুখবর! ভাগ্যবান পুরুষটি কে?'

'এখনো সন্ধান মেলে নি।' জবাব দিলে বেচ।

আমি তাজ্জব বনে গেলাম। মিসেস মশ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

'আমি বলি মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে থা হওয়া উচিত।' তিনি বলে চললেন: 'আমাদের বেচের জন্য তোমার মত একটা ভালো ছেলে যদি পাওয়া যেতো রিচার্ড……।'

'এই মা! কী হচ্ছে!' টেবিল ক্লথে মুখ লুকিয়ে বেচ চাপা চীৎকার করে উঠল।

'আমি ঠিক কথাই বলছি। ইস্কুলে তুই যে সব বুদ্ধু নিগ্রো ছেলেদের পিছু পিছু ধাওয়া করিস, রিচার্ড ঢের ঢের ভালো ওদের তুলনায়।'

মা আর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি ক্যাল ক্যাল করে। মাত্র ঘণ্টা কয়েক হয়েছে এ বাড়ীতে আমি পদার্পণ করেছি। এঁরা আমাকে কখনও চক্ষেও দেখে নি। ব্যাপার খানা কী?

মিসেস মশ বলে চললেন:

'সকাল বেলা তোমাকে দেখেই আমি মনে মনে বললাম: 'হ্যাঁ এবার ঠিক বেচের মনের মতো ছেলে পাওয়া গেল!'

বেচ এগিয়ে এল আমার কাছে। ঝুঁকে পড়ে মাথাটা রাখলে আমার কাঁধের উপর। আমি অবাক বনে গেলাম। লজ্জা সরম একটুও কী নেই বেচের?

'এই মা, কি হচ্ছে সব?' বেচ মেকি প্রতিবাদ করে উঠল নাকি স্বরে।

'হবে আবার কি রে?' মিসেস মশ কপট ধমক দিয়ে উঠলেন বেচকে।—'তা বাবা, আমি বুড়ো হলাম। কদিন বা আর বাঁচবো? বাড়িখানা তো আর যার-তার হাতে তুলে দিতে পারি নে, রিচার্ড?'

'বেচের বরাতে ভালো পাত্র ঠিক জুটে যাবে, দেখবেন।'

'আমার কিন্তু ভরসা হয় না।' মিসেস মশ মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন।

'আমি বাইরের ঘরে যাচ্ছি মা', বেচ হেসে দুহাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল ছুটে।

মিসেস মশ কাছে এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন:

'বনের জানোয়ারদের মতো মেয়েদেরও পোষ মানিয়ে বশে আনতে হয় বাবা!'

না, বেশী আর মাখামাখী নয় এঁদের সঙ্গে। টেবিলটা মুছতে মুছতে জবাব দিলাম:

'কেনো, ও তো বেশ !'

'বেচকে তোমার পছন্দ হয়, রিচার্ড?' সহসা প্রশ্ন করে বসলেন মিসেস মশ।

আমি আবার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

'বেচ তো বেশ মেয়ে !'

'আমি বলছিলাম, ওকে তোমার পছন্দ হয়? তুমি ওকে ভালোবাসতে পারবে না?'

ফ্যালফ্যাল করে আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মিসেস মশের দিকে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললাম:

'এই পাঁচ ঘণ্টা আগেও তো কেউ আপনারা চিনতেন না আমায়। আমি চোর বাটপাড়ও তো হতে পারি?'

'না বাবা না, তোমায় দেখেই আমি চিনেছি।' মিসেস মশ উত্তর দিলেন। তারপর বললেন: 'বেচ গেছে বাইরের ঘরে। তুমিও যাও।'

'দেখুন মিসেস মশ, আমি হলাম নিতান্ত গরীব ঘরের ছেলে।

'তা হোক, টাকাটাই সব নয় বাবা।'

মুখটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। মিসেস মশের অকপট সরলতায় মুগ্ধও হলাম। অকারণ নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল।

মিসেস মশ আবার বললেন: 'বিশ বছর ধরে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কিনেছি এ বাড়িটা। তোমার মত একটি ছেলের হাতে বেচকে তুলে দিতে পারলে আমি তবে নিশ্চিন্তে দু'চোখ বুঁজতে পারি বাবা!'

'মা গো, কি হচ্ছে সব বলতো!' বাইরের ঘর থেকে বেচ হেসে চিৎকার করে উঠল কপট প্রতিবাদে।

বাইরের ঘরে এসে একটা সোফায় আমি বসে পড়লাম।

ঘরখানা বেশ গরম—আরামের। ছোট একটা বেঞ্চিতে বসেছিল বেচ। চেয়ে আছে সে জানালার বাইরে। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ শুরু করা যায় কি করে? গায়ে পড়ে আমি আলাপ জমাতে পারিনে। আমি রীতিমত ঘেমে উঠলাম।

বেচ প্রথম কথা বললে:

'বসো না এখানটায় এসে?'

আমি গিয়ে বসলাম ওর পাশে। কারো মুখে কথা ফুটল না অনেকক্ষণ।

'আমরা দু'জন একই বয়সী কিন্তু! বেচ বললে। '—আমার বয়স সতেরো।'

'ইস্কুলে যাও না তুমি?'

'হ্যাঁ। আমার বই দেখবে?'

'কই দেখি।'

বেচ ছুটে গিয়ে ওর বইপত্র নিয়ে এল। দেখলাম, পঞ্চম মানে পড়ে বেচ। 'আমি বাপু পড়াশুনায় তেমন ভালো নয় ইস্কুলে।' বেচ অকপটে বলল মাথা নেড়ে। 'ভারী তো আবার ইস্কুল!'

'কিন্তু তার দরকার আছে বই কি?'

'ছাই! দরকার প্রেমের!'

আমি অবাক বনে গেলাম। হাঁদা নয়তো মেয়েটা? মা আর মেয়ে দুজনেই সমান। এমনটা আমি কখন দেখিনি শুনিওনি। মিসেস মশ ঘরে এসে ঢুকলেন। এড়াবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম:

'একবার বেরুবো ভাবছিলাম। চাকরির কোন খোঁজ খবর যদি—'

'ওমা, আজ না রবিবার।' মিসেস মশ বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন। '—সকালটা হোক, একটা দিন সবুর করো না।'

'না, একটু বেরুই ; রাস্তা ঘাটগুলো একবার চিনে আসি রাত্রির মধ্যে।'

'তা মন্দ না।' মিসেস মশ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন। 'দেখলি তো বেচ, ছেলেটার মাথায় কেমন চিন্তা খেলে ?'

আমার ভারী বিশ্রী লাগছিল। ঘেমে রীতিমত নেয়ে উঠলাম। আড়ষ্টতার জের কাটিয়ে তুলতে চাইলাম কিছু বলে। বললাম ঃ

'তোমার পড়া আমি দেখিয়ে দেবো বেচ।'

'সত্যি পারবে তো ?' সংশয় বুঝি দানা বাঁধে বেচের মনে।

'পারবো বই কি ! গেল বছর আমি ইস্কুলের ক্লাশ নিতাম না ?'

'বেশ বাবা বেশ !'

মিসেস মশের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল যেন সুধা।

নিজের ঘরে গিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ভাবতে লাগলাম, এ কোন পরিবারে এসে জুটলাম ভাসতে ভাসতে ! আমার সঙ্গে এঁদের জীবনধারার লক্ষ লক্ষ মাইল তফাৎ এঁরা যেদিন জানতে পারবেন, আমার উপর রাগ করবেন না তো ? এটা এড়িয়েও যাই কী করে ? সতেরো বছরের বিয়ে-পাগলী এক মেয়েকে বিয়ে করে এখানে পড়ে থাকাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ ? আচ্ছা, ওর মাও বা মেয়েকে আমায় বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেনো অমনটা ? এঁরা এমন কীই বা সন্ধান পেলেন আমার মধ্যে যাতে ওরা ক্ষেপে উঠলেন ? আমার তো বেশ-ভূষার কোন বাহার নেই। তবে হ্যাঁ, চাল-চলন কথা-বার্তাটা ভালই। বাড়িতে আর ইস্কুলে আমি এতদিন তারই অনুশীলন করে এসেছি। কিন্তু এ তো যে কোন লোকেরই থাকতে পারে। বাড়ীতে যা পাঁচ বছরেও সম্ভব হয় নি মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় এখানে হলো কি করে ? আমি এঁদের জানতে শিখে গেলাম।

বীল ষ্ট্রীট আর মেম্‌ফিসের কেন্দ্রস্থলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রোগা শরীর। ওভারকোটটাও জীর্ণ। কনকনে হাওয়ার প্রত্যেকটা ঝাপটায় বুকের রক্ত আমার জমে যেতে লাগল। মেইন ষ্ট্রীটের এক কাফেখানার জানলায় হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সাইন বোর্ড :

বাসন ধোয়ার কাজ জানা একজন ছোকরা চাই

কাফেখানায় ঢুকে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে নিলাম। পরদিন রাত্রিবেলা থেকে কাজে বহালও হয়ে গেলাম। প্রথম সপ্তাহে মাহিনা হোল দশ ডলার। তারপর থেকে বারো ডলার করে। কাফেতে দুবার খাবারও মিলবে। কিন্তু দিনের বেলায় খাবো কোথায়? একটা দোকানে ঢুকে আমি এক টিন শুয়োরের মাংস আর সীম কিনলাম। টিন খোলার একটা যন্ত্রও কিনলাম। যাক, খাবার সমস্যাটা মিটে গেল আপাততঃ। ঘর ভাড়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে আড়াই ডলার দিলেই হবে। বাদ বাকিটা আমি জমাব। দরকার হবে চিকাগো যেতে। সুদূর আশায় আশায় আমি বুক বাঁধতে লাগলাম।

মিসেস মশকে আমার চাকরীর সংবাদ দিতেই তিনি বিস্মিত হলেন।

'দেখলি তো বেচ, প্রথম দিন এসেই কেমন কাজটা যোগাড় করে নিলে। হাত পা গুটিয়ে ও বসে থাকার ছেলে নয়। ঠিক তোরই যুগ্যি ছেলে।'

বেচ চিবিয়ে চিবিয়ে একটু হাসল। মনে হোল, আমি যেন প্রতি পদে পদে হৃদয়টি ওর জয় করে নিচ্ছি। মিসেস মশ শুতে গেলেন ওপরের ঘরে। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

'তোমার কোটটা দাও তুলে রাখি।'

বেচ হাত বাড়িয়ে নিল আমার কোটটা। পকেটে টিনটার উপর হাত পড়তেই বলে উঠল :

'য়্যাঁ! পকেটে কী তোমার ?'

'ও, কিছু না!' কোটটা কেড়ে নিতে আমি চেষ্টা করলাম।

পকেটে হাত গলিয়ে বেচ মাংসের টিনটা বার করে নিলে। চোখ দুটি ওর ছলছল করে উঠল।

'রিচার্ড, তোমার খুবই খিদে পেয়েছে না ?'

'না-না!' আমি চাপা প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'চল, খানিকটা 'চিকেন' খেয়ে আসি গে।'

'থাক, দরকার নেই।' বেচ কিন্তু সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। ডাকল : 'মা মনি!'

বুঝলাম, বেচ মিসেস মশকে ডেকে আমার খাবারের কথা জানাতে যাচ্ছে। লজ্জা হোল। রাগও হোল। ইচ্ছা হোল, ঘা কয়েক দিই বসিয়ে। বললাম :

'আঃ, ওঁকে আবার বিরক্ত করছো কেনো ?' মিসেস মশ পোষাক ছেড়েছিলেন। নেমে এলেন ছুটে।

'দেখলে মা, রিচার্ড ওর ঘরে বসে খেতে যাচ্ছিল এ সব।'

মাংসের টিনটা বেচ তুলে ধরলে চোখের উপর।

'মাগো,' মিসেস মশ আতঁকে উঠলেন। '—না বাপু তোমার ওসব খাওয়া চলবে না।'

'কেনো, আমার বেশ অভ্যেস আছে।' আমি জবাব দিলাম। '—টাকা পয়সা আমায় বাঁচাতে হবে কিছু।'

'আমার বাড়ীতে বাপু, ছাই পাশ যা-তা তোমার খাওয়া চলবে না।'

মিসেস মশ বলে চললেন। রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এসো গে, যাও। খাওয়া-খরচা তোমার লাগবে না।'

'আপনাদের ঘরটা আমি কিন্তু নোংরা করতাম না।' আমি আপত্তি জানালাম।

'তা নয় গো বাছা, তা নয়।' মিসেস মশ বলে চললেন।

'তুমি আমাদের সঙ্গে টেবিল পেতে বসে খাবে দাবে। বাজারের ওসব ছাই-পাশ খেতে যাবে কোন দুঃখে বলো তো?'

'আমি কিন্তু কারো ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে চাইনে।'

মিসেস মশ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অপলকে। তারপর কেঁদে উঠলেন হু-হু করে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। কীই বা এমন বলে বসলাম যাতে অপর একজনের চোখে বান ডাকল অশ্রুর? আমার খাওয়া পরা নিয়ে অপর কারোর মাথা ব্যাথা এত কেনো? রাগ ও অপমানে ফুলতে লাগলাম।

মিসেস মশ বললেন :

'ঘরে স্নেহ-মমতার সন্ধান কোনদিন তুমি পাওনি, তাই। দুঃখে আমার বুক ফেটে যায় বাছা!'

না। আর নয়। বাড়াবাড়ি হচ্ছে বড়। সংযত হয়ে উঠলাম। তিনি বুঝি আমার অন্তরের গোপনতম কন্দরে—যা পুঞ্জীভূত ব্যথা ও বেদনায় জর্জড়িত—সেখানে চান অনুপ্রবেশ করতে। কিন্তু তা চলবে না। বললাম :

'বেশ তো আছি।'

মিসেস মশ মাথা নাড়লেন। তারপর চলে গেলেন ওপরে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভয় হতে লাগল, এঁরা বুঝি আমার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন। তেমন খিদে ছিল না। তবু দুজনে খেয়ে

চললাম। বেচ তাকাতে লাগল আমার দিকে। চোখ দুটি তার ছলছল করে উঠল।

বাইরের ঘরে আমরা আবার ফিরে গেলাম।

'আমি কিন্তু বিয়ে করতে চাই।' বেচ বললে কানে কানে।

'ঢের সময় পাবে বিয়ে করবার।' জবাবটা আমি ছুঁড়ে মারলাম ওর মুখের উপর।

'না, বিয়ে করতে চাই আমি এক্ষুনি। চাই ভালোবাসতে।'

সহজ, দ্বিধাহীন এমনতর মেয়ের সন্ধান আমি কখনো পাইনি জীবনে।

বেচ উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে একখানা চিরুনী নিল তুলে। সামনে এসে বললে ঃ

'ছাই, এর মানে তুমি কিছু জানো না!'

একবার চিরুনীখানা আর একবার ওর দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। বললাম ঃ

'কী বলছো?'

ও কোন জবাব দিলে না। খালি মুচকি একটু হাসলে। তারপর এগিয়ে এলো আমার কাছে। চিরুনীখানা বাড়িয়ে ধরলে আমার দিকে। আমি সরিয়ে নিলাম মাথাটা।

'কী করছো বলো তো?'

ও হেসে উঠল খিলখিল করে। তারপর চিরুনীখানা চালিয়ে দিলে আমার চুলের মধ্যে।

'আমার চুলে চিরুনী দিতে হয় না।'

'সে আমি জানি মশাই!' বেচ জবাব দিলে মাথায় আমার চিরুনী চালাতে চালাতে।

'তবে দিচ্ছ কেনো ?'

'আমার ইচ্ছে।'

'তার মানে ?'

ও আবার ফেটে পড়ল হাসিতে। আমি উঠে পড়তে চেষ্টা করলাম। বেচ আমার হাত দুটো ধরে ফেললে। জোর করে আমায় বসিয়ে রাখলে চেয়ারে। বললেঃ

'তোমার চুলটা কিন্তু বেশ দেখতে।'

'নিগ্রোদের মাথার চুলই এমনি।'

'তোমার চুলটা কিন্তু বেশ।' বেচ পুনরাবৃত্তি করলে।

'তবে চিরুণী দিচ্ছো কেনো ?' আমি আবার শুধালাম।

'যাও, ন্যাকামী করো না। উনি জানেন না যেনো ?'

'সত্যি জানি নে।'

'বেশ দেবো। আমার ভালো লাগছে।' বেচ আহ্লাদে ফেটে পড়ল।

'ছি, অমন করে বলতে নেই !'

'তাই নিয়ম মশাই !' বেচ জবাব দিলে। '—যাও, ন্যাকামী করো না। দুনিয়ার সকলেই জানে আর উনি জানেন না। কোন মেয়ের কোন ছেলেকে পছন্দ হলে অমনি করে চিরুণী দিয়ে থাকে মাথায়।'

'তুমি তো এখনো ছোট্ট। কতো সুযোগ পাবে ভবিষ্যতে।'

'কেনো, আমায় বুঝি পছন্দ হয় না ?' শুধালে সে।

'হবে না কেনো ? আমরা দুজনেই তো বেশ বন্ধু।'

'উহুঁ, শুধু বন্ধু হলে চলবে না। আমার আরো বড়ো কিছু চাই।' ছোট একটা নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলে বেচ।

ওর সহজ সরল সারল্যে আমার কেমন যেন ভয় হোল। হোটেলে কাজ করতে গিয়ে অথবা ইস্কুলে যে সব মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে

আমার ওরা যেন সবাই কেমন এক ছাঁচে ঢালা। কিছু বলতে গিয়ে অথবা কিছু করতে গিয়ে, করে সেটা সাত-পাঁচ আকাশ পাতাল ভেবে চিন্তে। বেচ কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া। বেশ স্বতন্ত্র। তু'জনেই নীরব হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। নিথর মৌনতা ভাঙল বেচ। বলল:

'তোমার ঘরে অতো সব বই কিসের বলো তো?'

'তুমি আমার ঘরে ঢুকেছিলে নাকি?' আমি প্রশ্ন করলাম মুখ তুলে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলে বেচ তাকিয়ে থেকে নিস্পলক।—'স্যুটকেশ খুলে ঘেঁটে ঘুঁটেও সব দেখছিলাম।'

এমন মেয়েকে নিয়ে কী করা যায়? আমি কি কালা—শুনতে পাচ্ছি না? সেও কি পাচ্ছে না কিছু? দেহটাকে উপভোগ করতে সাধ যায়। উঁহু, যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে বুঝি বেগ পেতে হবে না কোন রকম। রীতিমত প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু শেষকালে যদি কেলেঙ্কারী কিছু ঘটে বসে? প্রেমই বা আমার জীবনে এলো কবে? এমন সহজ, সুলভ, সুযোগ আছে নাকি হাত ছাড়া করতে? বাঃ রে, ও যে বিয়ের কথাও পাড়ছে? মনের গোপন কথা ওকে একবার বলে দেখবো নাকি? কিন্তু আমায় কী ও বুঝবে? এক কেবল দেহ ছাড়া কতটুকুই বা আর আশা করতে পারি ওর কাছে? তেমন কাম্য কীই বা আর আছে? আমি যে ভালবাসি না ওকে। চাই না বিয়ে করতে। বাড়িখানার উপঢৌকন? তাও আমায় প্রলুব্ধ করে না একটুও। তবু গিয়ে ওর পাশে বসে পড়লাম। ওর দেহের উত্তাপ আমার শিরায় শিরায় উদ্দাম নৃত্য দিলে শুরু করে। মাতিয়ে তুললে আমায়। আচ্ছা, ও যদি মা হয়ে পড়ে? ডর-ভয় কি নেই মেয়েটার? হয়ত বা ও মা হতে চায় নিজেই। কিন্তু যে বাড়ির পরিবেশ থেকে আমি এসেছি, সেখানে এক কেবল রাগ আর ধর্মের ভয় ছাড়া—

সহজ আত্মপ্রকাশের দ্বার ছিল রুদ্ধ। আপন অন্ধকার গণ্ডীর মধ্যে বাড়ীর প্রত্যেকেই ছিলেন বন্দী। এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষটি। তবু ছোট্ট এই মেয়েটার অন্তর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ল চোখ ছ'টিকে আমার ধাঁধিয়ে দিল।

বেচ নত হয়ে আমায় চুমু খেল। সর্বনাশ! খেপা নাকি? আমি বিড়বিড় করে উঠলাম।—কেলেঙ্কারীর একশেষ! যাক্ গে!···চুমুটা আমিও ফিরিয়ে দিলাম। আদর করলাম ওকে। দেহটা ওর নরম, উষ্ণ। আমায় সে ঝাপটে ধরল ছেলেমানুষের মত। সহসা বাহু আর পা ছ'টো ছড়িয়ে দিয়ে ছ'পাশে বসে পড়ল সে আমার কোলে। ছ'হাতে আমায় আঁকড়ে ধরল প্রচণ্ডভাবে। আমি অবাক বনে গেলাম। সবকিছু জানে দেখছি! বয়স কতো মেয়েটার?

'এই, মা তোমার ভাবছেন কী?' আমি ওকে শুধালাম ফিসফিস করে।

'মা এখন ঘুমোচ্ছেন!'

'কিন্তু যদি টের পান।'

'টের পান তো পাবেন। আমি গ্রাহ্যি করি নে।'

রীতিমত খেপে উঠল সে। জানা নেই, শুনা নাই, আমার সম্বন্ধে কিছু জানবার তোয়াক্কাও না রেখে বেচ বুঝি আমায় ওই মুহূর্তে বিয়ে করতে পর্যন্তও রাজী। বললাম:

'চল আমার ঘরে যাই।'

'না। মামণি বকবেন।' ও জবাব দিলে।

নিজেদের বৈঠকখানায় বসে আমার সঙ্গে যা খুশী তাই করতে রাজী, কিন্তু যত সব আপত্তি আমার ঘরে যেতে? খেপা আর কাকে বলে?

'মামণি ঘুমোচ্ছেন।' বেচ বলে উঠল এক সময়।

পাড়ার সব কটা ছেলের সঙ্গে ও নিশ্চয় প্রেম করে বেড়ায়। সংশয় বুঝি দানা বাঁধতে থাকে আমার মনে।

'যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না একটুও।' বেচ অনুযোগ করলে চাপা গলায়।

অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। এত সহজ—এত সরল—এত সোজা! এমনতর কোন মেয়ের সন্ধান আমি বুঝি কোন দিন পাই নি!

আমার হাত দুটো সে মুচড়ে ধরলে সাঁড়াশীর মতো করে। চোখ তুলে আমি তাকালাম ওর দিকে।

'আমি কিন্তু তোমায় ভালবাসি।' বেচ জের টেনে চলল পূর্বের।

'ছি, অমন কথা বলতে নেই কিন্তু।' আমি ধমকিয়ে উঠলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই অনুতাপ হোল ঃ কথাটা না বললেই যেন ভাল করতাম।

'আমি কিন্তু সত্যি তোমায় ভালোবাসি।' বেচ বললে আবার।

স্পষ্ট আর প্রাণময় ওর কণ্ঠস্বর! মনে কোন প্রকার সংশয়ই জাগে না। অডি মাসীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল তাঁর রুক্ষ, সংযত মুখখানা। সর্বদা গেল-গেল-একটা-শুচিবাইগ্রস্ত-সাবধানী-ভাব। সৎ আর পবিত্র থাকবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

'আমায় তুমি বিয়ে করে সুখেই থাকতে।' বেচ বললে এক সময়।

হাতখানা আমি এবার টেনে নিলাম ওর উপর থেকে। তাকালাম ওর মুখের দিকে। হাসবো কি একটা চড় বসিয়ে দেবো ভেবে উঠতে পারলাম না। চড়ই বুঝি বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। উঠে দাঁড়ালাম। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি! পাগল নাকি মেয়েটা!…বেচ ফোঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম ঃ

'বাঃ রে, তুমি তো আমায় একরূপ চেনই না! পরস্পর আমাদের মধ্যে আগে আলাপ পরিচয় হোক ভালো করে।'

ধপ্ করে চোখদুটি বুঝি ওর জ্বলে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। চাপা রুদ্ধ কণ্ঠে বললে: 'আমি কোন কাজের না—একেবারে বাজে যা-তা তুমি তাই মনে করো কেমন, এই তো?'

হাত বাড়িয়ে আমি ওকে তুলে বসাতে চাইলাম। বুঝাতে চাইলাম আমার জীবন, আমার অনুভূতি, আমার অসংখ্য দ্বিধা-সংকোচের কথা। বেচ কিন্তু সহসা লাফিয়ে উঠল ফোঁস করে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রুদ্ধ আক্রোশে সে ফেটে পড়ল! চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল:

'জানো, আমি তোমায় ঘৃণা করি?'

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। স্বপ্নেও আমি কোনদিন ভাবি নি, এমনি করে নিঃসঙ্কোচ নির্বিবাদে আমার নিকট কেউ সঁপে দেবে কায়-মন-প্রাণ অত সহজে। কিন্তু আমার জীবনের খাত যেন হঠাৎ গেল বদলে। মিসিসিপির আবাদে আমি যদি আজ সাক্ষাৎ পেতাম বেচের, ওকে গ্রহণ করতে আমার তখন আর কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচই থাকতো না। কিন্তু মেম্‌ফিস শহরে—এখানকার এই বীল স্ট্রীটে তা যে সম্ভব নয়। এখানে কী করে বিশ্বাস করা যায়, আস্থা রাখা যায় অপর মানুষের প্রতি? ইচ্ছে হোল কাছে গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে আসি মেয়েটাকে। কিন্তু কিই বা বলল?

আমি সিগারেটে আলগা একটা টান দিলাম।

মেমফিসের রাজপথে পথে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম উদ্দেশ্যহীন, দু'পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলো আর রাজপথের মুখর জন-সমুদ্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন সময় কাটাচ্ছিলাম আর ধ্বংস করছিলাম ঠোঙায় ঠোঙায় ভূট্টার খৈ, আমার মাথায় তখন হঠাৎ একটা কথা খেলে গেল। জ্যাকসন শহরে চশমার কাজ শিখতে গিয়ে যদি হতাশ হয়েই ফিরে থাকি, মেমফিস শহরে তবে একবার চেষ্টা করতে দোষ কী? চেষ্টাই করা যাক না। ছোট্ট একটুখানি শহর তো নয় মেমফিস জ্যাক্সনের মত। ছোটখাটো অমন একটা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অতো ফুরসুৎও বা আছে কার?

ডিরেক্টরী ঘেঁটে ঘেঁটে এক চশমা কোম্পানীর ঠিকানা আমি নিলাম বার করে। তারপর গটগট করে অমনি ঢুকে পড়লাম বাড়িটার মধ্যে। লিফটে করে উঠে এলাম ছয় তলায় এক ফ্ল্যাটে। অফিসে ঢুকতেই শ্বেতাঙ্গ একটা লোক উঠে দাঁড়ালেন আমায় অভ্যর্থনা করে। বললেন:

'টুপিটা খুলে নাও হে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নিচ্ছি।'

টুপিটা আমি একটানে খুলে ফেললাম।

'কি চাই?'

'আপনাদের এখানে কি কোন ছোকরার দরকার আছে?' আমি জবাব দিলাম।'—আমি কিছুদিন জ্যাকসনের এক চশমার দোকানে কাজ করেছিলাম।'

'ছাড়লে কেনো কাজটা?'

'গোলমাল হোল একটু ওদের ওখানে।'

'চুরি করেছিলে বুঝি?'

'আজ্ঞে না।' আমি জবাব দিলাম।'—আমি চশমার কাজ-কর্ম শিখি তা বুঝি শ্বেতাঙ্গ এক ছোকরার মনোপুত হোল না। শেষকালে ওই আমায় তাড়ালে।'

'ভেতরে এসো। বসো ওখানটায়।'

আমি বসলাম। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা বলে গেলাম ওকে।

'দাঁড়াও, আমি মিঃ ক্র্যানকে লিখছি।' তিনি বললেন।'—কিন্তু এখানে তো তুমি কাজ শিখবার কোন সুযোগই পাবে না। সেটা আমাদের রীতি নয়।'

আমি তাতেই রাজী হলাম। বহাল হলাম চাকরিতে। বেতন প্রতি সপ্তাহে আট ডলার করে। পরে আরও দু' ডলার বাড়বার প্রতিশ্রুতিও রইল। কফিখানায় যা পেতাম তার চাইতে দু' ডলার কম হলেও কাজটা অনেকটা স্বাধীন ও ভদ্র। ব্যবসায়ী গোছেরও বটে। আমি গ্রহণ করে বসলাম।

সেদিন রাত্রিবেলা বাসায় ফিরে মিসেস মশকে যখন আমি আমার নতুন চাকরির কথাটা বললাম, তিনি বুঝি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। মাকে মেমফিসে নিয়ে আসার কথাও তাঁকে জানালাম। বললাম, টাকাকড়ি তাই কিছু জমিয়ে নিচ্ছি। লক্ষ্য করলাম, সম্প্রতি আমরা দু'জনের মধ্যে যা ঘটেছে, বেচ তার কোন ইংগিতই দেয়নি মাকে। মিসেস মশ আগের মতই মায়ের স্নেহ মমতায় পঞ্চমুখর হয়ে রইলেন।

বেচ কিন্তু আমায় চলতে লাগল এড়িয়ে এড়িয়ে। একা দুজনে দেখা হলেই মুখ নিত ফিরিয়ে। কোন কথাই বলতো না। তবে মার সামনে না। শালীনতার মুখোস চলত সে বাঁচিয়ে। দিন কয়েক কেটে গেল। মিসেস মশ একদিন ছুটে এলেন আমার কাছে। চোখে তাঁর উদাস আহত দৃষ্টি। শুধালেন :

'বাবা, তোমার আর বেচের মধ্যে হয়েছে কি বলো তো ?'

'কই, না তো ?' আমি স্রেফ মিথ্যে কথা বললাম। লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল।

'তোমায় দেখে বেচ্ দেখছি মুখ নেয় ফিরিয়ে, ব্যাপার কি ?' তিনি তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে। '—তোমার কি ওকে পছন্দ হয় না ?'

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। মুখ তুলে পারলাম না একবার তাকাতেও।

'বেশ,' মিসেস মশের বুক থেকে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস খসে পড়ল। বললেন: 'জোর করে তো কেউ কাউকে আর ভালোবাসতে পারে না। ভালোবাসতে হয় আপনা থেকেই'।

তুটো গণ্ড বেয়ে তাঁর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়তে লাগল ঝরে। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন: 'বেচ আর কাউকে—'

আমার সারাটা শরীর যেন ম্যাজম্যাজ করে উঠল। বোধ হতে লাগল কেমন যেন অসুস্থতা। কত অসহায় বলে মনে হোল মিসেস মশকে। বেচ যে আমায় ভালবাসে এ কথা তিনি কতবার আমায় শুনিয়েছেন। বলেছেন্, বেচ যাতে ভালবাসে আমাকে সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। কোন অপরাধ নেই নাকি তাতে। কথাটা শুনে আমার মনটা অসীম করুণায় ছেয়ে গিয়েছিল।

শেষকালে আমি অসহ্য হয়ে উঠলাম রীতিমত। একদিন রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে দেখলাম, মিসেস মশ হল ঘরের চিমনীর কাছে বসে আছেন যেন কারো প্রতীক্ষায়। আমায় দেখে তিনি মাথা নাড়লেন। মুচকি একটু হাসলেন। শুধালেন:

'কেমন আছো, বাছা ?'

'বেশ ভালোই।'

'তোমার আর বেচের মধ্যে এখনো ভাব-সাব হোল না ?'

'আজ্ঞে না ।'

'বেচকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না কেনো বলো তো ?' তিনি জানবার দাবী করলেন।

আমার রাগ হোল। জবাব দিলাম : 'জানি নে।'

'ও তেমন ফরসা নয়, তাই কি ?'

'কেনো, বেচ তো বেশ ফরসাই !' আমি মিথ্যে কথা বললাম।

'তবে ?'

আমি তবু কোন জবাব দিলাম না।

'এ বাড়িখানা তোমাদেরই হোত।' মিসেস মশ বলে চললেন। '—ছেলে পিলে নিয়ে তোমরা দু'জনে সুখে শান্তিতে এখানে ঘর সংসার করতে পারতে।'

'কিন্তু মানুষ যে চায় আপন দু'পায়ে ভর করে দাঁড়াতে।' আমি জবাব দিলাম।

'হুঁ, এখনকার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ডজ্ঞান কী আছে ?' মিসেস মশ বললেন অবশেষে।'—আমাদের আমলে অমন একটা পাতা সংসারের কথা কেউ যদি বলতো, আমরা যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে যেতাম !'

অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। বললাম :

'মিসেস মশ, আমি এবার এ বাড়িটা ছাড়বো ভাবছিলাম।'

'সে কি, বাড়ি ছাড়বে কেনো ?' মিসেস মশ যেন সহসা ফেটে পড়লেন।''—পাগল না তোমার মাথা খারাপ ?'

জবাব দিলাম না। ঘরে ঢুকে জিনিষ পত্র গুছাতে লাগলাম। ভেজান দরজাটায় একটা টোকা পড়ল। আমি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলাম। মিসেস মশ এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। চোখে তাঁর দু' ফোঁটা জল।

'আমায় ক্ষমা কর, বাবা। আমি আর কিছু বলবো না তোকে।' তিনি কোঁপিয়ে উঠলেন।'—তুই আমার পেটের ছেলের মতো। রাগ করিস নে আমার উপর।'

'না, রাগ নয়। এমনিই যাচ্ছি।'

'না!' তিনি গোঁঙিয়ে উঠলেন।'—আমায় তাহলে তুই ক্ষমা করিস নি এখনো।'

মুখ তুলে আমি তাকিয়ে রইলাম মিসেস মশের দিকে। কোন কথা যোগাল না মুখে। বেচও এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। বলল:

'যেয়ো না, রিচার্ড!'

'না, যাস নে বাবা! আমরা আর তোর কোন কথায় থাকবো না।' মিসেস মশ জের টানলেন।

আমি যেন কেমন মুষড়ে পড়লাম। দুঃখ হোল। লজ্জাও। বেচের হাত ধরে মিসেস মশ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

একরূপ না খেয়ে না দেয়ে আমি শুরু করে দিলাম টাকা জমাতে। দু'পয়সা বেশ জমে উঠল। তাই দিয়ে আমি পুরোন বই আর পত্রিকা কিনতে লাগলাম। পড়ে নিয়ে ওগুলো আবার দিতাম বিক্রি করে। এভাবেই 'হার্পাস ম্যাগাজিন,' মাসিক 'আটলান্টিক' আর 'আমেরিকান মার্কারীর' সঙ্গে পরিচয় হয় আমার।

একদিন সকাল সকাল এসে পড়েছিলাম কাজে। নীচের ব্যাঙ্ক-ঘরে তাই পায়চারী করছিলাম। কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একখানা পত্রিকার উপর চোখ পড়ল। আমি ওটা তুলে নিলাম। পত্রিকাখানার নাম মেমফিস কমার্শিয়াল এপীল। স্বাধীনভাবে এই আমার প্রথম পত্রিকা পড়া। আমি মশগুল হয়ে গেলাম পড়তে পড়তে। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় এসে পৌছলাম। এইচ, এল, মেনকেন-কে নিয়ে

লেখা একটা প্রবন্ধ দেখে দাঁড়ালাম থমকে। শুনেছিলাম উনি 'আমেরিকান মার্কারী' পত্রিকার সম্পাদক। এ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানতাম না ওঁর সম্বন্ধে। প্রবন্ধটায় দেখলাম মেন্‌কেন-কে নিন্দা করা হয়েছে তীব্র ভাষায়। মেন্‌কেন একটা অকাট মূর্খ —এমন কটূক্তিও করা হয়েছে।

আমি অবাক বনে গেলাম। মেন্‌কেন এমন কি করলেন যাতে গোটা মহাভারতটাই অশুদ্ধ হয়ে গেল? সম্মুখীন হতে হলো দক্ষিণ দেশী অমন ঘৃণ্য মন্তব্যের? আমি তো জানতাম, দক্ষিণে একমাত্র নিগ্রোদেরই কপালে অমন দশা ঘটে থাকে। কিন্তু উনি তো নিগ্রো নন! তবে 'কমার্শিয়াল এপীল' অমন খাপ্পা হয়ে উঠল কেন মেন্‌কেনের উপর? উনি যা প্রাচার করছিলেন দক্ষিণের লোকেরা বুঝি নিশ্চয় তা পছন্দ করে না। নিগ্রোরা ছাড়া অপর লোকেরাও কি তা হোলে দক্ষিণ দেশী হাল-চালের সমালোচনা করে থাকেন? মেন্‌কেন সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। তবু আমার মনটা ছেয়ে গেল সহানুভূতিতে।

না। মেন্‌কেন সম্বন্ধে জানতে হবে। নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরী ছিল। শহরের পার্ক আর খেলার মাঠের মতো সেখানেও নিগ্রোদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। আমি কিন্তু অনেকবার অফিসের শ্বেতাঙ্গ বাবুদের বই নিয়ে গেছি ওই লাইব্রেরীতে। আচ্ছা, ওঁরা কি কেউ আমায় একখানা বই পড়বার সুযোগ দিবেন না, করে? জনের কাছে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ওর উপর খালি ভরসা করা চলে না। জন জাতিতে ইহুদী। ওর অবস্থাও আমার চাইতে খুব ভালো নয়। তা ছাড়া নিজেকে শ্বেতাঙ্গদের দলে মনে করে জনও ঘৃণা আর করুণার চক্ষে দেখে আমায়।

কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? না। উনি

পাদ্রী মানুষ। নিগ্রো ছেলে হয়ে আমি কেনো মেন্‌কেনের বই পড়তে চাচ্ছি নিশ্চয় জানতে চাইবেন। সন্দিহান হয়ে উঠবেন। অফিসের আর যেসব শ্বেতাঙ্গ বাবু আছেন তাঁদের অনেকেই কু-ক্লুক্স দলের অথবা ওদের সমর্থক। বারে পাশ ঘেসাও চলবে না ওঁদের!

বাকি এক কেবল আইরিশ ক্যাথলিক বাবুটি। এখানকার শ্বেতাঙ্গরা ঘৃণা করে ওঁকে। পোপ-গত প্রাণ বলে আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও কসুর করে না। বই তিনি পড়েন। লাইব্রেরী থেকে কত মোটা মোটা বই আমি নিয়ে এসেছি তাঁর জন্য। ওঁর কাছে একবার ধর্ণা দিলে কেমন হয়? হয়ত তিনি নিরাশ কোরবেন না।

একদিন সকাল বেলা আমি তাঁর ডেস্কের নিকট এগিয়ে গেলাম। বললাম:

'আজ্ঞে, একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'কি অনুরোধ?'

'আমার একটু পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। লাইব্রেরী থেকে খানকয়েক বই নিতাম। আজ্ঞে, আপনার কার্ডখানা একবার দেবেন?'

তিনি তাকালেন আমার দিকে। বললেন:

'আমার কার্ডটা আর বসে থাকে কই?'

'ওঃ, তাই নাকি?'

আমি বুঝি ইতস্ততঃ করছিলাম। তিনি আমায় শুধালেন:

'আমায় কোন বিপদে ফেলতে চাও না তো?'

'আজ্ঞে না।'

'কি বই তুমি পড়তে চাও?'

'এইচ-এল মেন্‌কেনের একখানা বই।'

নাম? এঁরা কি সত্যিই মানুষ সব? এঁরা কি বেঁচে আছেন এখনো? না, বেঁচেছিলেন কোন কালে? এঁদের নাম মুখে আনাও তো বিপদজনক।

আমি পড়ে চললাম। পদে পদে এমন সব শব্দের সাক্ষাৎ ঘটতে লাগল যাদের কোন অর্থই আমি জানি না। কোথাও কোথাও বা আমি অভিধান দেখে নিতে লাগলাম। তা না করে অনেক ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা টানা মানে করে নিতে লাগলাম। কিন্তু ভাষা কী বই-এর? মনে হোল, আমি বুঝি এতদিন সন্ধান না পেয়ে বইখানার জীবনের এক মহা সম্পদ হতে বঞ্চিত ছিলাম। অনুভূতির আবেগে ফেটে পড়ে আমি একদিন লিখতে গিয়েছিলাম। প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম নিজেকে অক্ষম, অপটু হস্তে। কিন্তু আমার যে স্বপ্ন আজ ধ্বসে পড়েছে। ধীরে ধীরে উবে গেছে অভিজ্ঞতার নির্মম নিষ্পেষণে। আমি আজ আবার উৎবুদ্ধ হয়ে উঠলাম নতুন নতুন বই পড়তে। নতুন করে সব কিছু জানতে। দেখতে সব কিছুকে।

পড়তে পড়তে অনেকদিন রাত শেষ হয়ে আসত। সকালে উঠে শূয়োরের মাংস আর সীম ক'টা খেয়ে নিতাম। তারপর ছুটতাম কাজে। সারাটা শরীর ম্যাজম্যাজ করত। ঘুমে চোখ দুটি আসত জড়িয়ে। কিন্তু বইয়ের আমেজটা পেয়ে বসত আমায়। জের তার কিছুতেই কাটত না। আশে পাশের আমার সবকিছুই যেন উঠত রঙিয়ে উঠত অনুরণিত হয়ে। মনে হোত, আমিও বুঝি একজন শ্বেতাঙ্গ!

লাইব্রেরীতে যাওয়া- আসা আমি আরও বাড়িয়ে দিলাম। পড়াটা আমার দাঁড়িয়ে গেল নেশায়। খুঁটিয়ে পড়া আমার প্রথম উপন্যাস হোল- সিনক্ল্যার লুইসের 'মেইন ষ্ট্রীট' খানা। 'মেইন ষ্ট্রীট'-খানাই আমায় প্রথম চিনিয়ে দিল আমার মনিব মিঃ গেরাল্ডকে। চোখে আঙুল

দিয়ে যেন দেখিয়ে দিল কোন এক জাত-মার্কিনকে! গল্ফের থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি যখন অফিসে ঢুকতেন, আমার তখন বেজায় হাসি পেত। মনে হোত, মুনিব আর আমার মধ্যে অতলান্তিক যতখানি ব্যবধানই থাক না কেন, তিনিও আমার মত একজন। ওঁর সংকীর্ণ জীবন ধারার সঙ্গে আমার তেমন তফাৎ কোথায়? লুইসের উপন্যাসের জর্জ এফ্‌ ব্যাবিট নামের পৌরানিক চরিত্রটিই আমার চোখ দু'টি দিল খুলে।

ড্রেইজারের 'জেনি গার্হাডট্' আর 'সিস্টার ক্যারীর' সঙ্গে এবার হোল পরিচয়। ড্রেইজার পড়ে মার কষ্টের কথা আমার তখন মনে পড়ে গেল। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। মুখে কোন কথাই জুটল না। অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম আগাগোড়া আমার জীবনটার কথা। উপন্যাসগুলো পড়ে আমি যা লাভ করলাম, অপরকে তা জানাই কী করে? আগাগোড়া আমার জীবনটাই আধুনিক উপন্যাসের উপাদান —বাস্তবের জারকরসে যেন জারিত হয়ে উঠেছে। আমার মোটে পড়াই হোল না।

নতুন আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে বসলাম লিখতে। কিন্তু লিখতে পারলাম না এক পংক্তিও। মাথায় যা এলো, এক বর্ণও তা যায় না লেখা। উপলব্ধি করলাম: কেবল অনুভূতি আর বাসনা থাকলেই লেখা চলে না। প্রয়োজন আরও কিছুর। লেখার কথাটা আমি দু'হাতে উপড়ে ফেললাম। কেননা, আমার বিপুল অজ্ঞতা, আমার জীবনের বর্ণ-বৈষম্যমূলক 'জিম ক্রো'র পরিবেশে তা সম্ভব নয়। নিগ্রো হয়ে জন্মানোর কি নির্মম অভিশাপ, সে আমি জানি। জানি খিদে পেলেও আমায় চোখ বুঁজে থাকতে হবে পেটে পাথর বেঁধে। কাটাতে হবে দিন ঘৃণা আর অপমানে।

কিন্তু আমি যদি আজ উত্তর মুলুকে চলে যাই, নতুন করে জীবনের গোড়াপত্তন কি করতে পারবো সেখানে গিয়ে? খালি রঙিন কথার স্বপ্ন দেখলেই কি নতুন করে জীবনকে গড়া চলবে? এই যেমন, আমি চাই লিখতে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাটাও তো আমি জানিনে। আমি এক গাদা ইংরেজী ব্যাকরণ কিনে আনলাম। কিন্তু ব্যাকরণটা আর পড়া হোল না। শুষ্ক নিষ্প্রাণ বোধ হতেই বইগুলো দূরে সরিয়ে রাখলাম। এর চাইতে নভেল পড়া ঢের ভালো। ভাষাটা অন্ততঃ শেখা যাবে। আমি তাই পড়তে লাগলাম মন দিয়ে। রাত্রি বেলা চোখ দু'টি বুজলেই আমার চোখের উপর বইয়ের মশিময় মূর্তিগুলো কিলবিল করে ভেসে উঠতো।

আমি যেসব বই পড়ি, অপর কোন নিগ্রো হয়ত তাদের নামও শোনে নি। অবশ্য, নিগ্রো ডাক্তার, আইনজীবী আর সাংবাদিকের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার এখনও কোন পরিচয় হয় নি। কোন নিগ্রো সংবাদপত্র নিয়ে বসলেই, কেমন যেন আমার খাপছাড়া লাগত। যেন হারিয়ে ফেলতাম খেই। মনে হোত, আমি যেন আটকে পড়েছি ফাঁদে। পত্রিকা পড়াই আমি ছেড়ে দিলাম একরূপ। বই পড়ার লোভ কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারতাম না কিছুতেই। আমায় প্রলুব্ধ করে তুলত ওরা। নতুন এক দৃষ্টিকোণ আর অনুভূতির দ্বার দিত উন্মুক্ত করে।

শীতকালের দিকে মা আর ভাই এসে পড়ল। ঘরের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করার কাজে আমরা লেগে গেলাম। কিস্তি চুক্তিতে ঘরের আসবাব পত্রসব কিনতে লাগলাম। জানতাম কিস্তি চুক্তির ফলে আমাদের ঠকতেই হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি? আমার বরাতে কিন্তু গরম গরম খাবার জুটতে লাগল এবার থেকে। অবাক হয়ে

লক্ষ্য করলাম, নিয়মিত খাবার দাবারের ফলে পড়া-শুনোটা আমার যেন বেশ এগোতে লাগল।

ছোট ভাইও একটা কাজ জুটিয়ে নিল। আমরা দু'জনেই জমাতে লাগলাম টাকা। উত্তর মুলুকে চলে যেতে হবে শীগ্‌গীর। বসে বসে আমরা দু'জন যাবার দিন ক্ষণ গুণতে লাগলাম। কিন্তু যাবার কথাটা শ্বেতাঙ্গ কাউকে আর জানালাম না।

এখানকার পরিবেশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নগণ্য ক্রীতদাসরূপে আমি হয়ত কাটিয়ে দিতে পারতাম আজীবন। কোন রকমে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেচের সঙ্গে পাণিগ্রহণও হয়ত করতে পারতাম ওর। ওদের বাড়িখানাও হয়ত লাভ করতে পারতাম যৌতুক হিসেবে। কিন্তু বাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল। না। তা হয় না। নগণ্য ক্রীত-দাসের জীবন আমি পারব না যাপন করতে। আমার অনুভূতি, আমার শিক্ষা-দীক্ষাই সব বাদ সাধল। আমার জীবনের মোড় দিল আগা-গোড়া ঘুরিয়ে। আমার আর সারাটা পৃথিবীর মধ্যে বিপুল ব্যবধানের পাহাড় তুলে দাঁড়াল। দিনের পর দিন কিন্তু বেড়ে চলল অতলান্তিক সেই ব্যবধান। ভয়, উদ্বেগ আর আতংকের মধ্যে দিয়ে বহু দীর্ঘ দিন আর রাত্রি আমার কাটতে লাগল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম: কতদিনই বা আর চালাতে পারব এমনি ধারা?

ম্যাগী মাসী হঠাৎ একদিন এলেন মেম্‌ফিসে। তিনি হঠাৎ এসে না পড়লে উত্তর মুলুকে আমার যাওয়া হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। ম্যাগী মাসীর স্বামী আমাদের সেই 'নতুন মেসোমশাই'—যিনি আরকান্‌সাস্‌ থেকে পালিয়ে এসেছিলে রাত দুপুরে—মাসীমাকে এখন পরিত্যাগ করেছেন। ম্যাগী মাসী তাই এখন জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মা, মাসীমা, ছোটভাই আর আমি—আমরা এই চারজনে বসে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা-সল্লা-পরামর্শ করতে লাগলাম : কাজ কি করে জোটান যায়, চিকাগো যাবার কোন সুরাহাও বা হয় কিনা। কিন্তু হাজার সল্লা-পরামর্শেও ঠিক করা গেল না কিছু। আমরা চার-জনের একসঙ্গে যাত্রা করা কিছুতেই হতে পারে না। অত টাকাও বা পাবো কোথায়? কিন্তু টাকার জন্য বসে থাকলে হয়ত যাওয়াটাই হয়ে উঠবে না। চোখ-কান বুজে পড়তে হবে বেরিয়ে। অবশেষে ঠিক হোল, ম্যাগী মাসী আর আমিই যাবো প্রথমে। আমরা গিয়ে মা আর ভাইয়ের যাবার ব্যবস্থা করবো তারপর। না, আর টাল-বা-হানা করে লাভ নেই। আগামী সপ্তাহে কিংবা পরের মাসে নয়। যেতে হলে যাওয়া উচিত এখনই।

কিন্তু মুস্‌কিল হোল, যেখানে কাজ করছিলাম সেখান থেকে সহসা ছেড়ে আসি কি করে? ঝগড়া-ঝাটি কিংবা নাটুকেপনা কিছু করা চলবে না। আসতে হবে ভদ্র ভালোভাবেই।

কর্তা বাবুর কাছে এখন কথাটা পাড়ি কি করে? হ্যাঁ, নেহাৎ গো-বেচারা সেজে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে : মাসীমা এসেছেন। তিনি আমাকে আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমার মাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন চিকাগো শহরে।

তাই করলাম। যাবার দিন দুই আগে কর্তা বাবুর কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম ভয়ে ভয়ে। কথাটা শুনে তিনি তাঁর 'দোলন চেয়ারটায়' বসলেন সটান হয়ে। মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে অনেকক্ষণ। বিড়বিড় করে তারপর বললেন :

'চিকাগো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু ছোকরা, সেখানে কি তোর [illegible] লাগবে?'

'আজ্ঞে, বাড়ির সবাই যাচ্ছেন কিনা।' আমি থতিয়ে জবাব দিলাম। অফিসের অপর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা কাজ ফেলে সব শুনতে লাগল কান পেতে। আত্ম-সচেতন হয়ে উঠলাম।

'কিন্তু সেখানে যে তোর বেজাই ঠাণ্ডা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা! ওরাও বলছিল।' আমি জবাব দিলাম নিরপেক্ষভাবে।

'দেখিস ছোকরা, পা পিছলে যেনো পড়ে যাসনে ওখানকার লেকের মধ্যে।'

লেক মিচিগানে আমি যেন পা পিছলেই পড়ে যাবো! আমি হেসে জবাব দিলাম।

'না, কর্তা।'

এবার তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন: 'ওখানে গিয়ে তুই খুব ভালো থাকবি ভাবছিস নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

'এখানে তো তুই তোফাই ছিলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! মা যদি চলে না যেতেন এখানেই আমি কাজ করতাম।' আমি স্রেফ্ মিথ্যে কথা বললাম।

'বেশ তো, থেকেই যা না। মাকে তোর টাকা পাঠিয়ে দিস মাসে মাসে।'

আমায় তিনি এবার ফাঁদে ফেললেন। জবাব দিলাম:

'কর্তা, আমি মার কাছে থাকতে চাই।'

'মার কাছে থাকতে চাস কি রে?' তিনি অবজ্ঞায় ফেটে পড়লেন।'—জানিস রিচার্ড, তোকে পেয়ে আমরা কত খুশীই হয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ কর্তা, আমিও এখানে কাজ করে খুব আনন্দ পেতাম।' আমি আবার মিথ্যে কথা বললাম।

চুপচাপ। নীরবে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। চুপচাপ। কোন সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। অফিসের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা মুখ তুলে কেমন যেন তাকাতে লাগল আমার দিকে। আমি উপরে উঠে এলাম। কেমন যেন অপরাধী বলে মনে করতে লাগল নিজেকে। আমার কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ল কারখানার সর্বত্র। শ্বেতাঙ্গরা এসে আমায় ঘিরে ধরল। চোখে তাঁদের কেমন এক নতুন ঔৎসুক্য।

'হ্যাঁ রে, তুই নাকি উত্তর মুলুকে চললি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির সবাই যাচ্ছেন কিনা।'

'উত্তর মুলুকে গিয়ে কিন্তু তুই তেমন সুবিধে করতে পারবি না, ছোকরা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওখানকার সম্বন্ধে যা শুনিস, সবই বিশ্বেস করিস নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

'তুই ওখানে গিয়ে শাদা আদমীদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবি না তো?'

'আজ্ঞে না-না। ওখানে গিয়েও আমি এখানকার মত ঠিক চলাফেরা করবো।'

'উঁহু, সব শালা নিগ্রোই বদলে যায় উত্তরে গিয়ে। তুইও নির্ঘাৎ বদলে যাবি।'

ভোল বদলাবো বলেই আমি যাচ্ছি উত্তরে, বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বললাম না। জবাব দিলাম:

'আজ্ঞে না, আমি ঠিকই থাকবো।'

শেষবারের মত চিঠির থলেটা নিয়ে আমি ডাকঘরের দিকে ছুটলাম। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে কারখানার দিকে একবার তাকালাম। লোক-গুলো তখনও ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছে। দু'এক জন বুঝি মুখ তুলে তাকালও আমার দিকে। লিফ্ট থেকে আমি নেমে এলাম রাস্তায়। পালাতে হবে এখানকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে—বিভীষিকাময় দক্ষিণের সাংস্কৃতিক ধারার কবল থেকে।

পরদিন আমি যখন উত্তরদেশগামী এক ট্রেনের মধ্যে উঠে বসলাম, দক্ষিণের যে আবহাওয়া—বিচিত্র যে পরিবেশে আমি এতকাল লালিত পালিত হয়ে উঠেছি, আমার কিন্তু এতটুকু মায়াও হোল না তার জন্য। একবার তাকাতেও পর্যন্ত ইচ্ছে হোল না পেছন ফিরে। দক্ষিণের রুদ্র নিষ্করুণ রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে দিন দিন আমার চোখে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা, আতংক আর উদ্বেগের রাত্রি যাপন করতে হয়েছে আমাকে। তবু আমার মনে এ ধারণা আজ বদ্ধমূল হয়ে উঠল : ওরাই কেবল জীবনের বাস্তব রূপ নয়। পরিপূর্ণ মহীয়সী করেও গড়ে তোলা যায় জীবনকে।

অতি আকস্মিক ভাবে হঠাৎ একদিন উপন্যাস আর সাহিত্য-সমালোচনাগুলোর সন্ধান পেয়েছিলাম। জীবনের নতুন এই সম্ভাবনার দিক চোখে আমার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ওরাই। তুলল আমায় উদ্বুদ্ধ করে। ঐ বইগুলো যাঁরা লিখেছেন—এই যেমন, ড্রেইজার, মাস্টারস্, মেন্‌কেন, এণ্ডারসন বা লুইস্—তাঁদের কাউকে আমি চিনতাম না। চোখেও কথনো দেখি নি। কিন্তু এঁদের বই পড়ে আমার এ বোধটুকু হোল : মার্কিনী হালচাল, তার পরিবেশের ওঁরাও করেন সমালোচনা। নতুন করে গড়ে তুলতে চান ওঁরা আমেরিকাকে। তাকে গড়ে তুলতে আমেরিকার অধিবাসীদের মনের মতো করে। অপরিচিত ঐ সকল

গল্প উপন্যাস আর প্রবন্ধকারের রচনা থেকে আমি তাই পেলাম নতুন প্রেরণা—সন্ধান পেলাম নতুন আলোর। সে আলো লক্ষ্য করে আমি চললাম অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে।

অজ্ঞাত, অপরিচিত, এক অন্ধকার গুহায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই আমি যেন আজ চলেছি দক্ষিণ দেশ ছেড়ে। আমি যে আজ দক্ষিণ দেশ ছেড়ে যাচ্ছি, ভুলে যেতে নয় তাকে। যাচ্ছি তাকে আরও চিনতে একান্ত-ভাবে। আমি যেন একদিন জানতে পারি আমার প্রতি—এখানকার সব নিগ্রো ছেলে-মেয়েদের প্রতি—যে সব নির্মম নিষ্করুণ অবিচার আর অত্যাচার করা হয়েছে, তার মূল উৎস কোথায় ?

হ্যাঁ, আমি জানি, দক্ষিণ মুলুককে ত্যাগ করা কথনও সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কেন না, আমি নিগ্রো। আমার প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চেতনা আর ব্যক্তিত্ববোধের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে মিশে আছে এখানকার নিগ্রোদের সাংস্কৃতিক ধারা। দক্ষিণের সেই সাংস্কৃতিক ধারার জারক রসেই যে আমি জারিত। আমি তাকে বেমালুম ত্যাগ করতে পারবো না। এ দেশ ছেড়ে গেলেও এখানকার জের চলতে হবে টেনে। তবে আমি পরখ করে দেখব, নতুন দেশের মাটিতে নতুন পরিবেশে, নতুন আলো ও বাতাসে নতুন করে গড়ে তোলা যায় কিনা নিজেকে ফুলে-ফলে মঞ্জুরিত, সুশোভিত করে।···

হুস্ হুস্ করে ট্রেন ছুটে চলেছে উত্তর মুখে। অতীতের নিষ্করুণ দিনগুলির কথা ভেসে উঠল চোখের উপর। ঝাপসা হয়ে এল চোখ দুটি। তবু আশায় আশায় বুক বাঁধলাম : নতুন যে দেশে আজ চলেছি সেখানে কেউ হয়ত ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমার হস্তক্ষেপ করতে আসবে না। ভয় আতঙ্কে আর অপমানের অভিশাপ মাথায় করে দিন হয়ত আমায় আর [illegible] কাটাতে। মাথা উঁচু করে হয়ত পারবো আমি বাঁচার মত [illegible] বাঁচতে আর সকলের মত।